# আশরাফুল জওয়াব

## প্রথম খণ্ড

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবূ আশরাফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

# আশরাফুল জওয়াব

# অনুবাদকের আরয

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين -

সৃষ্টিকুলের পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা। সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ইসলাম জীবন-সমস্যার চিরন্তন সমাধান। কিন্তু সূচনালগ্ন থেকেই নব উদ্ভাবিত স্পষ্ট কিংবা প্রচ্ছন্ন শিরক-বিদআত, অনৈসলামী রেওয়াজ-প্রথা, যুগ-চাহিদা-প্রসূত সংশয়-সন্দেহ ইত্যাদির অবাঞ্ছিত প্রবাহ ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধে আঘাত হানার উলঙ্গ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। প্রতিটি যুগে ইসলামী চিন্তানায়ক ও হক্কানী আলিমগণের তীব্র প্রতিরোধের মুখে সেসব আঘাত নস্যাৎ হয়ে যায়।

উপমহাদেশের অবিসংবাদিত অগ্রনায়ক মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) রচিত "আশরাফুল জওয়াব" শীর্ষক গ্রন্থটি সে জাতীয় প্রতিরোধেরই বাস্তব প্রয়াস। এগুলো মূলত তাঁর বিভিন্ন সময়ের ওয়ায এবং তাঁর প্রতি পাঠানো প্রশ্নাবলীর জবাবের সমষ্টিবিশেষ, যা পরে "আশরাফুল জওয়াব" শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এতে তিনি অনৈসলামী রেওয়াজ-রীতি ও সংশয়-সন্দেহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করত ইসলামসম্মত বাস্তবধর্মী সমাধান নির্দেশ করেছেন যা আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার চাহিদা পূরণে পুরোপুরি সক্ষম।

গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। তন্মধ্যে যুক্তির বলিষ্ঠ প্রয়োগ, বিষয়বস্তুর সাবলীল পর্যালোচনা এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক উপস্থাপনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সামাজিক পরিবেশ ও আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে একে তাদের বৃহত্তর অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসে এবং আমার ওপর সে দায়িত্ব অর্পণ করে। হাকীমুল উম্মতের উর্দু বইয়ের ভাষান্তর কর্ম আমার মতো অযোগ্যের জন্য দুঃসাহসিক চিন্তা। তবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-ছোঁয়ায় ক্ষুদ্র কীটের পক্ষেও বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেয়া কঠিন কিছুই না। তাই একমাত্র আল্লাহ্‌র রহমতের ভরসা করেই আমি এ কাজে অগ্রসর হই।

বলা বাহুল্য, অনুবাদকর্মে আমি হযরত হাকীমুল উম্মতের বিষয়-বক্তব্য তাঁরই ভঙ্গিতে পেশ করার চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস—তাঁর বলার ভঙ্গিই অন্তরকে প্রবল ঝাঁকুনি দেয় এবং তাঁর প্রভাব বলয়ে মানুষের হৃদয়-মন দারুণ আকর্ষণ করে। আলোচ্য গ্রন্থটির কোন কোন প্রসঙ্গ আমাদের বাংলাদেশী সমাজ-পরিবেশে পুরোপুরি মিল না-ও খেতে পারে। আমি বাদ দেইনি দুই কারণে ঃ (ক) মূল গ্রন্থকারের

বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করাই অনুবাদকের দায়িত্ব, (খ) বিষয়টি এমন মৌলিক নয় যে, এড়িয়ে যেতেই হবে। এখন মানগত দিক থেকে এ অনুবাদকর্ম কোন্ পর্যায়ের, ভাষার দ্যোতনা ক্লান্তিকর কি-না সে কথা পাঠকদের বিবেচ্য। তবে আল্লাহ্‌র ফযলে আমি পূর্ণ আস্থাশীল যে, গ্রন্থের মূল আবেদনের সাথে অনুবাদের নিবিড় সম্পর্কের কোথাও বিচ্যুতি ঘটেনি।

এ অনুবাদকর্মে আমার প্রেরণার উৎস সাহিত্য জগতের অন্যতম দিশারী, মাসিক মদীনা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের শুকরিয়া আদায় না করা অকৃতজ্ঞতার শামিল হবে। এ ছাড়া সাইয়্যেদ জহীরুল হক জহীরসহ আরো অনেকের কাছ থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে লক্ষ-কোটি বাংলাভাষী মুসলমানের মনের চাহিদা পূরণ এবং সন্দেহ ও যুগ-জিজ্ঞাসার ঘূর্ণিপাকে বিভ্রান্ত মানুষকে আলোর সন্ধান দিয়েছে।

পরিশেষে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ে দিকভ্রান্ত মানবতাকে আলোর ভুবনে পথ দেখাক, এর দুর্বার গতি প্রবাহে মুসলমানের নির্জীব অন্তর জাগ্রত হয়ে উঠুক—রাব্বুল আলামীনের দরবারে এটাই আমার সবিনয় মুনাজাত। রাব্বুল আলামীন! একে তুমি সার্থক করে তোলো, আমাদের সবার পক্ষ থেকে একে নাজাতের উসীলা হিসাবে কবূল করে নাও। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

কামরাঙ্গির চর (মুমিন বাগ), ঢাকা<br>রমযানুল মুবারক<br>১৪০৭ হিঃ

বিনীত<br>মুহাম্মাদ আবূ আশরাফ

# হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)

১৭০৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনাবসানের পরপরই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। সাথে সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিশেষত ধর্মীয় ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলিম সমাজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এহেন পতন যুগের গোড়ার দিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উত্তরসুরি শাহ্‌ আবদুর রহীম, শাহ্‌ আবদুল আযীয, শাহ্‌ ইসমাঈল শহীদ, সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী প্রমুখ বরেণ্য আলিম জাতিকে পতনের হাত থেকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অবশ্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও প্রতিকূলতার প্রেক্ষাপটে তাঁদের সে চেষ্টা আপাত ব্যর্থ হয়ে যায়। জাতীয় দুর্যোগের পরবর্তী পর্যায়ে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে সকল মুসলিম মনীষী হিমালয়ান উপমহাদেশে জন্মগ্রহণ করেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) তাঁদের অন্যতম।

**জন্মস্থান ঃ** উত্তর ভারতের মুজাফফরনগর জেলার অন্তর্গত 'থানাভূন' একটি ঐতিহ্যবাহী বর্ধিষ্ণু জনপদ। 'আইনে আকবরী'র বর্ণনা সূত্রে স্থানটি সংযুক্ত আগ্রা ও আওধের প্রসিদ্ধ অঞ্চল, যার কোলে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বহু মুসলিম মনীষা জন্মগ্রহণ করেন। এক কথায় 'থানাভূন' অঞ্চলটিকে বীর-প্রসূ এলাকা আখ্যায়িত করা আদৌ বাড়িয়ে বলা নয়। থানাভূন আদিতে রাজা ভীমের নামানুসারে 'থানাভীম' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বহুল প্রচলনে 'থানাভূনে' রূপান্তরিত হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত মুসলিম অভিজাত পরিবারগুলির বসতি স্থাপনের পর এক পর্যায়ে অঞ্চলটি জনৈক "ফতেহ মুহাম্মদের" নামানুসারে "মুহাম্মদপুর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। শাহী দলীলপত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে থানাভূন নামে এর পূর্ব পরিচিতি যথারীতি বহাল থাকে। পক্ষান্তরে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ইম্পেরিয়াল গেজেটের বর্ণনামতে, কোনও এক সময় এখানে সুপ্রসিদ্ধ ভবানী মন্দির অবস্থিত ছিল। সুতরাং উক্ত মন্দিরের সাথে সম্পৃক্ত করে পার্শ্ববর্তী জনপদ "থানাভূন" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আযাদী আন্দোলনের পূর্বে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার। বিপ্লবোত্তরকালে প্রথমত ৩৬ হাজার, এমন কি এক পর্যায়ে তা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৬/৭ হাজারে নেমে আসে। ঐতিহ্যবাহী থানাভূনের পার্শ্ববর্তী গাংগুহ, দেওবন্দ, কীরানা, ঝনঝানা, কান্দলা, পানিপত ইত্যাদি অঞ্চলের ঐতিহাসিক খ্যাতি রয়েছে।

মাওলানা থানভীর জন্মলগ্নে তাঁর পিতৃ-মাতৃ উভয়কুল থানাভূনের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। মাতৃকুলের উর্ধ্বতন পুরুষগণ ঝনঝানা থেকে আর সম্রাট আকবরের শাসনামলে তাঁর পিতৃকুলের জনৈক মাওলানা সদর জাহান থানেশ্বর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে থানাভূনে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন।

জন্ম ঃ মাওলানা থানভী (র) হিজরী ১২৮০ সনের ৫ই রবিউস্‌সানী বুধবার সুবহে সাদিকের সময় থানাভূনের 'খীল' মহল্লাস্থ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা হযরত উমর ফারুক (রা) আর মাতার দিক থেকে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাঁর মধ্যে হযরত উমর ও আলী (রা)—মহান দুই সাহাবীর রক্তধারা প্রবাহিত। অতএব, তাঁর সত্তা ফারুকী ও উলুভী রক্তপ্রবাহের মিলনকেন্দ্র বলা যায়।

তাঁর জন্ম ও নামকরণ সম্পর্কে বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত রয়েছে ঃ একবার তাঁর পিতা মুনশী আবদুল হক কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হন। সকল চিকিৎসা বিফল হওয়ার পর জনৈক ডাক্তার বললেন ঃ এর একটি মাত্র ঔষধ রয়েছে, যা সেবনে প্রজনন ক্ষমতা রহিত হওয়া অনিবার্য। রোগ যন্ত্রণায় অস্থির নিরুপায় পিতা প্রাণের মায়ায় অগত্যা তাই গ্রহণ করেন। তাঁর মা ও নানী ঘটনা অবগত হয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। কেননা তখনো পর্যন্ত তাদের কোনও পুত্র সন্তান বেঁচে ছিল না।

এরি মধ্যে ঘটনাক্রমে হাফেয গোলাম মুরতাযা পানিপতি (র) নামক জনৈক মজযূব ওলীআল্লাহ মাওলানা থানভীর নানাবাড়ি বেড়াতে আসেন। এক ফাঁকে নানী হাফেয সাহেবের নিকট ঘটনা জানিয়ে আবেদন করেন যে, আমার এ কন্যাটির কোন পুত্র সন্তান বেঁচে থাকে না। এর কোনও তদবীর নির্দেশ করুন। ঘটনা শুনে হাফেয সাহেব বললেন ঃ "উমর ও আলীর টানাহেঁচড়ায় সন্তানরা মারা যায়। আচ্ছা, এবার আলীর হাতে সোপর্দ করে দিও, বেঁচে থাকবে।" তাঁর এ ইঙ্গিতপূর্ণ অস্পষ্ট কথার মর্ম বোঝা উপস্থিত কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। দূরদর্শী থানভী-জননী এর মর্ম উদ্ধারে সক্ষম হন। তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন—হাফেয সাহেবের ইঙ্গিত-বাণীর মর্ম হলো—পুত্রদের পিতা ফারুকী আর মাতা উলুভী। এ যাবত এ বংশে যত ছেলের জন্ম হয়েছে 'ফযলে হক' ইত্যাদি পিতৃকুলের সাথে মিলিয়ে তাদের নাম রাখা হয়েছে। এখন থেকে যত ছেলে হবে শেষাংশ 'আলী' যোগে মাতৃবংশের সাথে মিলিয়ে নাম রাখবে। ব্যাখ্যা শুনে হাফেয সাহেব হেসে দিয়ে বললেন ঃ "ঠিকই বলেছ, আমার উদ্দেশ্য তাই ছিল। বাস্তবিক মেয়েটি বড় বুদ্ধিমতী মনে হয়।" অতঃপর হযরত থানভীর বিদুষী মায়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বললেন ঃ "এর দুটি ছেলে হবে এবং জীবিত থাকবে। একটির নাম আশরাফ আলী খাঁ, দ্বিতীয়টির নাম আকবর আলী খাঁ রাখবে।" নাম নেয়ার কালে মনের ঝোঁকে নিজের পক্ষ থেকে তিনি শেষাংশে 'খাঁ'

পদবী বাড়িয়ে দেন। উপস্থিত একজন জিজ্ঞেস করল ঃ হযরত ! তারা কি পাঠান হবে ? তিনি বললেন ঃ না, আশ্‌রাফ আলী ও আকবর আলী নাম রাখবে। তিনি আরো বললেন—উভয়ই হবে ভাগ্যবান। তাদের একজন হবে আমার এবং সে হাফেয-আলেম হবে। অপরজন হবে দুনিয়াদার। উত্তরকালে হাফেয গোলাম মুরতাযা মজযূবের সে ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথ বাস্তবে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, পিতৃকুলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল আবদুল গনী। এ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

**বাল্য জীবন ঃ** উক্ত বুযুর্গের ফয়েয ও বরকতে উল্লিখিত তারিখে মাওলানা থানভীর জন্মের প্রায় চৌদ্দ মাস পর তাঁর ছোট ভাই আকবর আলী জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় মায়ের দুধে দুই ভাইয়ের সংকুলান না হওয়ায় শিশুপুত্র আশরাফ আলীর জন্য জনৈকা মিরাঠি ধাত্রী নিয়োগ করা হয়। প্রায় পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মায়ের ইন্তিকালের পর তিনি প্রধানত পিতৃস্নেহে লালিত হন। বাল্যকাল থেকেই মাওলানা থানভী লেখাপড়ায় যেমন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী তদ্রূপ আচার-আচরণেও ছিলেন অনন্য শিষ্টাচারে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাল্য বয়সেই লেখাপড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও নামাযের প্রতি তিনি অস্বাভাবিক আসক্ত ছিলেন। এমনকি খেলার মধ্যেও সমবয়সীদের সারিবদ্ধ করে তিনি নামায নামায খেলায় মেতে উঠতেন। মাত্র ১২/১৩ বছর বয়সেই তিনি তীব্র শীতের মধ্যেও তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন।

**শিক্ষা জীবন ঃ** মিরাঠের দীনদার আলেম জনৈক আখুনজীর হাতে তাঁর হিফযে কুরআনের সূচনা হয়। তাঁর নিকট কয়েক পারা হিফয করার পর দিল্লীর প্রসিদ্ধ হাফেয হুসাইন আলী সাহেবের নিকট তিনি অবশিষ্ট হিফয সমাপ্ত করেন।

অতঃপর ফারসীর প্রাথমিক কিতাব মিরাঠের কয়েকজন ওস্তাদের নিকট, মাধ্যমিক কিতাব মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ সাহেবের নিকট আর শেষ পর্যায়ের কিতাব আপন মামা ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ উপস্থিত হন। বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায় তিনি মাত্র পাঁচ বছরে (হিঃ ১২৯৫-১৩০১) শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে এখানকার উচ্চতর সনদ হাসিল করেন।

স্বল্পতম শিক্ষা জীবনে তিনি আরবী, ফারসী, হাদীস, তাফসীর, ফাসাহাত, বালাগাত, ফিকাহ, মানতিক, ইলমে কালাম, দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা তদুপরি উলূমে যাহিরীর সাথে সাথে উলূমে বাতিনী তথা অধ্যাত্ম জ্ঞানেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

**কর্মজীবন ঃ** শিক্ষা জীবন সমাপনের পর পরই মাওলানা থানভী (র) কানপুরের প্রাচীনতম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ফয়যে আম' মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। দীর্ঘ

চৌদ্দ বছর সার্থক শিক্ষাদানের পর বিশেষ কারণে তিনি শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা দেন এবং জন্মভূমি থানাভূন ফিরে যান।

**বায়'আত গ্রহণ ঃ** হযরত মাওলানা থানভীর ছাত্র জীবনে তাঁর তরীকতের মুরশিদ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (র) মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন। মাওলানা থানভীর ছাত্রজীবনের শেষপাদে হিঃ ১২৯৯ সনে হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌র হাতে গায়েবানা বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর হিঃ ১৩০১ সনে পিতাসহ মাওলানা থানভী হজ্জে গমন করেন এবং তথায় পিতা-পুত্র উভয়ে হাজী সাহেবের হাতে সাক্ষাৎ বায়'আত হন। এর দশ বছর পর পুনরায় তিনি হজ্জে রওয়ানা হন এবং হজ্জের পর ছয় মাস স্বীয় মুরশিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে কাটিয়ে তরীকতের পথে উচ্চতর মাকাম অতিক্রম করেন। দ্বিতীয়বার হজ্জ সমাপনের পরই তাঁর চিন্তাধারা নতুন খাতে মোড় নেয়। এখন থেকে তিনি তরীকতের ভাবধারায় মানব চরিত্র সংশোধনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। সুতরাং হজ্জ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এক সময় শিক্ষকতায় ইস্তফা দেন এবং শায়খের নির্দেশে থানাভূনের রূহানী খানকায় ফিরে অধ্যাত্ম জীবন শুরু করেন । আমরণ এখানেই তিনি লাখো-হাজার বিভ্রান্ত মানুষকে অধ্যাত্ম পথের শিক্ষা ও দীক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। হিজরী ১৩১৫ সনে তাঁর খানকাই জীবন তথা তরীকতের পথে নব যাত্রা শুরু হয়।

**ওফাত ঃ** হিজরী ১৩৬২ সনের ১৬ রজব রোজ মঙ্গলবার (মুতাবিক ২০শে জুলাই ১৯৪২ খৃঃ) হিমালয়ান উপমহাদেশের কৃতী সন্তান, চতুর্দশ শতাব্দীর বিভ্রান্ত মানবতার নব দিগন্তের দিশারী, মুজাদ্দিদে জামান, যুগ-স্রষ্টা, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন।

**থানভী-রচনাবলী ঃ** হযরত মাওলানা থানভীর কর্মময় জীবনকে মোটামুটি দুই-ভাগে বিন্যাস দেয়া যায়। (ক) চরিত্র গঠন, (খ) রচনাবলী।

চরিত্র গঠন পর্যায়ে তাঁর শ্রম-সাধনা সার্থক বলা যায়। কেননা মাওলানা থানভী (র) এত অধিক পরিমাণে চরিত্র গঠন করেছেন যা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে বিরল। তাঁর তৈরী অসংখ্য দেশবরেণ্য আলিম বিশ্বজোড়া খ্যাতির শীর্ষে বিরাজমান। যাদের মধ্যে মাওলানা যুফর আহমদ উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, হাকীমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব, মাওলানা ইসহাক বর্ধমানী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা আতহার আলী সিলেটি, মাওলানা আবদুল ওহাব পিরজী, মাওলানা নূর বক্স সাহেব নোয়াখালী প্রমুখসহ আরো শত-সহস্র জাতীয় ও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে দীনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে হিদায়েতের আলো বিকিরণ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক

তথা বাস্তবের প্রতিটি অঙ্গন মাওলানা থানভীর গড়া মনীষীবৃন্দের অবদানে ধন্য, আগামী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যাঁদের কৃতিত্বের সফল ও গতিশীল প্রবাহ তীব্র ধারায় অব্যাহত থাকবে বলাটা অতিশয়োক্তি নয়।

দ্বিতীয়ত, চতুর্দশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী শতাব্দীসমূহের উম্মতে মুসলিমা তথা বিশ্ব মানবতার প্রতি হাকীমুল উম্মতের অপর অবদান তাঁর অসংখ্য মাওয়ায়েয ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী। কর্মময় জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি ব্যয় করেছেন এর পিছনে। জীবনের প্রতিটি দিক, প্রতিটি অঙ্গন তাঁর রচনা-স্বাক্ষরে ধন্য বলা যায়। সুতরাং হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, ফতোয়া, কালামশাস্ত্র, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র, মানতিক, ফালসাফা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে তাফসীর বয়ানুল কুরআন, তাবলীগ দীন, তালীমুদ্দীন, নশরুত্তিব, হায়াতুল মুসলিমীন, ফতোয়া ইমদাদিয়া, বেহেশ্তী জেওর, খুতবাতুল আহকাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত বয়ানুল কুরআন তাফসীর হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত। খুতবাতুল আহকাম আজকের উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদে পঠিত খুতবা আর বেহেশতী জেওরকে উপমহাদেশের শত্রু-মিত্র, পক্ষ-বিপক্ষ সকল পরিবারের পারিবারিক গ্রন্থ বলা যায়। কর্মময় জীবনের স্থায়ী কৃতিত্বের স্বাক্ষরস্বরূপ তাঁর রচিত, সংকলিত ও অনূদিত সহস্রাধিক গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র এগার খণ্ডে সমাপ্ত বেহেশতী জেওর গ্রন্থটি উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি মুসলিম পরিবারের অন্দর মহলে তাঁর আবেদন-অবদান পৌছে দিয়ে তাঁকে আপনজন ও গণমাওলানায় পরিণত করেছে। অধিকন্তু আলোচ্য গ্রন্থটিকে মুসলিম নারী জাতির প্রতি তাঁর একক ও অনন্য অবদান বলা যায়। মোট কথা, হযরত মাওলানা থানভীর লিখিত এ-বিপুলসংখ্যক কিতাব, গ্রন্থ ও মাওয়ায়েয মুসলিম মিল্লাতের প্রতি তাঁর চির অবদান একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

# সূচিপত্র

# প্রথম ভাগ

## ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**প্রশ্ন ঃ ১. ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে ?**

উত্তর ঃ (ক) তরবারির জোরেই যদি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত, তবে তাদের অন্তরে তরবারির স্থায়ী প্রভাব কিভাবে রেখাপাত করতে পারে ? অন্তরে এ জাতীয় প্রভাবের প্রমাণ হলো তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ নির্মল ও ইসলামী শরীয়তের শিক্ষার আলোকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠেছিল। হযরত আলী (রা)-এর বর্ম চুরি হয়ে গেলে জনৈক ইহুদীর নিকট তা পাওয়া যায়। তিনি বললেন ঃ এটা আমার বর্ম। ইহুদী বললো, তা-হলে সাক্ষী উপস্থিত করুন। আল্লাহু আকবার! নিজেকে তিনি ইসলামী শিক্ষার কি রকম এক দীপ্ত প্রতীক এবং বাস্তব নমুনারূপে গড়ে তুলেছিলেন যে, জনগণকে বাক-স্বাধীনতা তো দিয়েছেনই, তদুপরি নিজের কর্মের দ্বারাও অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। একজন ইহুদী পর্যন্ত মুসলিম জাহানের খলীফাকে "সাক্ষী উপস্থিত করুন" বলার সাহস করতে পারে। অথচ ইহুদীরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জাতি। হযরত মূসা (আ)-এর সাথে অবাধ্য আচরণ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা লাঞ্ছিত হয়েই জীবন কাটাচ্ছে এবং এখনো যেখানে যেখানে আছে অপমানের শিকার হয়েই বেঁচে আছে! কবি যথার্থই বলেছেন ঃ

عزیزے کہ از در گہش سر بتافت
بہر در کہ شدهیچ عزت نیافت

—মহান আল্লাহর দরবার থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে, যে কোন দরবারেই সে হাযির হোক কোন সম্মানই তার ভাগ্যে জুটবে না।

সুতরাং একে তো জাতিগতভাবে তারা লাঞ্ছিত জাতিরূপে চিহ্নিত, দ্বিতীয়ত তাঁর শাসনাধীনেই সে ইহুদী লোকটি বসবাস করছে। এহেন অবস্থায় তার এ দুঃসাহস! বন্ধুগণ, এটাই ছিল সত্যিকারের আজাদী। পক্ষান্তরে ইদানীং আজাদীর যে রূপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছে মূলত তা স্বাধীনতাই নয় ; কেননা আজাদীর নামে মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে বর্জন করে দীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ প্রকৃত আজাদী হলো কোন হকদারের মুখ বন্ধ না করা, কারো প্রতি জুলুম না করা। মহানবী

(সা)-এর অবস্থা ছিল এই যে, তাঁর কাছে জনৈক ইহুদীর কিছু পাওনা ছিল। একদিন মসজিদে হাযির হয়ে সে হুযূর (সা)-কে লক্ষ করে কিছু বেপরোয়া মন্তব্য করে বসলো। উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে ধমক দিয়ে উঠলেন। নবী করীম (সা) বললেন ঃ ان لصاحب الحق مقالا (অর্থাৎ পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে।)

সুতরাং সত্যিকারের স্বাধীনতা হলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় জনগণকে পূর্ণ বাক-স্বাধীনতা দান করা। অতএব হযরত আলী (রা) বাস্তব কর্মের মাধ্যমে এমন স্বাধীনতা দান করেছিলেন যে, একজন ইহুদীও বলতে পেরেছিল ঃ "সাক্ষী উপস্থিত করুন অথবা মোকদ্দমা দায়ের করুন।" সুতরাং হযরত আলী (রা) হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল থেকে বিচারকের পদে আসীন হযরত শুরাইহ্ (রা)-এর আদালতে মামলা দায়ের করলেন। বাদী ও বিবাদী হযরত আলী (রা) ও উল্লেখিত ইহুদী আদালতে হাযির হলেন। হযরত শুরাইহ্ (রা) শরীয়তের নীতি অনুসারে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। আমীরুল মু'মিনীনের আগমনের ফলে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন না। বরং প্রশান্তচিত্তে ইহুদীকে প্রশ্ন করলেন ঃ বিতর্কিত বর্মটি কি হযরত আলী (রা)-এর। সে অস্বীকার করল। অতঃপর হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ সাক্ষী পেশ করুন। আল্লাহু আকবার! লক্ষ করুন স্বাধীনতা কাকে বলে, অধীনস্থ একজন বিচারক স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনের নিকট সাক্ষী তলব করছেন। অথচ আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এটা কল্পনাই করা যায় না যে, তিনি কোন অন্যায় বা অবান্তর দাবি পেশ করবেন। কিন্তু এখানে ছিল নীতির প্রশ্ন। আল্লাহ্র কসম! সভ্যতা যারা শিখেছে ইসলাম থেকেই শিখেছে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলামের অনুরূপ আমল করতে সক্ষম হয়নি। যা হোক, হযরত আলী (রা) দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করলেন। একজন হযরত হাসান (রা) অপরজন 'কামবার' নামীয় তাঁর আযাদকৃত গোলাম। হযরত শুরাইহ্ (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিল যে, হযরত শুরাইহ্ (রা)-এর নিকট পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা) এটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। কাজেই তিনি হযরত হাসান (রা)-কে সাক্ষীরূপে পেশ করেছিলেন। দ্বিমত দেখা দিলে আজকাল আলিমগণকে গালমন্দ করা হয়, তাঁদের বিরূপ সমালোচনা করা হয়। অথচ পূর্ব থেকেই এ জাতীয় মতভেদ চলে আসছে। কিন্তু তখন বর্তমান যুগের মত আলিমগণের নামে কুৎসা ও নিন্দাবাদ রটনা করা হতো না। একে অপরকে কাফির ও গুমরাহ বলতেন না। ইদানীংকালের গালি-গালাজের পেছনে নিজেদের হীন স্বার্থ ছাড়াও এর এক বিশেষ কারণ এই যে, সর্বত্র নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি

বিদ্যমান। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পরস্পর মিলিত হয়ে প্রকৃত ঘটনা ও সমস্যার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোন চেষ্টাই করেন না। অধীনস্থ লোকেরা ঘটনার যে বিবরণ দেয় তাকেই যথার্থ বলে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু এ ধরনের বর্ণনাকারীকে সতর্ক করা হয় না।

মোট কথা, হযরত আলী (রা)-এর মতে (পিতার পক্ষে) পুত্রের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু হযরত শুরাইহ্ (রা) এ মত স্বীকার করতেন না। সুতরাং হযরত শুরাইহ্ (রা) স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর সাক্ষী বাতিল করে দিলেন এবং হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ গোলাম যেহেতু আযাদকৃত কাজেই তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু হযরত হাসান (রা)-এর স্থলে অন্য কোন সাক্ষী পেশ করুন। আলী (রা) বললেন ঃ অপর কোন সাক্ষী নেই। অতঃপর বিচারপতি হযরত শুরাইহ্ (রা) হযরত আলী (রা)-এর মামলা খারিজ করে দিলেন। লক্ষণীয় যে, বর্তমান কালের কোন শাসনকর্তা হলে শুরাইহ্ (রা)-এর সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিচারপতি হযরত শুরাইহ্ ও হযরত আলী (রা) তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ী ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন দীনের প্রতিটি হুকুমের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। শুরাইহ্ (রা)-কে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, তবে তিনি কসম খেয়ে হয়তো বলতেন যে, হযরত আলী (রা) সত্যবাদী। কিন্তু ইসলামী আইন ও শরীয়তের নীতিমালা যেহেতু এর অনুমতি দেয় না, কাজেই তিনি হযরত আলী (রা)-এর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভিত্তিতেই রায় দেননি। শেষ পর্যন্ত (শুরাইহ্-এর এজলাসের) বাইরে এসে প্রতিপক্ষ ইহুদী লোকটি লক্ষ করল, হযরত আলী (রা) (শারীরিক শক্তিতে) আসাদুল্লাহ্ (আল্লাহ্র বাঘ) এবং (রাজ শক্তিতে) স্বয়ং শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চেহারায় আদৌ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। কোন বিষয় তাঁকে ক্রোধান্বিত করেনি। মনে মনে চিন্তা করে সে বলল— "আসল রহস্য আমার এখন বুঝে এসেছে—তাঁর ধর্মই সঠিক ও সত্য। এটা তারই প্রভাব। তাই সে বলল—ধরুন, এটা আপনারই বর্ম আর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমি ঘোষণা করছি ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

তিনি বললেন ঃ এটি আমি তোমাকেই দিয়ে দিয়েছি। মোটকথা, সে ইহুদী মুসলমান হয়ে তাঁর সাহচর্যেই কাল কাটাতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত কোনও এক যুদ্ধে শাহাদতবরণ করল। এখন বলুন! সেকি মাথার উপর হযরত আলী

২—

(রা)-এর তলোয়ার দেখে মুসলমান হয়েছিল, না তা কোষবদ্ধ দেখে?

—ইযালাতুল গাফলত, পৃ. ৪

উত্তর ঃ (খ) ইউরোপীয়দের ধারণা—ইসলাম প্রচারে তলোয়ারের উপরই অধিক নির্ভর করা হয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে তারা মুসলিম সম্রাটদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহকে পেশ করার প্রয়াস চালিয়ে থাকে। আমি তাদেরকে বলতে চাই, "যুদ্ধ-বিগ্রহ সামগ্রিকভাবে সভ্যতা বিরোধী" কোন বিবেকবান ব্যক্তি একথা বলতে পারে না। বর্তমানকালের সভ্য জাতিসমূহও প্রয়োজনে যুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ করা সভ্যতার নিরিখে বৈধ। এসব কথা বলে অত্যাচারী শাসকদের পক্ষপাতিত্ব করা আমার উদ্দেশ্য নয় বরং খুলাফায়ে রাশিদীনের ব্যাপারে আমি পূর্ণ আস্থাসহ দাবি করে বলতে চাই যে, তাঁরা অযৌক্তিকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন নি, বরং কোনও সংগত কারণ এবং প্রয়োজনেই কেবল যুদ্ধের আশ্রয় নিতেন। ইসলামের যুদ্ধনীতি বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিগোচর হলে কখনো তারা একথা বলার সাহস পেত না যে, ইসলাম তলোয়ারের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। ইসলাম যুদ্ধ সংক্রান্ত বহুবিধ নীতি ও শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সংক্ষেপে একটি মাত্র বিষয় আমি এখানে বর্ণনা করছি।

শরীয়তের এ নীতির ওপর খুলাফায়ে রাশিদীনও সর্বদা আমল করেছেন যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যদি কোন লোক তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই তথা আত্মীয়কে হত্যা করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত রক্তপাত করতে থাকে এবং তারা কখনও পরাস্ত হলে তোমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে এমতাবস্থায় যদি সে মুখে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" উচ্চারণ করে, তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দাও। এমনকি যদি তোমার পূর্ণ বিশ্বাসও হয় যে, সে শুধু প্রাণ ভয়ে কালেমা পড়ছে অন্তরে আদৌ বিশ্বাস করেনি, তবুও সাথে সাথে তলোয়ার সরিয়ে নাও। এমনকি যদি বিদপমুক্ত হয়ে সে অন্য সময় তোমাদের হত্যা করবে বলে প্রবল আশংকাও থাকে তবুও। পরে যা হয় হবে কিন্তু ঐ মুহূর্তে তাকে হত্যা করা আদৌ জায়েয নয়। সুতরাং যে আদর্শ আত্মরক্ষার এমন অমোঘ ব্যবস্থা অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে তার পরেও কি কেউ সে আদর্শ সম্পর্কে বলতে পারে যে, ইসলাম বাহুবলে বা তলোয়ারের জোরে প্রচারিত হয়েছে? বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ইসলামের এ নীতি পুরোপুরি মেনে চলেছেন।

হরমুযান নামক এক ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল। অবশেষে বন্দী অবস্থায় তাকে হযরত উমর (রা)-এর দরবারে হাযির করা হয়। তিনি তার সামনে ইসলাম পেশ করলে ইসলাম গ্রহণ করতে সে অস্বীকার করে। ফলে তিনি

তাকে হত্যা করার হুকুম দেন। প্রতারণামূলকভাবে সে আরজ করলো ঃ "হত্যা তো আপনি করবেনই কিন্তু একটু পানি আনিয়ে দিন।" তাঁর হুকুমে পানি আনা হলো। তখন সে বলল, "আমার আশংকা হচ্ছে পানিটুকু পান করার পূর্বেই জল্লাদ আমার উপর তরবারি চালিয়ে দেবে।" তিনি বললেন—"না, পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না।" একথা শোনামাত্র সে পানিটুকু মাটিতে ঢেলে দিয়ে বলল—"আর আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। কেননা এখন এ পানি পান করা সম্ভব নয়, অথচ তা পান না করা পর্যন্ত আমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে।" তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উমর (রা)-এর স্বীয় ফরমান—"পানি পান না করা পর্যন্ত তোমাকে হত্যা করা হবে না"-এর ভিত্তিতে অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে না। এ ঘটনার পরক্ষণেই সে ইসলাম গ্রহণ করে নিল। যেহেতু সে লক্ষ করলো যে, বাস্তবিকই এটা সত্য দীন যাতে শত্রুর সাথে পর্যন্ত এরূপ নীতিভিত্তিক ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করা হয়।

এ ঘটনা উল্লেখ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো—ইসলামের শিক্ষা ও নীতি তুলে ধরা। খুলাফায়ে রাশিদীন এ নীতি এমনভাবে কার্যকর করেছেন যার কোন নজীর আজ পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারেনি। অবশ্য পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহ্দের কার্যকলাপের জন্য আমরা দায়ী নই। অন্যায়-অত্যাচার করে থাকলে তারা নিজেরা তার পরিণাম ভোগ করবেন। আমাদের মহান পূর্ব-পুরুষগণ এসব নীতি যথাযথভাবেই মেনে চলেছেন। ফলে তাঁরা মর্যাদার এত উচ্চ স্তরে পৌছেছিলেন যে, কোন জাতির ভাগ্যে তা জোটেনি। সাহাবীগণের রীতি-নীতি বিজাতীয়দের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, অনেকে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেও তাঁদেরকে দেখার পর মুসলমান হয়ে গিয়েছে। —শুয়াবুল ঈমান, পৃ. ১৪৪

উত্তর ঃ (গ) মানুষ দুর্নাম রটায় যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে। আল্লাহ্র কসম, এটা সর্বৈব মিথ্যা। মুসলমানগণ অস্ত্রবলেই যদি মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে থাকে, তবে ছয় শ' বছর শাসন করার পর ভারতে আজ একজন হিন্দুও দেখা যেত না। এ প্রশ্নের জবাবে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম (র) বলেছেন ঃ তরবারির জোরেই যদি ইসলাম প্রচারিত হয়ে থাকে, তবে বল—সে অস্ত্রধারী এল কোত্থেকে ? কেননা তলোয়ার নিজেই তো আর চলতে পারে না। সুতরাং প্রথম যারা তলোয়ার চালিয়েছিলেন, অবশ্যই তাঁরা তার ভয়ে মুসলমান হন নাই। কেননা সর্বপ্রথম অস্ত্রধারীই কেউ ছিলেন না। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম অস্ত্রের জোরে প্রচারিত

হয়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল হুযূর আকরাম (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর। আর মদীনাবাসীদের অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কোন্ তলোয়ার তাদেরকে মুসলমান করেছিল ? আর মক্কাতে যে কয়েক শ' লোক মুসলমান হন এবং কাফিরদের অত্যাচারে নিপিষ্ট হতে থাকেন, তাঁরা কোন্ তলোয়ারের ভয়ে মুসলমান হয়েছিলেন ? মদীনায় হিজরতের পূর্বে সাহাবীগণের একটি অংশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, সেখানে কুরাইশী কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। আবিসিনীয় সম্রাট নাজ্জাসী হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা)-এর মুখে কুরআনের শাশ্বতবাণী শুনে অঝরে কেঁদেছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাত এবং কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদান করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কে তাঁর উপর অস্ত্র ধরেছিল ? ইতিহাসে এ ধরনের শত শত প্রমাণ রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইসলাম কেবল আপন ন্যায়নীতির জোরেই প্রচারিত হয়েছে। বিশেষত আরবের যুদ্ধবাজ গোত্রসমূহের নিকট 'মরা' আর 'মারা' ছিল সাধারণ ব্যাপার। কোন মতবাদের নিকট নতি স্বীকার করে স্বীয় ধর্মমত ত্যাগ করা ছিল তাদের জন্য কলংকের বিষয়। সুতরাং এহেন আরবদের পক্ষে অস্ত্রের মুখে ইসলাম গ্রহণ করা কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন হতে পারে, তা হলে জিহাদ ফরয হলো কেন ? উত্তরে বলতে চাই এবং বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, ইসলামের হিফাজত ও নিরাপত্তার জন্যই জিহাদের ব্যবস্থা, প্রচারের জন্য নয়। দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য যা চিহ্নিত করতে না পারার কারণে মানুষ ভ্রান্তিতে পড়ে আছে।

বস্তুত জিহাদকে অস্ত্রোপচারের সাথে তুলনা করা চলে। কেননা রোগ-জীবাণু দু'রকম হয়ে থাকে। (১) সংক্রামক, (২) অসংক্রামক। দ্বিতীয় প্রকারের রোগের বেলায় মলম কিংবা মালিশ ব্যবহারে নিরাময় হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমটির বেলায় রোগের জীবাণু ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রোপচারের আশ্রয় নিতে হয়। তদ্রূপ ইসলামের দুশমনও দু'ধরনের হয়ে থাকে। কোন শত্রুর সাথে সন্ধি করে নিলেই তারা মুসলমানদের উপর অন্যায়-অত্যাচার থেকে বিরত থাকে। কাজেই তাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি করে নেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু কোন কোন শত্রু এমনই হিংস্র হয় যে, তারা সন্ধিতে আসতে রাযী নয়। ফলে তখন সংক্রামক ব্যাধির মত অস্ত্রোপচার অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরি নাম জিহাদ। এর দ্বারা মানুষকে মুসলমান বানানো উদ্দেশ্য নয় বরং মুসলমানদের হিফাজত করাই জিহাদের মুখ্য বিষয়। মানুষ বাদশাহ্ আলমগীর

(র)-এর দুর্নাম রটনা করে যে, তিনি বলপূর্বক হিন্দুদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। এ অভিযোগ নিতান্ত ভুল ও মিথ্যা। বস্তুত তিনি ছিলেন শরীয়তের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং একজন পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তি। এক হাজার তিনটি হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। স্বহস্তে কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরী করে তার হাদিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ ছিল তাঁর আয়ের একমাত্র উৎস। এরই দ্বারা তিনি সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন, রাজকোষ থেকে এক কপর্দকও তিনি ব্যক্তিগত ও সাংসারিক প্রয়োজনে গ্রহণ করতেন না, আর لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (দীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই)-এর হুকুম তাঁর সামনে মওজুদ ছিল। এর পরিপন্থী কাজ তাঁর দ্বারা কেমন করে সংঘটিত হতে পারে ? এতো গেল অতীতের ঘটনা। সে কথা বাদ দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বেশ—বর্তমানে ভারতের যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করে, তারা কেন মুসলমান হয় ? তাদের উপর কোন্ অস্ত্র, কোন্ শক্তি ক্রিয়াশীল ? এখন তো তাদের উপর নিশ্চয়ই কোন শক্তির চাপ নেই, ক্ষমতার দাপট নেই। বরং সবদিক থেকেই তারা স্বাধীন ও মুক্ত। আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে কোনরূপ লোভও দেখানো হয় না। বৈষয়িক লোভ দেখাবার মত সামর্থ্যই বা মুসলমানদের কোথায়! পক্ষান্তরে বাস্তব সত্য এই যে, আজ যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে পরের দিনই তার নিকট দীনী কাজের জন্য চাঁদা চাওয়া হয়। আর ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তে কেউ যদি অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায়, তার প্রতি আমাদের পরিষ্কার জবাব—নিজের নাজাতের জন্য তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে করতে পার নতুবা টাকার লোভ দেখিয়ে তোমাকে মুসলমান বানানোর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অবশ্য (ঈমানের) যে সম্পদ আমরা তোমাকে দান করছি তার বিনিময়ে তুমিই যদি আমাদেরকে নজরানা দান কর, তবে তা-ই হবে যথার্থ। কিন্তু এ স্বাধীনতা ও বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। আর মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যেন হারানো মানিক হাতে পেল। কোন এক হিন্দু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ্র প্রেমে এত কাঁদত যা বর্ণনার অতীত। সে বলত ঃ আল্লাহ্র প্রকৃত পরিচয় এখন আমি জানতে পেরেছি। সার কথা, তার মধ্যে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। —মাহাসিনে-ইসলাম, পৃ. ৭৮

**প্রশ্ন ঃ ২. আল্লাহ্ কি কাফিরদেরকে ক্ষমা করতে সক্ষম নন ?**

উত্তর ঃ ইসলাম এমন বিষয় যার মাধ্যম ছাড়া নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। এর অর্থ আবার এই নয় যে, আল্লাহ্ পাক কাফিরদের ক্ষমা করতে সক্ষম নন। বরং এর মর্ম হলো—তাদের মাগফেরাত বা পারলৌকিক মুক্তি তাঁর কাম্য নয় যদিও তিনি

মুক্তিদানে অবশ্যই সক্ষম। অন্যথায় "কাফেরকে শাস্তি দানে তিনি বাধ্য" একথা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বাধ্য হওয়া তাঁর সত্তার অনিবার্যতার পরিপন্থী। ঈমান ও ইসলাম ব্যতীত কারো ক্ষমা আল্লাহ্‌র নিকট কাম্য নয়। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একথা বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ ۔

—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করাকে আদৌ ক্ষমা করবেন না।

এখানে কারো মনে হয়তো সন্দেহ হতে পারে যে, আয়াতে তো কেবল মুশরিকদের কথাই বলা হয়েছে, কাফেরদের সম্পর্কে নয়। অথচ কোন কোন কাফের এমনও আছে যারা মুশরিক নয়, বরং মুয়াহ্‌হিদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী, কিন্তু ইসলামকে অস্বীকার করে। সুতরাং তাদের যে ক্ষমা হবে না আলোচ্য আয়াতে এরই উল্লেখ কোথায় ? এ পর্যায়ে—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۔

—আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করে তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে, তারাই হলো নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।

আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে কাফেরকে আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের অংশ বলা হয়েছে আর উভয়ই অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এর দ্বারাও কাফেরদের ক্ষমা না পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে আরো একটি সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, আয়াতে কেবল 'খুলূদ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে যার অর্থ—"দীর্ঘদিন অবস্থান করা"। এর দ্বারা 'দাওয়াম' তথা চিরকাল অবস্থান করা বোঝায় না ? এর জবাব হলো—'দাওয়াম' শব্দটি 'খুলূদের' পরিপন্থী নয়। কাজেই কোন নিদর্শন পাওয়া গেলে খুলূদ শব্দটি দাওয়াম অর্থে ব্যবহৃত হতে কোন অসুবিধে নেই। আর এখানে খুলূদ শব্দটি যে দাওয়াম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার ইঙ্গিত বা নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তা হলো মুশরিকদের বেলায় খুলূদ অর্থ দাওয়ামই নির্ধারিত। দ্বিতীয়ত, আয়াতে কাফের ও মুশরিক উভয়ের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। কাজেই মুশরিকের ক্ষেত্রে যখন খুলূদ অর্থ দাওয়াম সুতরাং কাফেরের ক্ষেত্রেও একই অর্থ প্রযোজ্য। অন্যথায় বাক্যের একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ও একাধিক অর্থ প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে, যা সিদ্ধ নয়। তদুপরি কোন কোন আয়াতে কাফেরের বেলায় খুলূদকে দাওয়াম অর্থে বিশেষিতও করা হয়েছে।

সুতরাং বলা হয়েছে ঃ

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ – الى قوله تعالى : كُلَّمَا اَرَدُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ·

—যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক....... যখনি তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে তখনি তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ·

—যারা কুফরী করে এবং আল্লাহ্‌র পথে আসতে মানুষকে নিবৃত্ত করে অতঃপর কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

সুতরাং এর দ্বারা কাফেরের শাস্তি চিরকালীন হবে বলে প্রমাণ হয়, যদ্দ্বারা তার ক্ষমা না হওয়াই প্রতীয়মান হয়ে যায়। এখানে সম্ভাব্য অপর একটি প্রশ্নের জবাবও হয়ে যায়। প্রশ্নটি হলো ঃ "কাতেলে আমাদ" অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا ·

—কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়িভাবে থাকবে।

কাজেই এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যাকারীর তওবা কবূল হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। এর জবাব হলো—আলোচ্য আয়াতে খুলূদ শব্দটি কোন বিশেষণ ছাড়াই উল্লেখিত হয়েছে। আর খুলূদ শব্দটি দাওয়াম অর্থে গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। দ্বিতীয়ত, দাওয়াম অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য কোন নিদর্শনও এখানে নেই। সুতরাং আয়াতের মর্ম এতটুকুতেই সীমিত রাখতে হবে যে, কাতেলে আমাদ দীর্ঘদিন ব্যাপী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং দীর্ঘদিন পরে হলেও অবশেষে এক সময় সে মুক্তি পাবে। অতএব, সে যখন মুক্তিযোগ্য বলে সাব্যস্ত হচ্ছে তখন তার তওবা কবূল হওয়াও যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতভেদ রয়েছে। তাঁর মতে, কাতেলে আমাদের তওবা কবূলযোগ্য নয়। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীর মতে তার তওবা গ্রহণযোগ্য। অতঃপর তাবেয়ীন, তাবা' তাবেয়ীন এবং ইমামগণের এ ব্যাপারে ইজ্‌মা' বা

সর্বসম্মত মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তার তওবা কবূলযোগ্য যদি তা শরীয়তের বিধানানুসারে হয়। বস্তুত শরীয়তের মূলনীতি রয়েছে যে, পরবর্তীগণের ইজমা দ্বারা পূর্ববর্তীগণের মতভেদ দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং বিষয়টি এখন ইজমার ভিত্তিতে সর্বজনস্বীকৃত। পক্ষান্তরে কাফের ও মুশরিকদের ব্যাপারে অপর এক আয়াতে খুলূদের সাথে দাওয়ামেরও উল্লেখ রয়েছে। কাজেই তাদের বেলায় মাগফিরাতের কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে না। কেননা খুলূদ অর্থ দীর্ঘদিন অবস্থান করা। আর 'আবাদ' বলা হয় যার কোন শেষ বা অন্ত নেই। সার কথা, কাফের বা মুশরিকরা জাহান্নামে এত দীর্ঘদিন অবস্থান করবে যে, তার কোন শেষ বা অন্ত নেই। বস্তুত কুফর বলা হয়—ইসলামের বিপরীত জিনিসকে, এর সাথে শির্কযুক্ত থাকুক বা না থাকুক। উভয়ের শাস্তিই অনন্তকালব্যাপী জাহান্নামবাস। অতএব, ইসলাম পরিত্যাগ করার সাজা যখন এই, তখন এর দ্বারাই ইসলামের ফযীলত, মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ১৭

**প্রশ্ন ঃ ৩. জিহ্বা ছাড়া আল্লাহ্ পাক কিভাবে কথা বলেন ?**

উত্তর ঃ একজন হিন্দু যোগী অপর এক হিন্দু পণ্ডিতসহ একবার আমার কাছে আসেন এবং প্রশ্ন করেন ঃ আপনারা কুরআন শরীফকে "আল্লাহ্র কালাম" নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু জিহ্বা ছাড়া কালাম হতে পারে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার জিহ্বা নেই। তাহলে তিনি কিভাবে কালাম করলেন ? জবাবে আমি বললাম—কথা বলার জন্য অবশ্য জিহ্বার প্রয়োজন কিন্তু স্বয়ং জিহ্বার কথা বলার জন্য জিহ্বার প্রয়োজন নেই। সে তার নিজের সত্তা বলে কথা বলে থাকে। তেমনি আমরা কান দ্বারা শুনে থাকি কিন্তু কান তার নিজ ক্ষমতায়ই শুনে থাকে। এজন্য তার অন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। দেখার জন্য আমাদের চোখের প্রয়োজন। কিন্তু চোখের কোন চোখের প্রয়োজন পড়ে না, সে তার আপন ক্ষমতায় দেখে থাকে। তাই জবান বা জিহ্বা যখন জিহ্বা ছাড়া কথা বলতে সক্ষম অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলারও কথা বলার জন্য কোন কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। তাই সিফাতে কালাম বা কথা বলার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য স্বয়ং তাঁর সত্তায় বিদ্যমান থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। তাঁর সত্তা থেকে বিনা যবানে কালাম বা কথা জারি হয়ে থাকে। এ জবাব শুনে সে হিন্দু ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হয়ে সঙ্গীকে বলতে লাগলেন ঃ "দেখ, একেই বলে ইল্ম বা জ্ঞান।" তিনি আরো বললেন ঃ ইতিপূর্বে এমন উত্তর আমার কল্পনায়ও ছিল না। আলহামদু লিল্লাহ্! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপস্থিত ক্ষেত্রে এ জবাব আমার কল্পনায় হাযির হয়ে যায়। —মুজাদালাতে মা'দিলাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩

**প্রশ্ন ঃ ৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফ্‌রীর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব কেন? অথচ অপরাধের মাত্রা অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত ?**

উত্তর ঃ (ক) এর জবাবে বলা যায়—"অপরাধের মাত্রা অনুপাতে শাস্তি হওয়া উচিত" আপনার এ যুক্তি স্বীকৃত। কিন্তু 'ঔচিত্যের' অর্থ কি এই যে, অপরাধ ও শাস্তির সময়কালও একই মাত্রা এবং সমপরিমাণের হতে হবে ? যদি তাই হয়, তবে একস্থানে দু'ঘণ্টা ডাকাতির পর ডাকাতকে গ্রেফতার করে আনা হলে বিচারক কি তাকে সে অনুপাতে মাত্র দু'ঘণ্টার সাজাই দেবেন ? বিচারক যদি তাই করেন তবে আপনি কি তাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেবেন ? আর এটা অপরাধ অনুপাতে বিচার হয়েছে বলে স্বীকার করে নেবেন ? আদৌ নয়। এতে বোঝা গেল যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের অর্থ এই নয় যে, উভয়টির সময়কালও সমপরিমাণ হতে হবে। বরং এর অর্থ এই যে, অপরাধের গুরুত্ব অনুপাতে শাস্তি বিধান করতে হবে। এখন পাঠকবর্গই বিবেচনা করুন, শরীয়ত কুফরীর যে শাস্তি বিধান করেছে তা কুফরীর মতো গুরুতর অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে কি-না। আর এ অপরাধ মারাত্মক কিনা ? হয়তো আপনারা বলতে পারেন, অপরাধ তো মারাত্মক বটে কিন্তু এত জঘন্য নয় যে, তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম হতে হবে। তাহলে আমি বলতে চাই যে, আপনারা শুধু কর্মের বাহ্যিক দিকের প্রতি নজর করার ফলেই আপনাদের এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সাজা ও প্রতিফলের ভিত্তি কেবল বাহ্যিক অবস্থার উপর স্থাপিত নয়। এখানে উদ্দেশ্যেরও একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বরং এক ধাপ উপরে উঠে একথাই বলা সঙ্গত যে, 'উদ্দেশ্যই' হলো এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি। সুতরাং কেউ যদি ধোঁকায় পড়ে শরাব পান করে, তবে তার গুনাহ্ হবে না। যদিও বাহ্যত এতে গুনাহের রূপ বিদ্যমান। কেননা এক্ষেত্রে তার নিয়ত ছিল না। পক্ষান্তরে কেউ যদি শরাব পানের উদ্দেশ্যে মদের দোকানে যায় আর দোকানদার মদের পরিবর্তে অন্য কোন শরবত তার হাতে তুলে দেয় আর শরাব মনে করে সে তাই পান করে তবে সে গুনাহ্গার হবে। কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল শরাব পান করা। এ কারণে ফকীহ্গণ বলেছেন ঃ কোন লোক যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর অন্ধকারে সে মনে করে এ আমার স্ত্রী নয়, বরং অন্য পর নারী, তবে গুনাহ্গার হবে। অনুরূপভাবে সহবাসকালে যদি মনে মনে ধারণা করে যে, আমি অমুক নারীর সাথে সহবাস করছি আর কল্পনায় তার চিত্র ফুটে ওঠে এবং কামনার স্বাদ আস্বাদন করে এমতাবস্থায় সে গুনাহ্গার হবে। পক্ষান্তরে কারো বাসর ঘরে বাড়ির মহিলাগণ যদি তার স্ত্রীর পরিবর্তে ভুল করে অন্য কোন মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় আর সে আপন স্ত্রী মনে করে তার সাথে সহবাস

করে, তবে এতে তার গুনাহ্ হবে না এবং এ সহবাস যিনার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং "ওয়াতী বিশ্‌শুবাহ্" অর্থাৎ "সন্দেহযুক্ত সহবাস" রূপে গণ্য হবে। এর দ্বারা তার বংশধারা প্রমাণিত হবে এবং মেয়েটির উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। এ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর জেনে নিন, কাফেরের কুফরী দৃশ্যত যদিও নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার নিয়ত ছিল এই যে, যদি বেঁচে থাকি তবে চিরদিন এ অবস্থায়ই জীবন কাটিয়ে দেব। কাজেই তার নিয়ত অনুযায়ী চিরকাল তাকে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে। তেমনি মুসলমানের ইসলাম যদিওবা সময়ের আবর্তে গণ্ডিভুক্ত কিন্তু যেহেতু তার উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদি চিরদিন বেঁচে থাকি, তবে ইসলামের উপরই কায়েম থাকব। কাজেই এর প্রতিদানস্বরূপ চিরদিন সে জান্নাতে বাস করবে।

উত্তর ঃ (খ) অপর একটি সূক্ষ্ম জবাব হলো, কুফরীর ফলে আল্লাহ্‌র হক (حقوق الله) বিনষ্ট হয়। আর আল্লাহ্‌র হক সীমাহীন। তাই এর সাজাও সীমাহীনই হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে ইসলাম দ্বারা আল্লাহ্‌র হক পালন ও আদায় করা হয় আর তাও অসীম। তাই এর প্রতিদানও অসীম হওয়া উচিত। আলহামদুলিল্লাহ্, এর দ্বারা এ প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা হয়ে গেল। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ২০

**প্রশ্ন ঃ ৫. মুসলমানগণ কা'বা ঘরের পূজা করে থাকে।**

উত্তর ঃ কা'বাঘরের পূজা নয় বরং আমরা কেবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি মাত্র। এর বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ আমাদের রয়েছে।

(ক) আমরা নিজেরাই এর উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করি। বলা বাহুল্য পূজারী কখনো স্বীয় উপাস্যের উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করতে পারে না।

(খ) নামায পড়া অবস্থায় কারো মনে যদি কাবা ঘরের কল্পনা আদৌ না থাকে অথচ সে কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ে তবু তার নামায শুদ্ধ হবে। সুতরাং বহু লোক এমনও রয়েছে, যারা মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়ে, কিন্তু কা'বাঘরের কথা আদৌ তাদের মনেই জাগে না, তা সত্ত্বেও তাদের নামায শুদ্ধ হয়। কা'বার ইবাদত করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হতো, তবে এর নিয়ত শর্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ বাস্তব তা নয়।

(গ) কোন সময় যদি কা'বার অস্তিত্ব না-ও থাকে তবু নামায ফরয হওয়ার হুকুম বহাল থাকবে এবং সেদিকে মুখ করেই নামায আদায় করতে হবে। কাজেই মুসলমানরা পাথর ও ইটের ইবাদত করে না। অন্যথায় কোন সময় কা'বা ঘর বিনষ্ট হয়ে গেলে নামাযের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

(ঘ) কা'বা ঘরের ছাদের উপর কেউ নামায পড়লে সেটাও জায়েয। সুতরাং কা'বা শরীফ যদি মুসলমানদের মা'বূদ হয়ে থাকে, তবে তার উপর চড়ে নামায পড়া জায়েয হতো না। কেননা এখন তার সামনে কিছুই নাই। দ্বিতীয়ত মা'বূদ তথা উপাস্যের উপর আরোহণ করা বে-আদবীর শামিল। তাই এমতাবস্থায় নামায সিদ্ধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু কা'বা শরীফের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া বিশুদ্ধ বলে ফকীহ্গণ মত প্রকাশ করেছেন। তবে কি এটা মা'বূদের ওপর আরোহণ করার সমতুল্য ? হয়তো বা প্রশ্নকারিগণ বিষয়টিকে নিজেদের সাথে তুলনা করে নিয়েছেন যে, একদিকে তারা গরু-গাভীকে দেবতা ও উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করে ; অপরদিকে এর উপর সওয়ারও হয়। এটা বিবেক বিরুদ্ধ কাজ।

এখন "ইসতিকবালে কিবলা" অর্থাৎ কেবলামুখী হওয়ার রহস্য হলো—একাগ্রতা ও মনের নিবিষ্টতা যা ইবাদতের প্রাণ, তার অবর্তমানে ইবাদত কেবল প্রাণহীন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেরই সমষ্টিমাত্র। আর এটা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—সকল ধর্মমতের লোকই যা স্বীকার করে থাকেন। অধিকন্তু অন্তরে একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা সৃষ্টির অন্তরালে বাহ্যিক আকারের একটা কার্যকর ভূমিকা রয়েছে, সে কারণে নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখার আদেশ এবং অন্যত্র মনোযোগ দেয়া ও অনর্থ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তদুপরি কাতার সোজা করার হুকুম রয়েছে। কেননা কাতার বাঁকা হবার ফলে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। সাধারণ লোকের অন্তর সম্ভবত এটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। যেহেতু নিবিষ্টতা তাদের মনে খুব কমই হয়ে থাকে। কিন্তু নামাযে একাগ্রতা যাদের অর্জিত হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—কাতার সোজা না হবার ফলে তাদের মনে যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সূফী-সাধকগণ কসম খেয়ে বলেন—কাতার বাঁকা হলে অন্তর বিচলিত হয়ে পড়ে। একনিষ্ঠতা অর্জনের জন্যই সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ওপর তাকীদ করা হয়েছে। কেননা এদিক সেদিক দৃষ্টিপাতের দ্বারাও নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং নামাযে নির্দিষ্ট একটা দিক নির্ধারণ করা না হলে প্রত্যেকেই নিজের খেয়াল-খুশীমত যেকোন দিকে মুখ করে নামায পড়তে থাকবে। ভিন্নমুখী দিক ও আকৃতির ফলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই এই উদ্দেশ্যে বিশেষ একটা দিক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—তাহলে কা'বার দিকটাই নির্ধারণ করার কারণ কি ? দিকতো আরও রয়েছে ? এটা অবান্তর কথা—এ প্রশ্ন করার কারো অধিকার নেই। কেননা সব ক্ষেত্রেই এটা কেন হলো ? ওটা কেন হলো না? ইত্যাদি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। লক্ষ করুন, আদালত কর্তৃক বিচারকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাচারির একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয় যে, এতটা

থেকে এতটা পর্যন্ত অফিসের কাজকর্ম চলবে। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন কি ? জবাবে বলা হবে দু' কারণে—একেতো নির্দিষ্ট সময়ে সকল কর্মচারী যাতে উপস্থিত হতে পারে, দ্বিতীয়ত, জনসাধারণেরও যাতে জানা থাকে যে, কোর্ট অমুক সময় বসবে। কাজেই অন্য সময় ব্যক্তিগত কাজকর্ম সমাধা করে নিশ্চিন্তে সবাই যেন সময়মত উপস্থিত থাকতে পারে। পক্ষান্তরে সময় যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া না হয়, তবে হাকিমের অপেক্ষায় সবাইকে সারাদিন কাচারিতেই পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু অফিসের জন্য দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত সময়টাই কেন নির্দিষ্ট করা হলো ? অন্য সময় হলেই বা ক্ষতি কি ছিল ? এখানে এ ধরনের প্রশ্নের কোন অবকাশই নেই। কেননা সময় যেটা-ই ঠিক করা হোক প্রশ্ন থেকেই যাবে। সুতরাং নামাযের জন্য কা'বার দিকটাই কেন নির্দিষ্ট করা হলো—এর ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করি না। অবশ্য একটা দিক নির্দিষ্ট করার গূঢ় রহস্য ও উপকারিতা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটা তো হলো প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক জবাব। কিন্তু একজন খোদাভক্তের সামনে জবাব হলো—কোন্ দিকটাতে আল্লাহ্ পাকের আকর্ষণ বেশি সেটা তিনিই সম্যক অবগত। তাই যে দিকে তাঁর আকর্ষণের মাত্রা বেশি ছিল সেটাকেই নামাযের জন্য দিক হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর পরও কথা থাকে—এটা কি করে বোঝা গেল যে, কা'বার দিকেই তাঁর আকর্ষণ অধিক পরিমাণে রয়েছে ? এ পর্যায়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, বাস্তবিকই খোদায়ী নূরের তাজাল্লী তথা বিকিরণ কা'বার উপর অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। এটাই হলো আকর্ষণের অর্থ, যা কা'বার আসল প্রাণ। এ কারণেই কা'বাঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া বৈধ। কেননা এমতাবস্থায় যদিও কা'বার দৃশ্যমান আকৃতি সামনে থেকে অনুপস্থিত কিন্তু কা'বার আসল প্রাণ তথা খোদায়ী নূরের বিকিরণ সামনে রয়েছে। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, মুসলমানগণ কা'বাঘরের দেয়াল নয় বরং খোদায়ী তাজাল্লীকে সামনে রেখেই নামায পড়ে। কিন্তু সবাই যেহেতু এটা অনুভব করতে সক্ষম নয়, কাজেই মহান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট একটা স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছেন, অন্যান্য স্থানের তুলনায় যার ওপর তাঁর নূরের বিকাশ-বিকিরণ অধিক পরিমাণে ঘটে থাকে। সুতরাং এ ভবনটি কেবল সে মহিমাময় তাজাল্লীর প্রকাশকেন্দ্র মাত্র। নতুবা ভবনটি কোন মূল উদ্দেশ্য নয় বা এর কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। এ জন্যই কা'বাঘর কখনো বিলীন হয়ে গেলে নামায রহিত হবে না। এর ছাদের উপর নামায পড়া বিশুদ্ধ হওয়াটাই এর প্রমাণ। ফকীহ্গণ এ রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজেই তাঁরা বলেন— প্রকৃতপক্ষে কেবলা হলো কা'বাঘরের সমান্তরালে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে পাতালের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু কা'বার ভবন

এবং স্থান খোদায়ী নূরের তাজাল্লীর সাথে সম্পৃক্ত হবার কারণে এটাও বরকতময় স্থানে রূপান্তরিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ঃ ৬. চুম্বনের মাধ্যমে মুসলমানগণ হাজরে আসওয়াদের ইবাদতে লিপ্ত হয় না কি ?**

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে পাথর চুম্বন করাটা মূলত শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয় বরং এটা মহব্বত ও ভালবাসার প্রতীক। যেমন মানুষ স্ত্রী-সন্তানকে চুমো খেয়ে থাকে। চুম্বন করা যদি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়, তবে প্রত্যেকেই আপন স্ত্রীর ইবাদত করে থাকে। অথচ এটা একেবারে অবান্তর কথা। কাজেই বোঝা গেল, চুম্বন করা দ্বারা ইবাদত করা ও সম্মান প্রদর্শন করা প্রমাণ হয় না। বরং ভালবাসার কারণেও চুম্বন হতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে—হাজরে আসওয়াদকে আপনারা ভালবাসেন কেন? এর জবাবে আমার কথা হলো—এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা প্রতিপক্ষের অধিকার বহির্ভূত। লক্ষ করুন, কোন ব্যক্তি যদি এ মর্মে আদালতে মামলা দায়ের করে যে, আমি অমুক বাড়ির মালিক ও স্বত্বাধিকারী, তখন তার নিকট প্রমাণ চাওয়া হবে। সে যদি প্রমাণ উপস্থিত করতে সক্ষম হয় তাহলে প্রতিপক্ষের এ দাবি উত্থাপনের অধিকার নেই যে, স্বীকার করে নিলাম বাড়ি তোমারই কিন্তু এর ভিতর কি কি মালামাল রয়েছে সেগুলোও তোমাকে শনাক্ত করতে হবে। অথবা কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে চুম্বন করাতে "একাজ কেন করলে ?" তাকে এ প্রশ্ন করা হলে—সে যদি উত্তরে বলে "ভালবাসার আবেগে, প্রীতির মোহে" তখন তার প্রতি এ প্রশ্ন অবান্তর—"স্ত্রীর প্রতি তোমার অনুরাগ কেন ? দিন-রাত কতবার তুমি চুমো খেয়ে থাক ?" এর অর্থ এটা নয় যে, হাজরে আসওয়াদকে ভালবাসার কারণ ব্যাখ্যা করতে আমরা অপারক। বরং প্রতিপক্ষের প্রশ্ন করার অধিকারের সীমা পর্যন্তই উত্তর সীমিত হওয়া উচিত। অধিকার বহির্ভূত প্রশ্নের জবাব না দেয়া-ই সমীচীন। এক্ষেত্রে তাকে পরিষ্কার বলে দেয়া উচিত, এ ধরনের প্রশ্ন করার তোমার কোন অধিকার নেই। কেননা বিরুদ্ধবাদীদের বোধশক্তি সকল কথার রহস্য অনুধাবনের যোগ্য নয়। সূক্ষ্ম বিষয় তাদের সামনে ব্যক্ত না করাই উত্তম। কেউ কেউ বিস্মিত হয় যে, এমন কোন কারণ রয়েছে যা আমরা বুঝতে অক্ষম, আমরাও তো মানুষ ? সূক্ষ্ম বিষয় ব্যক্ত করা হলে আমরা তার মর্ম বুঝতে না পারার কোন কারণ থাকতে পারে না। আমি বলতে চাই যদি তা-ই হয়, তবে কোন গণিতজ্ঞের কাছে আমার অনুরোধ—অংকের সূত্র ও প্রাথমিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ একজন মূর্খ লোককে উকলিদাসের একটি ফর্মূলা বুঝিয়ে দেয়া হোক। নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করবেন যে,

এমন ব্যক্তিকে উকলিদাসের ফর্মূলা বুঝানো সাধ্যের অতীত। কিন্তু কেন ? সেকি মানুষ নয় ? বস্তুত কথা হলো—এমন এমন বিষয়ও রয়েছে যা বুঝতে হলে সর্বাগ্রে এর আনুষঙ্গিক ভূমিকা, কতগুলো প্রাথমিক সূত্র ও ধারা জেনে নেয়া অপরিহার্য। সে সবের জ্ঞান লাভের পর-ই কেবল কোন ব্যক্তি বিষয়টি বুঝে উঠতে পারে। ব্যক্তি মাত্রই যে সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না—এটা অতি সাধারণ কথা। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, আজকালের তথাকথিত জ্ঞানবানরা এ মোটা কথাটা বুঝতে চান না। যাহোক, এ পর্যায়ে এর আনুষঙ্গিক রহস্য আমি বর্ণনা করছি। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এটা মূলত সম্মান কিংবা ইবাদত হিসেবে করা হয় না, বরং হৃদয়ের একান্ত আবেগ-অনুরাগই এর পিছনে ক্রিয়াশীল। সুতরাং হযরত উমর (রা) এক বিরাট সমাবেশে এর রহস্য উন্মোচন করেছেন। একদল গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে একবার তওয়াফ করার কালে চুম্বনের উদ্দেশ্যে হাজরে আসওয়াদের নিকট দাঁড়িয়ে তিনি বললেন ঃ

انی لاعلم انك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك .

—আমি জানি তুমি একটি শিলাখণ্ড মাত্র। কারো কোন ক্ষতি বা উপকার করতে অক্ষম। আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমিও তোমাকে চুমো দিতাম না।

পাথরটির সাথে এটি একটি নিষ্ঠুর ব্যবহার বৈ কিছু নয়। তাই যদি এটা মুসলমানদের মা'বূদই হতো তবে কি—"তুমি ক্ষতি কিংবা উপকারের অধিকারী নও" বলে সম্বোধন করা সঙ্গত ছিল ? এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, একান্ত ভালবাসাই এর মূল রহস্য। সে অনুরাগের কারণ হলো—মহানবী (সা) স্বয়ং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর মলত্যাগের স্থানটিও যেখানে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় সেক্ষেত্রে যেস্থান কেবল তাঁর হাতের পরশেই ধন্য হয়নি; এমনকি ওষ্ঠ মোবারকের ছোঁয়াও ভাগ্যে জুটেছে, সে স্থানের প্রতি হৃদয়ের অনাবিল অনুরাগ যে কি পরিমাণ সে কথা বলাই বাহুল্য। কবির ভাষায় ঃ

یا امید آنکه جانان روزے رسیده باشد

یا خاك استانش داریم جبهه رسائی

—কোন একদিন মিলন ঘটবে এ আশায় প্রেমাস্পদের আস্তানায় আমি মাথা ঠুকছি অবিরত।

এখন তিনি "চুম্বন কেন করলেন ?" এ প্রশ্নের অধিকার কারো নেই। আর এর কারণ ব্যাখ্যা করাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে, মহানবী (সা) হাজরে আসওয়াদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইবাদতের নিয়তে চুম্বন করেন নি। নতুবা হযরত উমর (রা) নির্ভয়ে একথা বলতে পারতেন না যে, لا تضر ولا تنفع (তুমি কারো ক্ষতি বা উপকার করতে সক্ষম নও)। কেননা হুযূর (সা)-এর মন-মানসিকতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই অবগত ছিলেন। তা সত্ত্বেও পাথরের সাথে যখন তাঁর এ ব্যবহার, কাজেই এ মন্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সা) কর্তৃক পাথরকে চুম্বন করা নিশ্চয়ই ইবাদত হিসেবে ছিল না। প্রসঙ্গত এর জবাবে বলা যায় যে, সম্ভবত মহানবী (সা) বায়তুল্লাহ্‌র অন্য অংশের তুলনায় হাজরে আসওয়াদের উপর খোদায়ী নূরের তাজাল্লী ও বিকিরণ অধিক পরিমাণে লক্ষ করেছিলেন। সুতরাং নূরের তাজাল্লীর সাথে নিবিড় সম্পর্কই এ চুম্বনের মূল কারণ। আর প্রেমাষ্পদের নূরের জ্যোতির সাথে সম্পৃক্ত বস্তুকে চুম্বন করাটা প্রেমের স্বাভাবিক নিয়ম ও চাহিদা। কবির ভাষায় ঃ

امر على الديار ديارليلى – اقبل ذا الجدار وذا الجدار

وساحب الديار شغفن قلبى – ولكن حب من سكن الديار

—প্রেমিকা লাইলীর বাড়ি আর অলি-গলিতে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি আর এ দেয়াল সে দেয়ালে চুমো খাচ্ছি। নিছক বাড়ির প্রেম আমার মনকে উদাস করেনি বরং উতলা হয়েছি এর বাসিন্দার প্রেমে।

**প্রশ্ন ঃ ৭. ইসলামের দাসপ্রথা আপত্তিকর।**

উত্তর ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম হলো "তোমার গোলামের সত্তরটি অপরাধ থাকলেও তাকে ক্ষমা করে দাও ; আরো অধিক হলে লঘুদণ্ড প্রদান কর।" কোন অমুসলমান গোলাম তো দূরের কথা আপন সন্তানের সাথেও এ ধরনের বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করতে কখনো দেখা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এত সব সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে ইসলামের দাসপ্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতে চাই যে, গোলামদের সাথে ইসলাম যে আচরণ দেখিয়েছে, কোন পিতা আপন সন্তানদের সাথেও তা করতে সক্ষম নয়। বস্তুত একমাত্র ইসলামই এমন বিধান দিয়েছে যার ফলে সমাজের একাংশ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। মনে করুন শত্রুদল কর্তৃক যদি মুসলমানগণ আক্রান্ত হয়, অথচ একই শত্রুপক্ষীয় হাজার হাজার লোক তখন তাদের হাতে বন্দী, এখন বলুন এদের সম্পর্কে সঙ্গত আচরণ কি হওয়া

উচিত ? প্রথমত এদেরকে যদি মুক্তি দেয়া হয়—তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যুদ্ধাবস্থায় নিজেদের মুকাবিলায় লক্ষ-হাজার সৈন্য দ্বারা শত্রুবাহিনীকে নববলে বলীয়ান করে দেয়া, যা নিছক বোকামিরই নামান্তর। দ্বিতীয়ত, সাথে সাথে তাদেরকে হত্যা করে ফেলা। এমতাবস্থায় দাসত্বের ব্যাপারেই যেখানে বিপক্ষীয়দের এত আপত্তি, সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে যেত যে, দেখ ইসলামের বিধান কত নির্মম ও বর্বরোচিত যে, মুহূর্তে বন্দীদের প্রাণ সংহার করে ফেলা হয়েছে। তৃতীয়ত, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে সেখানেই বন্দী হিসাবে তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা। এ ব্যবস্থা যদিও বর্তমানের কোন কোন উন্নত ও ধনী দেশের পসন্দনীয়, কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। একে তো এর ফলে রাষ্ট্রের উপর বিরাট অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, এসব বন্দীকে উৎপাদনমূলক কাজে লাগিয়ে এদের শ্রমলব্ধ অর্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপ অপেক্ষাকৃত কমিয়ে আনাটা একটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা। অপরদিকে কয়েদীদের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যক আমলা নিয়োগ করতে হয়, যাদেরকে শুধু একই কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখতে হবে, অন্য কোন কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তৃতীয়ত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে কারাবন্দীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া সত্ত্বেও এসব তাদের নিকট মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হারানোর অনুভূতি এবং ক্রোধ এত তীব্র হয় যে, রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধার যথার্থ মূল্যায়নে তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসে। সুতরাং এতে রাষ্ট্রের টাকাও গেল, অথচ শত্রুর শত্রুতাও হ্রাস পেল না। অধিকন্তু কারাগারে আটক হাজার হাজার আদম সন্তান শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত হয়ে যায়, যা মানবতাবিরোধী অপরাধ। কাজেই ইসলাম ন্যায়ানুগ পন্থায় এদের সম্পর্কে বিধান জারি করেছে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। ফলে একটি পরিবারে একটি গোলামের ব্যয়ভার বহন করা কোন সমস্যাই নয়। অপরদিকে রাষ্ট্রও বিরাট আর্থিক চাপ থেকে বেঁচে গেল। অতঃপর মনিব কর্তৃক স্বীয় গোলাম দ্বারা অর্থোপার্জন করানোর অধিকার স্বীকৃত ও আইনসিদ্ধ হওয়ার ফলে তার ভরণ-পোষণ মালিকের উপর আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। এমতাবস্থায় মালিকের অনুভূতি এটাই হবে যে, চাকরের পেছনে আমাকে একটা অংক ব্যয় করতে হতো, এখন না হয় সে পয়সাটা এর পেছনেই ব্যয় হলো; আর বিনিময়ে তাকে কাজে খাটিয়ে নেব। এ ক্ষেত্রে মানসিক একটা প্রশান্তিও রয়েছে। গোলাম যেহেতু বন্দীর তুলনায় চলাফেরা, ভ্রমণ ইত্যাদিতে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, তাই মনিবের বিরুদ্ধে তার

অন্তরে বিদ্বেষ ও ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তদুপরি মনিব যদি তার প্রতি সদয় থাকে, বিনয় ব্যবহার করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়ে মনিবের বাড়িকে আপন বাড়ি এবং তার পরিবারকে আপন পরিবার মনে করতে থাকে। এটা কোন রূপকথা নয়। বাস্তব ঘটনা এর সাক্ষী। অধিকন্তু এহেন পরিবেশে শিক্ষা-সভ্যতায় উন্নতি করার পথ গোলামের জন্য সুগম হয়ে যায়। কারণ উভয়ের হৃদ্যতার ফলে মনিবের একান্ত ইচ্ছা থাকে আমার গোলাম শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করুক, সভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। সে তাকে শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ এবং পারদর্শী করে তুলতেও যত্নবান হয়। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় শত শত আলেম, ফাযেল, জ্ঞানী-গুণী, সূফী, আবেদ এমন রয়েছেন যাঁরা মূলত গোলাম ছিলেন। তাই গোলামশ্রেণীর লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় উন্নতি করতে এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বরিত হতে পর্যন্ত দেখা যায়। ইসলাম বিদ্বেষীরা তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার করেছেন বলে সুলতান মাহমুদের চরিত্রে কলংক লেপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে থাকে। কিন্তু ভুরি ভুরি প্রমাণের মধ্য থেকে একটি মাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যা তাঁর দয়া ও উদারতার স্বাক্ষর বহন করে আর গোলামদের সাথে তাঁর আচরণের চিত্র ফুটে ওঠে।

সুলতান মাহমুদ একবার ভারত আক্রমণ করেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় হিন্দুকে বন্দী করে নিজের সাথে গজনী নিয়ে যান। এদের মধ্যে একজন চালাক-চতুর গোলাম ছিল। তাকে আযাদ করে দিয়ে তিনি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তাকে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে নিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তাকে 'ঘোর' প্রদেশের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করা হয়। তদানীন্তন কালে 'ঘোর' ছিল আজকালের স্বায়ত্তশাসিত দেশীয় রাজ্যের সমপর্যায়ের। আড়ম্বরপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠানে তার শিরে রাজমুকুট পরিয়ে দিলে সে রোদন করতে থাকে। সুলতান তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ একি, এটা কি ক্রন্দনের সময় নাকি আনন্দের ? সে আরয করল—জাঁহাপনা! আজকের এই গৌরবময় আনন্দলগ্নে বাল্য জীবনের ঘটনা স্মরণ করে অশ্রু সম্বরণ করতে পারছি না। হুযূর, বাল্য বয়সে হিন্দুস্তান থাকাকালে আপনার অভিযানের খবর শুনে হিন্দুরা ভয়ে কম্পমান থাকত। হিন্দু মায়েরা দৈত্যের ন্যায় আপনার ভয় দেখিয়ে সন্তানদেরকে থামাবার চেষ্টা করত। আমার মা-ও আপনার নাম করে তেমনি জুজুবুড়ির মত ভয় দেখাতেন। আমি মনে করতাম মাহমুদ না জানি কত বড় জালিম, অত্যাচারী। এক পর্যায়ে আমার দেশের উপর আপনি আক্রমণ পরিচালনা করেন। আপনার বিপক্ষে হিন্দু প্রতিরক্ষাকারী দলে এ গোলামও যুদ্ধরত ছিল। তখন পর্যন্ত আমি নিজেও আপনার নামে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতাম।

অতঃপর আপনার হাতে বন্দী হলে আমার ভয়ের অবধি ছিল না—"আর বুঝি রক্ষা নেই।" কিন্তু শত্রুপক্ষের ঐতিহ্যের বিপরীত আমার প্রতি আপনার উদার আচরণের ফলে আমার শির আজ রাজমুকুটে সুশোভিত। অতীতের সে স্মৃতি স্মরণ করে করে আজকে আমার চোখে অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছে। হায়......আজ যদি আমার মা উপস্থিত থাকতেন! তাকে বলতাম—দেখ ; এই সেই মাহমুদ যাকে তুমি দৈত্যজ্ঞান করতে।

বন্ধুগণ, এজাতীয় ঘটনায় ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। আর এগুলি ইসলামের উদারনীতিরই সুফল বলা যায়। পক্ষান্তরে এদেরকে যদি কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো তাহলে মুসলিম সমাজের সাথে হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোন অবকাশই থাকত না। কিন্তু গোলামির সুবাদে এরা মুসলিম সমাজের সাথে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পায়, শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি করে নিজ নিজ মেধানুযায়ী প্রত্যেকেই মর্যাদার উচ্চ শিখরে আসীন হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাই তাদের মধ্য থেকে কেউ মুহাদ্দিস, কেউ ফকীহ, মুফাস্‌সির, কারী, বিচারক, হাকীম, পণ্ডিত, আবার কেউবা সাহিত্যিকরূপে খ্যাতির অত্যুচ্চ আসনে সমাসীন হয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। গোলামদের সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর বাণী হচ্ছে—নিজেরা যা খাবে, পরবে গোলামদেরকেও তাই খেতে-পরতে দেবে। খাদ্য তৈরী করে দিলে তাদেরকে নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়াবে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর অন্তিমকালীন বাণী প্রণিধানযোগ্য—

اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

—নামায ও অধীনস্থ গোলামদের সম্পর্কে তোমরা যত্নবান থেকো। এর চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা ও রেয়াত আর কি হতে পারে ?

আল্ হাম্‌দুলিল্লাহ্, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুসলিম সম্রাট গোলামদের সাথে অনুরূপ আচরণ ও নীতি অবলম্বন করেছেন। অবশ্য দু'-একজন এর ব্যতিক্রম করে থাকলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়।

**প্রশ্ন ঃ ৮. ইসলামী তা'যীর বা সাজা অত্যন্ত কঠোর যা বর্বরতার শামিল।**

উত্তর ঃ বর্তমানের উন্নত জাতিগুলো তরবারির দ্বারা কিসাসের পরিবর্তে ফাঁসির প্রথা প্রবর্তন করেছে। এটাও এক মর্মান্তিক ব্যবস্থা। কেননা এতে প্রাণ বের হওয়ার কোন পথ থাকে না যা কতলের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ফাঁসিতে ঝুলন্ত ব্যক্তির চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, এমনকি যন্ত্রণাকাতর ও ছটফটানিতে তার জিহ্বা পর্যন্ত বের হয়ে আসে। এর চেয়েও উন্নত জাতিসমূহ একই উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক চেয়ার আবিষ্কার

করেছে যাতে বসা মাত্রই সেকেন্ডের মধ্যে অপরাধীর প্রাণ বের হয়ে যায়। এতে প্রাণের উপর কি পরিমাণ আঘাত পড়ে এবং যাতনার মাত্রা কত অধিক ও তীব্র হয় তা কল্পনারও অতীত। তার কষ্ট যেহেতু দর্শকদের নজরে আসে না, কাজেই মনে করা হয় তার বুঝি কোন কষ্টই হয়নি, সে আরামেই মরেছে। পক্ষান্তরে হত্যার দৃশ্য, লাশের গড়াগড়ি এবং রক্তের স্রোত দর্শকের দৃষ্টিগোচরে আসার ফলে এটাকে বর্বর শাস্তি মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। তবে হ্যাঁ, সুবিধা এই হয়েছে যে, নিজের চোখে সে বিভীষিকাময় দৃশ্য তাদেরকে আর দেখতে হলো না। তারা তাই ধারণা করে নিয়েছে যে, সে ভয়ানক দৃশ্য যখন আমাদের সামনে অনুপস্থিত, কাজেই বাস্তবে কোন কষ্টই বোধ হয় তার হয়নি। এটা অদৃশ্যকে দৃশ্যের সাথে তুলনার নামান্তর। এ নীতির বলেই তারা সকল অদৃশ্য বস্তুকে অস্বীকার করে বলে থাকে যে, যা কিছু দৃশ্যমান নয় তার অস্তিত্ব অস্বীকারযোগ্য। দৃষ্টিগোচর না হওয়াকে তারা বস্তুর অস্তিত্বহীনতার দলীল বলে ধারণা করে নিয়েছে। অথচ আমেরিকা আবিষ্কার হলো মাত্র কিছুদিন পূর্বে, তাই বলে কি পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না? বাস্তবে এটা ভিত্তিহীন কথা, অযৌক্তিক দাবি। কাজেই এ প্রশ্নও অবান্তর যে, বেহেশত-দোযখ বলে যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে তা দৃষ্টিগোচর হয় না কেন ? উত্তর একেবারে পরিষ্কার—বস্তুর অস্তিত্বের জন্য দৃশ্যমান হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং ফাঁসিকাষ্ঠে কিংবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির যন্ত্রণাকাতর দৃশ্য কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি বলেই তার কষ্ট কম হয়েছে এ যুক্তি অসার—অর্থহীন। পক্ষান্তরে বর্তমানকালের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রাণ সংহারের তুলনায় হত্যা করাতে কষ্ট কম হওয়াটাই বরং অধিকতর যুক্তিসংগত। কারণ, দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার নামই মরণ। তাই যে ব্যবস্থায় প্রাণ বের হয়ে আসার পথ রাখা হয় আর সহজে বের হয়ে আসতে পারে অবশ্যই তাতে দেহের যাতনা অপেক্ষাকৃত কম হতে বাধ্য। আর যে পন্থায় শ্বাসরুদ্ধ করে প্রবল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণ বের করা হয় তাতে যন্ত্রণা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও তাতে সময়ের ব্যবধান কম হয়। এর দ্বারাই শরীয়তের উচ্চতর মূল্যমান প্রমাণিত হয় যে, নির্ধারিত নীতিতে অপরাধীর সাথেও সদয় ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তলোয়ারের আঘাতে কিসাসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে—এতে যে দর্শকের মনে ভীতির উদ্রেক করে ? উত্তরে বলতে চাই—কিসাস বা অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার মূল দর্শন এতেই নিহিত। সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে জনমনে ভীতির সঞ্চার হবে আর তারা হত্যাযোগ্য অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে উন্নত জাতিসমূহের প্রবর্তিত

পন্থায় দর্শক ও জনমনে ভয়-ভীতির সঞ্চার না হওয়ার ফলে এ শাস্তি শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। অবশ্য এই লাভ হয় যে, নির্দয়ভাবে অপরাধীর যন্ত্রণা সহস্রগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ কারো প্রাণ যখন সংহার করতেই হবে, তখন তাকে একটু শান্তিতে মরতে দেয়াই সঙ্গত ছিল। এ পর্যায়ে মহানবী (সা)-এর বাণী হচ্ছে ঃ

اذا قتلتم فاحسنوا القتل وان اذبحتم فاحسنوا الذبح

—যখন তোমরা হত্যা করবে, উত্তম পন্থায় তা কর আর যবাই করলেও উত্তমরূপে যবাই কর।

হাদীসের মর্মার্থ কেবল কিসাসের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, বরং কোন কাফেরকে হত্যা করা এবং পশু যবাই করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং নির্দয়ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করে শরীয়ত জালেম, কাফের, এমনকি প্রাণীকুলের প্রতি পর্যন্ত দয়া ও মানবতাবোধের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। অপরদিকে কিসাসের দ্বারা কেবল অপরাধীই নয়, বরং অন্যদেরও কল্যাণ সাধন করা হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ্র বাণী হচ্ছে ঃ

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّا اُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

—কিসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে, হে বিবেকবানেরা! যেন তোমরা খোদাভীতি অবলম্বন কর।

এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কিসাসের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে। —এফনাউল মাহবুব, পৃষ্ঠা ৪

**প্রশ্ন ঃ ৯. বেহেশ্ত-দোযখ কেবল মুসলমানদের সান্ত্বনাবাণী, মূলত এগুলো অস্তিত্বহীন।**

উত্তর ঃ কারো কারো ধারণা, বেহেশ্-দোযখের বুলি কেবল ভীতি এবং উৎসাহ-ব্যঞ্জক কথা, এগুলোর কোন অস্তিত্ব নাই। (নাউযুবিল্লাহ্) বস্তুত তারা এটাই বোঝাতে চায় যে, কুরআনে উল্লিখিত চুরি-ডাকাতি, জুলুম-অত্যাচার, যিনা, ব্যভিচার, কুফরি ও পাপাচার সম্পর্কে সকল ভয়-ভীতি কেবল ছেলে ভোলানো জুজুবুড়ির ভীতি প্রদর্শনের নামান্তর যে, চুপ কর—দৈত্য-দানব এসে যাবে। তদ্রূপ সকল নিয়ামত ও সুখ-শান্তির বর্ণনা কেবল ছেলেদেরকে প্রবোধ ও উৎসাহ দানের শামিল; আসলে এ সবই অস্তিত্বহীন অলীক কল্পনামাত্র। তাদের জবাবে আমি বলতে চাই—একজন সাধারণ বিচারকের পক্ষেও যেক্ষেত্রে এ ধরনের কাল্পনিক কথা ও অতিশয়োক্তি দূষণীয় ব্যাপার, সেক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কালামের তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আলোচ্য প্রশ্নের

সারমর্ম নির্জলা মিথ্যা প্রবঞ্চনামূলক কথা, মহান আল্লাহ্ যা থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। সুতরাং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا – وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا –

(অর্থাৎ, মহান আল্লাহ্ এসবের উর্ধ্বে, মহান ও শ্রেষ্ঠ। এবং আল্লাহ্র চেয়ে সত্যবাদী আর কে হতে পারে ?) তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করেও নেয়া হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম শুধু ভীতি ও উৎসাহব্যঞ্জক রূপকথারই অভিব্যক্তি, বাস্তবে এগুলি অস্তিত্বহীন, তাহলে বলাই বাহুল্য যে, ভয়-ভীতি এবং উৎসাহমূলক কথাবার্তা ততক্ষণই চলতে পারে যতক্ষণ ব্যক্তির নিকট এর মূলতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে। কেননা রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর তাতে আর ভয় ও উৎসাহ বলতে আদৌ কিছু থাকে না। অতঃপর "জান্নাত-দোযখ নেই" তাদের এ দাবি মূলত অসার ও ভিত্তিহীন। কেননা বেহেশ্‌ত ও দোযখের অস্বীকৃতি দ্বারা কালামে ইলাহীর আবেদন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যায়। (আল্লাহ্ রক্ষা করুন) কুরআন সম্পর্কে কারো পক্ষেই এ ধরনের উক্তি করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র অনুগত করার মহান উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যায়। তদুপরি এ ধরনের আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি নির্ভয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। লজ্জার খাতিরে জনসমক্ষে না হলেও গোপনে পাপকাজে লিপ্ত হলে তাকে কে বাধা দেবে ? একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। যেমন মনে করুন, জান্নাত-জাহান্নামে অবিশ্বাসী, খোদার ভয়-ভীতিহীন কোন ব্যক্তি বনে বাস করে। সেখানে তার এক সঙ্গী ব্যতীত পুলিশ-চৌকিদার বলতে দ্বিতীয় কেউ নাই। এখন মনে করুন ঘটনাচক্রে তার সঙ্গীটি যদি নগদ এক লাখ টাকা রেখে মারা যায়, কাগজে তার পূর্ণ ঠিকানা, পরিবারের পরিচয় ইত্যাদি লেখা রয়েছে আর সে এটাও জানতে পারল যে, বাড়িতে তার ওয়ারিস হিসাবে এক ইয়াতীম পুত্র রয়েছে, এখন তার কাছে এসব থাকা সত্ত্বেও কেউ জানতে পারল না তার সঙ্গীটি কোথায় কিভাবে মারা গেল এবং মৃত্যুকালে মালামাল কি রেখে গেল। ফলে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তার কাছে দাবিও করা যাবে না বা মোকদ্দমাও দায়ের করা সম্ভব নয়।

সুতরাং এখন বলুন, একমাত্র আল্লাহ্ ও আখেরাতের আযাবের ভয়-ভীতি ছাড়া ইয়াতীমের হাতে তার পৈতৃক সম্পদ ফিরিয়ে দিতে তাকে কে বাধ্য করবে ? আর সে কি স্বেচ্ছায় ওয়ারিসের নিকট সে টাকা পৌঁছে দেবে ? অথচ তার অর্থের প্রয়োজনও রয়েছে এবং নিজেও সে অভাবী। এটা একমাত্র সে ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহ্র ওয়াদা এবং ভীতি প্রদর্শনকে সত্য মনে করে, পরকালে আযাবের ভয় রাখে। এ

জাতীয় বিশ্বাসের দ্বারা শরীয়ত কিংবা সামাজিক উভয় কল্যাণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এর দ্বারাই বোঝা যায় সভ্যতার স্বার্থে—মানবতার কল্যাণে ইসলামের প্রয়োজন যে কত তীব্র, কত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের আনুগত্য ও অনুশীলন ব্যতীত রাষ্ট্রের একক প্রচেষ্টায় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ অবাস্তব, কল্পনা-বিলাস মাত্র। কেননা রাষ্ট্রের আইনগত চাপ কেবল প্রকাশ্য বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। নৈতিক চরিত্র একমাত্র ধর্মের প্রভাবেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, সভ্যতার দাবিদাররা ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এত অজ্ঞতার শিকার কেন ? অথচ যাবতীয় মানবিক চাহিদার মধ্যে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মৌলিক ও সর্বাগ্রে। ধর্মকে অস্বীকার করে বা পাশ কাটিয়ে কোন সভ্যতার পক্ষেই বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব নয়। সভ্যতার দাবি উচ্চারণের পর ধর্মকে এড়িয়ে যাওয়া কবির ভাষায় যেমন ঃ

یکے بر سرے شاخ وبن می برید
خداوند بستان نگہ کرد ودید

—"এক ব্যক্তি শাখায় বসে গাছের শিকড় কাটছে আর বাগানের মালিক তা প্রত্যক্ষ করছে"-এর নামান্তর।

মোটকথা এরা সভ্যতার শাখায় বসে তারই শিকড় উপড়ে ফেলছে। বিস্ময়ের ব্যাপার! এরা মুখে তো সভ্যতার বুলি আওড়ায় কিন্তু কাজের বেলায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস স্থাপন করা যে ধর্মীয় ও দীনি বিশ্বাসেরই অঙ্গ এবং দীনি বিষয় এটা আপনাদের বোধগম্য না হওয়ার কথা নয়। —শা'বুল ঈমান, পৃ. ১০৮

**প্রশ্ন ঃ ১০. মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে ?**

উত্তর ঃ কোন অমুসলমানের হয়তো সন্দেহ হতে পারে যে, মুসলমানদের নিকট মহানবী (সা) আল্লাহ্‌র সমকক্ষ। এ সম্পর্কে তাদের জানা উচিত যে, ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন শরীক বা অংশীদার আছে বলে মুসলমানগণ বিশ্বাস করে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবিতকালে তাঁকে সিজদা করা জায়েয ছিল না। কিন্তু আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য খোদার আনুগত্যেরই নামান্তর। এটা ইবাদতের মধ্যে তাঁর শরীক হওয়ার কারণে নয় বরং এ জন্য যে, তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহ্‌র হুকুমে বলে থাকেন। পয়গাম্বরের মর্যাদায় আসীন থাকার কারণে তাঁর আদেশ-নিষেধ মূলত আল্লাহ্‌রই আদেশ-নিষেধ। তাই বলা হয় তাঁর হুকুম পালনের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই হুকুমের আনুগত্য করা হয়। কুরআনের ভাষায় ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۔

—যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল মূলত সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল এবং

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۔

—যে ব্যক্তি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করল, সে যেন আল্লাহ্‌রই হাতে বায়'আত করল।

এর দৃষ্টান্ত এরূপ কোনও বাদশাহ্ যেন উযীরকে নির্দেশ দিলেন—"প্রজাদের মধ্যে এ বিধান জারি করে দাও।" সুতরাং মন্ত্রীর মাধ্যমে যে বিধানটি এখন প্রচারিত হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সেটা বাদশাহ্‌রই নির্দেশ। কাজেই মন্ত্রীর নির্দেশ পালন করা মূলত বাদশাহ্‌র হুকুমেরই আনুগত্যরূপে গণ্য। কিন্তু কখনো কেউ এরূপ মনে করে না যে, মন্ত্রী ও বাদশাহ্ একই পর্যায়ভুক্ত। কোন নির্বোধ এরূপ মনে করে রাজসিংহাসনের স্থলে যদি মন্ত্রীর আসন চুম্বন করতে শুরু করে, তবে নিশ্চয়ই সে একটা ধিক্কৃত ও ঘৃণিত ব্যক্তি। তদ্রূপ মোকদ্দমা পরিচালনার উদ্দেশ্যে আপনার নিযুক্ত উকীলের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কথাবার্তা, যুক্তিতর্ক, কার্যকলাপ আপনার সাথেই সম্পৃক্ত করা হয় যেন আপনি নিজেই বক্তব্য পেশ করছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, উকীল সমকক্ষ হিসেবে আপনার বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়ে যথেচ্ছ ভোগ দখলের অধিকার লাভ করবে। সুতরাং উকীলের ভাষণ যেমন মুয়াক্কেলেরই বক্তব্য; আর মন্ত্রীর আনুগত্য বাদশাহ্‌রই আনুগত্য, সে অর্থেই মুসলমানগণও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যরূপে বিশ্বাস করে থাকে। এর দ্বারা সমকক্ষতা কিংবা অংশীদারিত্ব যে আদৌ প্রমাণিত হয় না, তা উত্তম রূপে অনুধাবন করা উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন উত্থাপনের সময় ইসলামী বিধানের গূঢ় রহস্য হয় বোঝেই না, না হয় এসব কথা তারা বিদ্বিষ্ট মন নিয়ে বলে থাকে। অন্যথায় ইসলামী বিধান ও নীতিমালার বিপক্ষে কোন আপত্তি উঠতেই পারে না। — মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ২০

**১১. প্রতিষ্ঠালাভই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইসলাম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য।**

উত্তর ঃ ইসলাম প্রচার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল না, এটা চরম সত্য ও নিশ্চিত কথা। কেননা উচ্চাভিলাষী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি সাধারণত মানুষকে তার সামনে নত করতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু মহানবী (সা)-এর অবস্থা ছিল এই যে, লোকে তাঁকে সিজদা করতে চাইত, কিন্তু তিনি তাদেরকে এ কাজ করতে শুধু নিষেধই করতেন না বরং নিজেকে তিনি ক্ষণস্থায়ী জীবনের অধিকারী

বলে অকপটে প্রকাশও করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনৈক মূর্খ কাফির প্রশ্ন তুলেছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্মমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এর স্বপক্ষে তার প্রমাণ হলো—মহানবী (সা) হজ্জের সময় স্বীয় কেশমুবারক জনৈক সাহাবীর হাতে প্রদান করত বলেছিলেন, "এগুলো মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।" অতঃপর সে মূর্খ আরো লিখেছে যে, বরকত মনে করে তাবীমার্থে সংরক্ষণের জন্যই তিনি তাঁদের মধ্যে এগুলো বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজেই প্রমাণ হয় যে, তিনি আত্ম-প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের অভিলাষী ছিলেন। (আস্তাগফিরুল্লাহ্!) এই হলো আধুনিক বিবেক-বুদ্ধির পরিচয়। পরিতাপের বিষয়, প্রশ্নকারীর ইবাদত ও মহব্বতের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞানটুকু পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাস্তবিকই কাফিরদের অন্তরে প্রেম-প্রীতির প্রতি কোন আকর্ষণই পরিলক্ষিত হয় না।

এ কারণেই তারা ঘটনার মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। ইচ্ছা হয় এদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে বলে দেই ঃ

با مدعی مگوید اسرار عشق ومستی
بگذار تابمیرد در رنج خود پرستی

—মিথ্যা-ভণ্ডের সামনে প্রেমের মর্মকথা ব্যক্ত করবে না। ছেড়ে দাও আত্মম্ভরিতার যাতনায় সে মরে যাক।

কিন্তু সান্ত্বনার ছলে জবাব দিচ্ছি, যেন কোন মুসলমানের মনে সন্দেহের উদ্রেক হলে এ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো—হুযূর (সা) এমন সব লোকের মধ্যেই পবিত্র কেশমুবারক বণ্টন করেছিলেন, যারা ছিলেন নবীপ্রেমে আত্মহারা। যাদের সামনে তাঁর ওযূর একবিন্দু পানিও মাটিতে পড়া সম্ভব ছিল না। তাঁর মুখের থুথু ও ওযূর পানি সংগ্রহ করে চোখে-মুখে মাখার জন্য যাঁরা উন্মাদের ন্যায় ছুটে যেতেন। তাঁর ওযূর পানি ও থুথু স্বহস্তে সর্বাগ্রে ধারণ করার জন্য সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং ছোটাছুটির ফলে একে অপরের গায়ের উপর পড়ে যেতেন। তাঁদের নিখাদ প্রেমের এমনি অবস্থা ছিল যে, একবার নবী করীম (সা) সিংগা লাগানোর ফলে নির্গত রক্ত কোথাও সযত্নে পুঁতে ফেলার জন্য জনৈক সাহাবীর হাতে দিলেন। কিন্তু মহানবী (সা)-এর রক্ত মাটিতে দাফন করে দেয়াটাই ছিল নবী-প্রেমে মত্ত সাহাবীর পক্ষে অকল্পনীয়-অসহনীয় ব্যাপার। তাই নির্জনে গিয়ে তিনি তা পান করে ফেললেন। এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, (নাঊযুবিল্লাহ্) উক্ত সাহাবী এতই আত্মহারা, নোংরা ছিলেন যে, থুথু গায়ে মর্দন করতে এবং রক্তপানে নিজের মনে ঘৃণাবোধ পর্যন্ত জন্মে

নাই। আসল কথা হলো—এখানে ছিল মূলত প্রেমের সম্পর্ক যার মর্ম কেবল প্রেমিকের পক্ষেই উদ্ধার করা সম্ভব। যাদের অবস্থা হলো ঃ

غیرت آں چشم برم روئے تو دیدن ند ہم
گوش رانیز حدیث تو شنیدن ند ہم

—প্রেয়সী গো, আমার নয়ন যুগল তোমার রূপের ছটায় দৃষ্টি ফেললে এবং কর্ণকুহরে তোমার আওয়াজ পৌঁছলে আত্ম-মর্যাদায় আঘাত পড়ে। অর্থাৎ আমার আত্ম-মর্যাদা এতই প্রবল যে, নিজের চোখ-কানকে পর্যন্ত প্রেয়সীর রূপের পানে তাকাতে, তার প্রেমালাপ শোনার অনুমতি দিতে নারাজ।

বন্ধুগণ! কারো সাথে যদি আপনাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে থাকে তবে ব্যাপারটা বুঝে আসবে। প্রেমিক তো কখনো প্রেমাস্পদের জিহ্বা নিজের মুখে পুরে চুষতে থাকে। আর প্রেমিক কবিরা তো প্রেয়সীর মুখের লালার প্রশংসায় একের পর এক কাব্যগাঁথা রচনা করে ফেলে। তা'হলে তারা কি নির্বোধ ? মোটেই না। তারা যদি তাই হয় তবে বুঝতে হবে পুরো জগতটা বোকার আড্ডাখানা। কেননা প্রেমের উন্মাদনায় সবাই এমনটি করে থাকে, কোন প্রেমিকই এর ব্যতিক্রম নয়। তদ্রূপ প্রেয়সীর রক্ত ঝরা প্রেমিকের নজরে পড়লে বেদনা লাঘব করার উদ্দেশ্যে সে ক্ষত স্থান চুষতে আরম্ভ করে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, রক্ত চোষাও কোন ঘৃণার বিষয় নয়। এতে সে কি যে আনন্দ পায় তা তার প্রেমসিক্ত মনকে জিজ্ঞেস করা উচিত। কাজেই সাধারণ তুচ্ছ প্রেমাস্পদের থুথু ও রক্ত চোষা যদি ঘৃণার বিষয় না হয়, সে ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর থুথু, ঘাম ও রক্ত ঘৃণিত হওয়ার কি যুক্তি আছে। কেননা জন্মগতভাবেই তাঁর সারাদেহ সুগন্ধিময় ছিল। তাঁর দেহ বিগলিত ঘাম এবং মুখের থুথু মোবারক আতরের চেয়েও অধিক সুগন্ধ ছিল। রক্তেরও ছিল একই অবস্থা। এমন বস্তুকে কে ঘৃণা করতে পারে! কিন্তু বিধর্মী কাফেররা এসব বিষয় অবহিত নয়। তাঁর সাথে আন্তরিক মহব্বত কিংবা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তারা আদৌ জ্ঞাত নয়। মোটকথা সাহাবীগণ ছিলেন নবীর প্রেমে মত্তপ্রায়। তাঁর ওযূর পানি হাতে হাতে নেয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে থাকত। তাই এমন লোকদের থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তারা তাঁর কেশ মোবারক মাটির নিচে দাফন করে দেবেন। এটা নিশ্চিত যে, ওযূর পানির তুলনায় কেশ মোবারকের মর্তবা অধিক ছিল। কেননা পানি তো কেবল এক মুহূর্ত নবীর দেহ মোবারক স্পর্শ করেছে পক্ষান্তরে কেশ মোবারক দেহের অঙ্গস্বরূপ। বলা বাহুল্য, কেশ মোবারক তিনি দাফন করিয়ে দিলেও সাহাবীগণ মাটি খুঁড়ে তা আরো অধিক পরিমাণে সংগ্রহের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা

শুরু করে দিতেন। এমনকি মারামারি-হানাহানি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। কাজেই তাঁদেরকে কলহ-বিবাদ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নেই তিনি তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে সমস্যা এখানেই চুকে যায়। এতে আপত্তির কি থাকতে পারে বলুন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সা) কর্তৃক স্বীয় কেশ মোবারক বণ্টন করাটা আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং সাহাবীগণের নিখাদ আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ করে এবং তাঁদের পারস্পরিক কলহকে কেন্দ্র করেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ না করুন—তাঁর অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকারবোধ থাকলেও তিনি মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করতেন, জমকালো অট্টালিকা তৈরি করতেন, উত্তম ও সুখাদ্য আহার করতেন, অধিকন্তু সম্পদের পাহাড় তাঁর করায়ত্তে এসে যেত। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর (সা)-এর পোশাক ছিল মোটা বস্ত্র, কাঁচা ঘর ছিল তাঁর বাসস্থান। সম্পদ বলতে তাঁর হাতে কিছুই সঞ্চিত থাকত না। তাঁর অর্থ এ নয় যে, সম্পদ তাঁর হাতে জমাই হতো না, বরং কোন কোন যুদ্ধের পর অঢেল সম্পদ তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ত। যুদ্ধলব্ধ গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত তার অংশের বকরীতে ময়দান ছেয়ে গিয়েছিল। এগুলো তিনি কাউকে এক শ, কাউকে দু'শ করে বণ্টন করে দিতেন। বাহরাইন থেকে আদায়কৃত জিযিয়া করের স্বর্ণমুদ্রা মসজিদে স্তূপীকৃত হয়ে গিয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তা সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। অথচ নিজের জন্য এক কপর্দকও রাখেন নি। আত্মগর্বী লোকের বেলায় এটা কি কল্পনা করা যায় যে, নিজে শূন্য হয়ে অপরকে সে বিত্তশালী বানিয়ে দেবে ? অপরদিকে তার বিনয়-নম্র স্বভাবের অবস্থা ছিল এই যে, পথ চলাকালে সাহাবীগণকে সামনে দিয়ে তিনি নিজে পিছনে থাকতেন। সময় সময় ঘটনা এমনও হয়েছে যে, মহানবী (সা) পায়ে হেঁটে পথ চলছেন আর সাহাবীগণ যাচ্ছেন সওয়ার হয়ে। তাঁকে দেখে সওয়ারী থেকে নামতে চাইলে তিনি নিষেধ করতেন। নিজ হাতে বাজার-সদাই করা ছিল মহানবী (সা)-এর অধিকাংশ দিনের অভ্যাস । কারো কোন সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে হাত ধরে প্রয়োজনস্থলে তাঁকে নিয়ে যেতে পারত আর তিনিও খুশি মনে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। বাড়িতে বকরী দোহন করা, নিজ হাতে জুতা সেলাই করে নেয়া, আটা ছানা ইত্যাদি সাংসারিক কাজ-কাম তিনি আপন হাতে সমাধা করে নিতেন। কখনো মাটিতে আসন করে বসে যেতেন, চাটাইতে শয়ন করার ফলে তাঁর নূরানী দেহে চাটাইর চিহ্ন ফুটে উঠত। একবার জনৈক ইহুদী পাওনা টাকার জন্য তাঁর সাথে রুক্ষ ব্যবহার করার কারণে ক্রোধান্বিত সাহাবীগণ সে ইহুদীকে ধমকাতে চাইলে তিনি এই বলে তাঁদেরকে বারণ করেন ঃ "ছেড়ে দাও, পাওনাদারের বলার অধিকার রয়েছে।"

এখন সে অজ্ঞ প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করা দরকার শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যাশী এবং আত্মগর্বী লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি এ ধরনের হতে পারে ? পরিতাপের বিষয়! প্রশ্নকারীর চোখে কেবল কেশ বণ্টনের ঘটনাটাই কি ধরা পড়ল আর এসব সত্য থেকে সে অন্ধ হয়ে গেল ?

সুতরাং আমার এ বর্ণনা দ্বারা আশা করি প্রশ্নকর্তার দ্বন্দ্ব কেটে গেছে যে, কেশ বণ্টন আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয়; বরং এর আড়ালে শিক্ষা-সভ্যতা, তামদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনই একমাত্র কাম্য ছিল। অধিকন্তু কেশ বণ্টনের প্রেক্ষাপটে তিনি এ-ও বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমি এক ক্ষণস্থায়ী জীবন ও নশ্বর দেহের অধিকারী, চিরস্থায়ী অবিনশ্বর জীবন নিয়ে আসিনি। কেননা চুলের অবস্থা পরিবর্তনশীল, কখনো তার অবস্থান দেহের শীর্ষভাগে, আবার কখনো ক্ষুর-কাঁচির আঘাতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভূ-তলে। কাজেই দর্শকমাত্রই তাঁর বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত কেশ মোবারক দেখে বিশ্বাস করবে যে, তিনি সৃষ্ট মানবই ছিলেন, চিরঞ্জীব খোদা নন। (তাই আল্লাহ্‌র রহমতে আজও কোন কোন স্থানে তাঁর কেশ মোবারক সংরক্ষিত রয়েছে, মানুষ তা দর্শন করে থাকে।) এর দ্বারা নিজের বড়ত্ব নয় বরং তিনি মুসলমানদের ঈমান সুদৃঢ় ও মজবুত হওয়ারই ব্যবস্থা করেছেন বলা যায়। প্রসঙ্গত কবি বলেন ঃ

چون ندید حقیقت ره افسانه روند

—সত্যপথ না পেলে মানুষ ভ্রান্ত পথে ছুটে। — মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৫৮

### প্রশ্ন ঃ ১২. নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনাই যথেষ্ট, রিসালতের প্রতি বিশ্বাসে প্রয়োজন কি ?

উত্তর ঃ কোনরূপ বে-আদবীপূর্ণ আচরণ না করে মহানবী (সা)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাটাও নবুওয়তের আলো ও বরকত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়ার শক্তিশালী কারণ। এর দ্বারাই সেসব লোকের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়, রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে যারা কেবল আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস পোষণ করাকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে। পরিতাপের বিষয়, মুসলমানদের মধ্যেও কতিপয় লোকের ধ্যান-ধারণা সেই একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের মতে নবী করীম (সা) শুধু তাওহীদের বাণী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই আগমন করেছিলেন। কাজেই তাঁর রিসালতের স্বীকৃতি না দেয়া সত্ত্বেও কেবল তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস সাপেক্ষে মানুষ মুক্তি পেয়ে যাবে। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা উচিত যে, এ ধরনের কথা সর্বৈব মিথ্যা ও বাতিল। রিসালতের স্বীকৃতি ছাড়া নাজাতের চিন্তা করাটা অলীক স্বপ্ন মাত্র। তাওহীদ যেমন ঈমানের অংগ তদ্রূপ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন

করাও একই পর্যায়ের। কুরআন পাকের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ ـ

—"ঈমানদার, ইহুদী, নাসারা ও সাবিয়ীনদের (তারকাপূজারী) মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।"

উক্ত আয়াতে রিসালাতে বিশ্বাসের অপরিহার্যতার কথা দৃশ্যত উল্লেখ নেই বরং আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকেই সব সম্প্রদায়ের জন্য নাজাতের ভিত্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছে যে, নাজাতের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাতের উপর ঈমান আনা অনিবার্য নয়। কিন্তু মূল কথা হলো, মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের বিশ্বাস ব্যতিরেকে আল্লাহ্ ও আখিরাতের ঈমান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সুতরাং "বিশেষ একটি আয়াতে বর্ণিত হয়নি বলে রিসালাতের ঈমান নিষ্প্রয়োজন" কথাটা একটা বিভ্রান্তিকর উক্তি। এ প্রসংগে জনৈক ডেপুটি কালেক্টরকে পাঠানো আমার বক্তব্যে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে তো তিনি একজন সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন, রীতিমত নামায-রোযা করতেন। কিন্তু শয়তানী চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি ভ্রান্তিজালে আটকে যান যে, নাজাতের জন্য 'ঈমান বিল্লাহ্ই যথেষ্ট, রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা জরুরী নয়।" বাস্তবিকই দীনী ইলম ছাড়া পরিপূর্ণ আত্মিক সংশোধন এবং আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত হতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, মানুষ আজকাল ইংরেজি শিক্ষাকেও 'ইলম মনে করে নিয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা অর্থ উপার্জনের সুরাহা হয়, কিন্তু আল্লাহ্কে চেনা যায় না। ডেপুটি সাহেবকে আমি জবাবে বলেছি—"আল্লাহ্ মৌজুদ আছেন" কেবল এটুকু মেনে নেয়াতেই "আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের" পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না। কেননা মুশরিকরাও আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। বরং ঈমান বিল্লাহ্র অর্থ হলো, আল্লাহ্কে সিফাতে কামাল তথা যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের নিরংকুশ অধিকারী এবং বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র বলে ঐকান্তিক বিশ্বাস ঘোষণা করা। এখন আমার কথা হলো—সত্যবাদিতাও সিফাতে কামালের (সার্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের) একটা অংশ, আল্লাহ্কে এর নিরংকুশ অধিকারীরূপে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। তদ্রূপ মিথ্যাচার অপূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ যা থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা স্বীকার করা অনিবার্য। এ তো গেল প্রাথমিক ভূমিকা। দ্বিতীয় কথা হলো—কুরআন

করীমে আল্লাহ্ পাক মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল বলে ঘোষণা করেছেন। আর কুরআন শরীফ যে আল্লাহ্‌র কালাম তা যুক্তিভিত্তিক ও জ্ঞানসিদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কুরআন-প্রদত্ত ঘোষণা সত্য বলে বিশ্বাস করাও ওয়াজিব। অতএব ফল দাঁড়াল এই যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসাবে স্বীকার করবে না সে যেন আল্লাহ্‌কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। তাহলে আল্লাহ্‌র প্রতি "বিশ্বাস স্থাপন" করা হলো কিরূপে? সুতরাং প্রমাণ হলো যে, রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা সম্ভবই নয়। অতঃপর তাকে আমি চ্যালেঞ্জ করি যে, আমার এ দাবির জবাবের জন্য আপনাকে দশ বছর সময় দেয়া হলো। কিন্তু তার কাছে আমার এ যুক্তির কোন জবাবই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে তার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং আমার সাথে সাক্ষাতও করে। বেচারা ভালভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

মোটকথা, উত্তমরূপে শুনে রাখুন, হুযূর (সা)-এর সাথে আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়া পরকালের মুক্তি আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসংগে আরো একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। ঘটনাটা হলো—নিজেকে প্রকাশ্যে মুসলমানরূপে দাবি করত এমন একজন দার্শনিককে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে। অবশ্য স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে একজন মুসলমান সম্পর্কে অযথা কুধারণার সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় তার নাম প্রকাশ করাটা আমি সমীচীন মনে করি না। যাহোক উক্ত ব্যক্তি স্বপ্নে একবার নবী করীম (সা)-এর দর্শন লাভ করে। সে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অমুক ব্যক্তির (দার্শনিকের) পরিণাম কি হয়েছে ? উত্তরে তিনি বললেন, আমার মাধ্যম ছাড়াই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে চেয়েছিল এবং বেহেশতের নিকট পৌঁছেও গিয়েছিল, কিন্তু "হতভাগা সরে যা" বলে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই। কেননা আমার সাথে সম্পর্ক ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। মোটকথা মহানবী (সা)-ই উম্মতের মুক্তির একমাত্র মাধ্যম। তাঁর সাথে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়া কোন ব্যক্তি ফয়েয লাভ এবং কামাল বা পূর্ণতা অর্জন করতে তো পারেই না এমনকি তার ঈমান পর্যন্ত কবূল হওয়ার যোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গেই মনীষী শেখ সাদী ছন্দায়িত করেছেন ঃ

پندار سعدی که راه صفا
توان رفت جزبر پئے مصطفے
خلاف پیمبر کسے رہ گزید
که هر گز بمنزل نخواهد رسید

—শোন হে সা'দী! নবী মোস্তফা (সা)-এর পথ ধরে চলা ছাড়া সরল পথে কে চলতে পারে ? পয়গাম্বরের বিপরীত পন্থা অবলম্বনকারী কখনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হবে না।

এ উক্তি সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা মহানবী (সা)-এর সাথে সম্পর্ক ছাড়াই পথ অতিক্রম করতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে তাঁর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীদের অবস্থা হলো—কবির ভাষায় ঃ

نماند بعصیان کسے در گرہ
کہ دارد چنیں سید پیش رو

—তিনি যার নেতা সে সমাজের মধ্যে কোন পাপাচারী অপরাধীরূপে থাকতে পারে না।

এবং অপর কবির কথায় ঃ

لوبی لنا معشر الاسلام ان لنا
من العناية ركنا غير منهدم

—হে মুসলিম সমাজ! আমাদের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমরা এমন আশ্রয়-স্তম্ভ লাভ করেছি যা কখনো বিনষ্ট হবার নয়।

— আর্‌রফা-ওয়াল-ওয়াফা, পৃ. ২৯

**প্রশ্ন ঃ ১৩. মহানবী (সা)-এর মি'রাজ শারীরিক ছিল না। কেননা ঊর্ধ্বারোহণ কারো পক্ষে সম্ভব নয় ।**

উত্তর ঃ যারা হুযূর (সা)-এর সশরীরে মি'রাজ অস্বীকার করে এবং তা স্বপ্নগত ও আধ্যাত্মিক বলে বর্ণনা করে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। তাদের এ দাবি প্রমাণহীন উক্তি বৈ নয়। কেননা তাঁর মি'রাজ বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন করার কথা তো কুরআনের আয়াতে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে, বিনা তাবীলে তথা ব্যাখ্যা ছাড়া যাকে অস্বীকার করা কুফরী। আর তাবীলের ভিত্তিতে অস্বীকার করা বিদআ'ত। মহানবী (সা)-এর শারীরিক মি'রাজ অস্বীকার-কারীদের সপক্ষে আক্‌লী ও নক্‌লী (যুক্তি ও কুরআন হাদীসভিত্তিক) দু-ধরনের দলীল পেশ করা হলো। প্রথমত তাদের যুক্তি হলো—হুযূর (সা)-এর শারীরিক মি'রাজের বাস্তবতা স্বীকার করে নিলে প্রশ্ন দাঁড়ায়—এর ফলে আকাশে ফাটল সৃষ্টি হওয়া এবং পরে সেখানে জোড়া লাগা-প্রক্রিয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। যার কোন বাস্তবতা নেই। এর জবাব হলো—আকাশের ফাটল ও সংযোজনের ওপর দার্শনিকগণের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব নয়। যদি কখনো তারা নিজেদের এ মতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হন তখন ইন্‌শা-আল্লাহ্ একে অসার প্রতিপন্ন করে দেখিয়ে দেব। আর কালামশাস্ত্রবিদ আলিমগণ যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত দলীল-প্রমাণ দ্বারা তাদের এসব

প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ হলো—মি'রাজ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, রাত ভোর হওয়ার পূর্বেই নবী করীম (সা) ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ শেষে ঘরে ফিরে আসেন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এহেন ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব কথা। কেননা একই রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করাটা মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বের বিষয়। জবাবে আমি বলব—ব্যাপারটা কঠিন বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কেননা বিজ্ঞানের মতে 'সময়' হলো গ্রহের চলমান গতি। দিন-রাতের পরিবর্তন, সূর্যের উদয়-অস্ত এসব গ্রহের সে গতির সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই কোন কারণে এর গতি বন্ধ হয়ে গেলে 'সময়' তার স্বস্থানে স্থির, অচল দাঁড়িয়ে থাকবে। রাতে বন্ধ হলে রাত, দিনে হলে দিনই থাকবে। সম্ভবত সে রাতে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের গতি তখনকার মত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। অতিথির সম্মানার্থে এ ধরনের রীতি বেশ চালু আছে। রাজা-বাদশাদের গমনকালে রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। হায়দ্রাবাদে একবার পুলিশকে রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ করে দিতে দেখলাম। রাস্তা-ঘাট মুহূর্তে জনশূন্য হয়ে পড়ল। ব্যাপার কি ? জানা গেল—নবাবের সওয়ারী আসছে। তদ্রূপ মহানবী (সা)-এর সম্মানার্থে মহান আল্লাহ্ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও আকাশের গতি সাময়িকভাবে হয়ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যার ফলে সবাই এরা স্ব-স্ব স্থানে থেমে যায়। কাজেই আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। হুযূর (সা) মি'রাজ থেকে অবসর হবার পর আকাশের গতিকে পুনরায় সচল হবার অনুমতি দেয়া হয়। তাহলে এটা পরিষ্কার হলো যে, বন্ধ যেখান থেকে হয়েছিল সেখান থেকেই পুনরায় যাত্রা শুরু হবে। এমতাবস্থায় তাঁর মি'রাজে সময় যা-ই লাগুক মর্ত্যবাসীদের হিসেবে একরাতেই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেছে। কেননা সময়ের গতি তো তখন বন্ধই ছিল। এখন "গ্রহের গতি ব্যাহত বা রহিত হয় নাই"—কেউ দাবি করলে সে তার প্রমাণ পেশ করুক। ইন্শাআল্লাহ্ এর উপর কোন দলীলই সে উপস্থিত করতে পারবে না। এ প্রশ্নের উত্তরে মওলানা নিযামীর প্রেমিকসুলভ জবাব প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

تن او كه صافى تراز علت - اگر امد وشد بيك دم رواست

—হুযূর (সা)-এর দেহ মোবারক আমাদের কল্পনার চেয়েও সূক্ষ্ম ও পবিত্র। কাজেই তিনি মুহূর্তে নভোমণ্ডল ও আরশ পর্যন্ত ঘুরে আসেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে।

এটা সবার জানা কথা যে, মানুষের কল্পনা-শক্তি মুহূর্তে শত-সহস্র কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। সুতরাং আপনি আরশের কল্পনা করুন—দেখবেন

সেকেন্ডেরও কম সময়ে তথায় সে হাযির। কল্পনার গতি অতি দ্রুতগামী। কেননা কল্পনা রূহের শক্তি বিশেষ। আর রূহ্ বস্তুর মতো স্থূলাকার নয় ; বরং অতি সূক্ষ্ম জিনিস। ফলে এর গতি পথে কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। কাজেই মওলানা নিযামী বলেন ঃ হুযূর (সা)-এর দেহ মোবারক আমাদের কল্পনার চেয়েও সূক্ষ্মতর। সেটাই যখন মুহূর্তে অসীম দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম, সেক্ষেত্রে তিনি মুহূর্তকালে মর্ত্যলোক থেকে ঊর্ধ্বাকাশে—সেখান থেকে আরশ পর্যন্ত ভ্রমণ করে আসেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দার্শনিকগণ আরেকটি যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করে থাকেন যে, বায়ুমণ্ডলের উপরের দিগন্তবিস্তৃত শূন্যলোক বায়ুহীন হবার দরুন কোন প্রাণীর পক্ষে সেখানে জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সে স্তর অতিক্রম করতে হলে তাঁর জীবন রক্ষার কি উপায় ? বেশ, যুক্তি যথার্থ কিন্তু তারা হয়ত ভাবেন নি যে, এ যুক্তি টিকবে তখন যদি সেখানে প্রাণীর অবস্থান বা স্থিতির কোন অবকাশ থাকে। কেননা আগুনের ভিতর অতি দ্রুত অঙ্গুলি সঞ্চালন করলে তাতে আগুনের ক্রিয়া প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। সুতরাং নিমেষে সে স্তর ভেদ করে থাকলে তাঁর শরীর আগুনের ক্রিয়া থেকে অক্ষত থাকা বিচিত্র নয়। হযরত আয়েশা (রা)-এর এক উক্তির দ্বারাও সশরীরে মি'রাজ অস্বীকারকারিগণ আরেকটি নকলী দলীল পেশ করে থাকে। তিনি বলেন ঃ

والله ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ليلة الاسراء

—"আল্লাহ্র কসম! মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্র (সা)-এর শরীর মোবারক নিখোঁজ হয়নি।"

কেউ কেউ এর জবাব দিয়েছেন যে, তখন তিনি হুযূর (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন কোথায় ? তদুপরি তাঁর বয়স তখন চার কি পাঁচ বছর মাত্র। অধিকন্তু ইমাম যুহরীর বর্ণনামতে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে মি'রাজ সংঘটিত হয়ে থাকলে সে বছর মাত্র তাঁর জন্মই হলো। কাজেই এ বিষয়ে তাঁর বর্ণনার বিপক্ষে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের রেওয়ায়েতই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু উক্ত জবাবের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, হযরত আয়েশা (রা) যাচাই-বাছাই ছাড়াই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে আমরা এ জাতীয় ধারণা পোষণ করার পক্ষপাতী নই। আর কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুঃসাহস করা উচিতও নয়। কেননা যদিও তিনি তখন নবী করীম (সা)-এর সাহচর্যে উপস্থিত ছিলেন না এবং অল্প বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু রেওয়াতের বর্ণনাকালে তো তিনি বিবেকসম্পন্না ও প্রাপ্ত বয়স্কা। এমতাবস্থায় বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া বর্ণনা কার্য তাঁর দ্বারা সম্পাদন হতে পারে না। তাই

ধরে নিতে হবে—অবশ্যই যাচাই-বাছাই করার পর-ই তিনি এ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর রেওয়ায়েত সম্ভবত অন্য কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। কেননা মি'রাজের ঘটনা একাধিক বলেও বর্ণিত রয়েছে। তাহলে কোন প্রশ্নই থাকে না। আমার মনে এর অন্য একটা জবাবের উদয় ঘটেছে যা অতি সূক্ষ্ম ও তত্ত্বপূর্ণ। তা'হলো فقدان এর অর্থ দু'টি—(১) বস্তুর স্থানচ্যুত হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া এবং (২) খোঁজ করা, তালাশ করা। কুরআন করীমে দ্বিতীয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ

অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ আওয়াজ দানকারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বললেন ঃ "তোমরা কি খোঁজ ?" উক্ত আয়াতে فقدان-এর অর্থ তালাশ করাই অধিক ফুটে উঠেছে। সুতরাং এখন হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনার অর্থ দাঁড়ায়—হুযূর (সা) তত বেশি সময় ঘর থেকে নিখোঁজ থাকেন নি যে, তাঁকে তালাশ করতে হবে। পক্ষান্তরে এর অর্থ এই নয় যে, ঘর ছেড়ে তিনি কখনো বাইরে যাননি—যার ফলে এর দ্বারা শারীরিক মি'রাজের বিপক্ষে কিংবা আধ্যাত্মিক মি'রাজের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। বরং ব্যাপারটি হলো—তিনি ঘর থেকে পৃথক হয়েছেন সত্য, কিন্তু এত বেশিক্ষণের জন্য নয় যে, বাড়ির লোকজন চিন্তিত হবেন এবং তালাশের পর্যায় পর্যন্ত গড়াবে। পক্ষান্তরে যদি فقدان -এর প্রচলিত অর্থ যে, "মি'রাজের রাতে হুযূর (সা) নিখোঁজ হননি" ধরা হয় তবু মি'রাজ স্বপ্নযোগে কিংবা রূহানী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রেও এর অর্থ এটা নয় যে, হুযূর (সা) সে রাতে ঘর ছেড়ে বেরই হন নি। কারণ فقدان শব্দটি সকর্মক ক্রিয়ার ধাতু বা শব্দমূল, অকর্মক ক্রিয়ার নয়। তাই এর অর্থ—পৃথক, অদৃশ্য বা নিখোঁজ হওয়া নয় বরং হারিয়ে ফেলা, অদৃশ্য বা আড়াল করা যার জন্য একজন অদৃশ্যকারী ও অপরজন আড়ালকৃত ব্যক্তি বা বস্তু নির্মিত হওয়া জরুরী। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা)-এর রেওয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়—মহানবী (সা) সে রাতে ঘর থেকে কেউ নিখোঁজ বা অদৃশ্য অবস্থায় পায়নি আর এটাই সঠিক অর্থ। কেননা আপনজনদের সাথে সে রাতে তিনিও রীতিমত নিজ গৃহে শয়ন করেছিলেন। মি'রাজের ঘটনা এমন সময় ঘটেছিল স্বভাবত অন্যরা যখন নিদ্রামগ্ন। অতঃপর বাড়ির লোকজন জাগার পূর্বে ভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি কেবল ফিরেই আসেননি বরং নিজে তাদেরকে ফজরের নামাযের জন্য ডেকে ওঠান। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টিই হয়নি যে, মধ্যরাতে ঘুম থেকে কেউ জেগেছিল অথচ তাঁকে উপস্থিত পায়নি। অতএব রেওয়ায়েতের মর্ম সঠিক ও বক্তব্য স্পষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকু অর্থ গ্রহণ করাই যথেষ্ট।

মোটকথা নিঃসন্দেহে তাঁর মি'রাজ ছিল শারীরিক এবং সশরীরেই তিনি সাত আকাশ ভ্রমণ করেছেন। এটা অস্বীকার করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। অধিকন্তু এ ঘটনার অন্তরালে মহানবী (সা)-এর কামাল বা পূর্ণত্ব নিহিত রয়েছে। —আর্‌রফ. ওয়াল-ওয়াযা', পৃ. ৩৩

**প্রশ্ন ঃ ১৪. আপনাদের নবী (সা) ভোগ-বিলাস ত্যাগী ছিলেন না। তিনি নয়টি বিয়ে করেছিলেন।**

উত্তর ঃ আজকাল খৃস্টানরা "আমাদের নবী ভোগবাদী ছিলেন না" বলে গর্ব করে আর "তোমাদের নবী ভোগবাদী ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন যে, নয়টি বিয়ে করেছেন" ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে মুসলমানদের প্রতি কটাক্ষ করে থাকে। যার ফলে অজ্ঞ মুসলমানরা তাদের সামনে বিব্রত হয়ে পড়ে। এর জবাবে কথা হলো—বৈরাগ্য তাকওয়ার অনিবার্য শর্ত হিসাবে বিবেচিত হলে নবী করীম (সা) অবশ্যই বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতেন, বিরুদ্ধবাদীরা যেন মুসলমানদের উপর কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশই না পায়। যার অপ্রিয় ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এমনি বিতর্ককালে জনৈক বে-আদব খৃস্টানের এহেন প্রশ্নের জবাবে এক গণ্ডমূর্খ মুসলমান বলে বসল ঃ "প্রথমে তুমি প্রমাণ কর যে, 'ঈসা (আ)-র মধ্যে পুরুষত্বও বর্তমান ছিল। তবেই তাঁর বিয়ে না করা নিয়ে গর্ব করতে এসো।" কিন্তু এটাও নিছক বে-আদবী। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে এ জাতীয় ক্রটি থাকার কোন সন্দেহ অন্তরে স্থান দেয়া আদৌ উচিত নয়। কেননা সহীহ্ বুখারীতে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উক্তি বর্ণিত রয়েছে। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ নীরব থাকার ফলে যা বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার পর্যায়ভুক্ত। উক্তিটি হলো ঃ

كذالك الرسل تبعث فى احساب اقوامنا –

অর্থাৎ রাসূলগণ আমাদের সর্বাপেক্ষা অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। حسب বলা হয় সৃষ্টিগত পূর্ণতাকে। যদ্দ্বারা বোঝা যায় নবী (আ)-গণ চূড়ান্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত হয়ে থাকেন; তাঁদের আনুগত্যে যেন কারো মনে কোন সংকোচ জাগ্রত না হয়। বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি আপনি জানতে পারেন যে, লোকটি পুরুষত্বহীন, তার প্রতি আপনার মনে তখন ঘৃণার ভাব আসা এবং তার আনুগত্যে মানসিক বাধার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আপনার নজরে তৎক্ষণাৎ সে হেয়-প্রতিপন্ন হবে। কারো প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা তখনই পূর্ণ মাত্রায় জমতে পারে যদি দেখা যায় লোকটির মধ্যে সকল রিপুর তাড়না বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংযমের বেলায় সে ফেরেশতাতুল্য। পক্ষান্তরে রিপুর তাড়নাহীন ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ মাত্রায় ভক্তি-শ্রদ্ধা না আসাটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই তাফসীরকারগণ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে

কুরআনের শব্দ حصورا -এর অর্থ صبورا তথা "অধিক সবরকারী" ও "চরম আত্মসংযমী" বলে বর্ণনা করেছেন এবং নপুংসক বর্ণনাকারী তাফসীর প্রত্যাখ্যান করেছেন।

كذا فى الشفاء معللا بان هذه نقيضه و عيب ولاتليق بالا نبياء عليهم السلام –

—'শিফা' গ্রন্থে এর কারণ উল্লেখ হয়েছে যে, নপুংসক হওয়াটা দৈহিক ত্রুটির বিষয়, যা নবীগণের জন্য শোভনীয় নয়।

বরং এর উদ্দেশ্য হবে তিনি বড় আত্মসংযমী ব্যক্তি ছিলেন। কাজেই 'শিফা' ইত্যাদি জীবনী গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় যে, শেষ জীবনে তিনি বিয়ে করেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর পুরুষত্বহীন হওয়ার ধারণা অসার প্রতিপন্ন হয়। বরং তিনি এমন শক্তিশালী সুপুরুষ ছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর যৌবনের তেজ রীতিমত বহাল ছিল। আর হযরত 'ঈসা (আ) শেষ যমানায় অবতরণ করার পর বিয়ে করবেন। এমন কি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ويولدله যে, তাঁর সন্তানও হবে। তাহলে তাঁর মধ্যে শারীরিক ত্রুটির কোন অবকাশই থাকতে পারে না। বস্তুত এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি এমন শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, হাজার হাজার বছর ফেরেশতাদের সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও তা হ্রাস পায়নি। বরং এ দ্বারা বাহ্যত তাঁর শক্তি হুযূর (সা)-এর চাইতে অধিক বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হুযূর (সা) সার্বিক গুণ-বৈশিষ্ট্যে আম্বিয়াগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কুরআন-হাদীস দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত। কাজেই সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মোটকথা, সংযমের জন্য বৈরাগী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। নতুবা নবী করীম (সা) বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িত হতেন না। বস্তুত ভোগ-বিলাস হ্রাস করার মধ্যেই আত্মসংযমের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সাহাবীগণের অনুমানের ভিত্তিতে হুযূর (সা) ত্রিশজন, কোন কোন রেওয়ায়েতক্রমে চল্লিশজন পুরুষের সমপরিমাণ বলে বলীয়ান ছিলেন। আর একজন পুরুষ চারজন মেয়ের সমান বলে বিবেচিত। সে মতে শরীয়ত একজন পুরুষের পক্ষে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমোদন দিয়েছে। সে হিসাবে একশ বিশ আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী একশ ষাটজন স্ত্রী রাখার মত যথেষ্ট শক্তি তাঁর ছিল। বরং শারহে শিফা গ্রন্থে আবূ নঈমের উদ্ধৃতিক্রমে মুজাহিদ বলেন ঃ উল্লেখিত চল্লিশজন পুরুষ হবে বেহেশ্তী পুরুষ। আর তিরমিযীর বর্ণনা মতে বেহেশ্তের প্রত্যেক পুরুষ দুনিয়ার সত্তরজন পুরুষের সমপরিমাণ শক্তিশালী। অপর এক রেওয়ায়েতে একশত পুরুষের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে হিসাব মতে তিনি তিন হাজার পুরুষ অপর হিসাবে চার হাজার পুরুষের সমান শক্তিশালী ছিলেন। সুতরাং এমতাবস্থায় কেবল নয়জন স্ত্রীর উপর সবর করাটা তাঁর চরম আত্মসংযমের

পরিচায়ক। অধিকন্তু বৈবাহিক সম্পর্কে আদৌ না জড়িয়ে একেবারে সংযম অবলম্বন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। তাঁর যৌবনের সংযমী আচরণ এর প্রতিই ইঙ্গিত দেয় যে, পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়স্কা এক বিধবাকে তিনি জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কোনও যুবকের পক্ষে এহেন বয়স্কা তদুপরি বিধবা মহিলার পাণি গ্রহণ সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই ভরা যৌবনে চল্লিশ বছর বয়স্কা মহিলাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করা এবং যৌবনকাল এরই সাথে কাটিয়ে দেয়াতে এটাই প্রমাণ হয় তিনি বিলাসপ্রিয় তো ননই, বরং চূড়ান্ত পর্যায়ের সংযমী ছিলেন। তা সত্ত্বেও জীবনের শেষ ভাগে তিনি নয়টি বিয়ে করেছেন, নিশ্চয়ই এতে কোন হিকমত বা রহস্য জড়িত থাকা বিচিত্র নয়। সেগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়।

(এক) ঃ কোন কোন আরেফীন বা সূফী-সাধক বর্ণনা করেছেন যে, প্রেমই হলো বিশ্ব সৃষ্টির মূল উৎস। যেমন— كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق (অর্থাৎ আমি ছিলাম গোপন ভাণ্ডার, পরিচিত হওয়ার আমার ইচ্ছা হলো। তাই জগত সৃষ্টি করলাম।) হাদীস দ্বারা বোঝা যায়। অবশ্য মুহাদ্দিসগণের নিকট আলোচ্য হাদীসটির ভাষা যদিও এরূপ বলে প্রমাণিত না। কিন্তু এর বিষয়বস্তু— ان الله جميل يحب الجمال (অর্থাৎ আল্লাহ সুন্দর আর সৌন্দর্যকে তিনি ভালবাসেন) বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইতিপূর্বে অষ্টাদশ বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে এবং কলীদে মস্‌নবীর ১ম দফ্‌তরে উল্লিখিত

قبول کر دند خلیقه هدیه را تحت

شعر گنج مخفی بدر پیری جوش کرد

ছন্দে আমি বর্ণনা করেছি। এ তো গেল ভূমিকার একাংশ। দ্বিতীয় অংশ হলো—এ মহব্বতের সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কে। বিশেষ কোন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়াই এর মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন-প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। যেমন নির্মল প্রেমের অনুরাগে كن (হয়ে যা)-এর নির্দেশের মধ্যেই বিশ্ব জাহান সৃষ্টির কারণ নিহিত রয়েছে। এতে অন্য কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। সুতরাং আরিফ তথা সাধক ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে মিলনের মধ্যে সৃষ্টির তাজাল্লী বা কিরণ প্রত্যক্ষ করেন। তাই তাঁরা বিয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকেন। কোন কোন আরিফ ব্যক্তি حببت من دنيا كم النساء (পার্থিব বিষয়সমূহের মধ্যে নারীকুল তোমাদের সর্বাধিক প্রেমবিজড়িত বস্তু) হাদীসের মূল রহস্যের অন্তর্নিহিত উৎসরূপে একে উল্লেখ করেছেন।

(দুই) ঃ হুযূর (সা)-এর একাধিক বিয়ের দ্বিতীয় তাৎপর্য ছিল উম্মতের সামনে স্ত্রীদের সাথে আচরণ-বিধির আদর্শ ফুটিয়ে তোলা। নিজে বৈবাহিক সম্পর্কে না জড়িয়ে নারীর অধিকার সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা অধিক ফলপ্রসূ না হবার সম্ভাবনা ছিল অধিক। কারো মনে একটা সন্দেহের বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, তিনি নিজে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িত নন। তাই তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্তে নারী জাতির এতসব অধিকার-সংক্রান্ত বিধি নির্দেশ করা সম্ভব, নতুবা নিজে বিয়ে করলে তাঁর পক্ষেও এসব দায়-দায়িত্ব কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। এখন কারো মুখে একথা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। কেননা হুযূর (সা) উম্মতের চেয়ে অধিক বিয়ের পরও সকলের অধিকার যথাযোগ্য পালন করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। কারণ স্ত্রীর সাথে স্বামীর দ্বিমুখী সম্পর্ক রয়েছে। (১) স্ত্রীকে স্বামীর অধীন করা হয়েছে, সে হিসেবে উভয়ের মধ্যে নায়েব-মনিবের সম্পর্ক। (২) দ্বিতীয়ত পুরুষ প্রেমিক, আর নারীর ভূমিকা প্রেয়সীর। সুতরাং উভয়ের মধ্যে প্রেমের নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান। আধিপত্যের সংস্পর্শে প্রেমের রেয়াত করাটা বড় কঠিন ব্যাপার। প্রায়শ এমনও ঘটতে দেখা যায়—কেউ হয়ত মহব্বতের হক আদায় করতে গিয়ে প্রাধান্যের হক নষ্ট করে বসে। কাজেই স্ত্রী-প্রেমিক বলে খ্যাত স্বামীদেরকে সাধারণত স্ত্রীর দাসত্ব শৃঙ্খলেই বিজড়িত দেখতে পাওয়া যায়। স্ত্রীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে প্রভাব খাটানো তাদের পক্ষে সম্ভব হতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যারা স্ত্রীর ওপর একচ্ছত্র প্রাধান্য সৃষ্টি করে চলে, মহব্বতের হক আদায় করা তাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। উভয় দায়িত্ব সমভাবে পালন করে যাওয়া যে, একদিকে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের প্রভাব অপরদিকে অকৃত্রিম ভালবাসা ও অনাবিল প্রেমের পরশে স্ত্রীকে হৃদয়ের রাণী করে নেয়া। যার ফলে সে স্বামীর সাথে মন খুলে হাসি-তামাশা এবং মান-অভিমানের ভূমিকা নিঃসংকোচে পালন করে যেতে পারে। এ ভূমিকা একজন পূর্ণ মানবের চরিত্রেই লক্ষ করা যেতে পারে যা একমাত্র হুযূর (সা) অথবা তাঁর পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একবার নবী করীম (সা) হযরত খাদীজা (রা)-এর পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন ঃ "আপনি সে বৃদ্ধার স্মৃতিচারণ করছেন অথচ মহান আল্লাহ আপনাকে তাঁর চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।" অতঃপর হাদীসে উল্লেখ করা হয়—فغضب حتى قلت والذى بعثك بالحق لا اذكرها بعد هذا الا بخير অর্থাৎ হুযূর (সা) ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন। যার ফলে হযরত আয়েশা (রা) ভীত-বিহবল চিত্তে আরয করলেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন, এখন থেকে আলোচনা

উঠলে একমাত্র তাঁর উত্তম দিকটাই উল্লেখ করব। এই ছিল হযরত আয়েশা (রা)-এর ওপর তাঁর প্রভাবের অবস্থা, যিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে সবচেয়ে অভিমানী। তাহলে অন্যান্য স্ত্রীর অবস্থা কি হতে পারে সেটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অতএব অভিমান আর প্রভাবকে একত্র করা মুখের কথা নয়।

(তিন) ঃ একাধিক বিয়ের দ্বারা মহানবী (সা) সেসব লোকের জন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন যাদের একের অধিক স্ত্রী রয়েছে যে, স্ত্রীদের সাথে কিভাবে ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করতে হবে। বিশেষত অন্যদের তুলনায় যদি কোন একজনের সাথে মহব্বতের মাত্রা অধিক হয়, সেক্ষেত্রে নিজের পক্ষ থেকে এমন উক্তি করা উচিত নয়, যাতে একজনের প্রতি প্রাধান্য ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় বরং নিজের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে পূর্ণ সমতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

সুতরাং হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তাঁর আন্তরিক মহব্বত অধিক হওয়া সত্ত্বেও ইনসাফের বেলায় তিনি কোন পার্থক্য সৃষ্টি না করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। পক্ষান্তরে একজনের প্রতি মনের ঝোঁক অধিক হওয়াটা ছিল তাঁর ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বাইরের বিষয়। এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করাটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কাজেই তিনি ইরশাদ করতেন ঃ

اللهم هذا قسمى فى ما املك فلا تلمنى فيما لا املك -

—হে আল্লাহ্! সামর্থ্যানুযায়ী এই হলো আমার পক্ষ থেকে সমতা ও সাম্য। সুতরাং ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়ের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করো না।

এতে হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি তাঁর মনের অধিক ঝোঁকের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। আর এটা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ছিল না বরং গায়েবী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তাঁর মন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং বিয়ের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা)-এর রেশমী কাপড়ে জড়ানো চিত্র হুযূর (সা)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন যে, ইনি আপনারই সহধর্মিণী। খোলার পর দেখতে পান তাতে হযরত আয়েশা (রা)-এর ছবি জড়ানো রয়েছে। বলা বাহুল্য—আলমে আখিরাতে ছবি তোলা জায়েয। সেখানে আপনাদের কেউ ছবি তোলার আগ্রহ দেখালে আমরা বারণ করব না। অন্য কোন স্ত্রীর সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ওহীর ক্ষেত্রেও হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপার অন্যান্য বিবি থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ছিল যে, হুযূর (সা) অন্য কোন স্ত্রীর সাথে শোয়া অবস্থায় ওহী আসত না, কিন্তু হযরত আয়েশা

(রা)-এর সাথে একই লেপের নিচে শোয়া অবস্থায়ও তাঁর ওপর যথারীতি ওহী নাযিল হতো। মোটকথা, এসব ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়—হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি তাঁর আকর্ষণের সকল উপকরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। তদুপরি তাঁর জন্মগত মেধা, ধী-শক্তি ও দূরদর্শিতা ছিল সোনায়-সোহাগা। হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি তাঁর অধিক মহব্বতের মূল কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে অধিক ভালবাসতেন। সুতরাং হুযূর (সা)-এর মহব্বত হবে না কেন। এতসব সত্ত্বেও অন্তরের ভালবাসা ছাড়া তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণ সবার সাথে অভিন্ন ছিল। অধিকন্তু পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে তিনি মাত্র নয় বছরের বালিকা হযরত আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অল্পবয়স্কা কুমারী স্ত্রীদের সাথে ব্যবহারের একটা বাস্তব চিত্র উম্মতের সামনে পেশ করা। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের আচরণ সাধারণত নিজেদের বয়স অনুসারেই হয়ে থাকে। কিন্তু হুযূর (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে এমন ব্যবহারের সূচনা করেছিলেন যা তাঁর বয়সের সাথে খাপ খায়। তিনি তাঁর বয়সের প্রতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য রাখতেন। সুতরাং কোন এক ঈদের দিন হাবশী যুবকরা খেলা করছিল। হযরত আয়েশা (রা)-কে তিনি হাবশীদের খেলা দেখবেন কি-না জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলে হুযূর (সা) স্বয়ং পর্দার ব্যবস্থা করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁকে সে খেলার আনন্দ উপভোগ করান। শাব্দিক অর্থেই কেবল খেলা ছিল নতুবা প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এক প্রকারের শারীরিক ব্যায়াম যা সৎ উদ্দেশ্যে করা হলে ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। যেহেতু সে খেলোয়াড়দের দেখার মধ্যে ফিতনার কোন আশংকা ছিল না, কাজেই পরপুরুষকে কিভাবে দেখলেন এ প্রশ্নও আসতে পারে না। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) নিজে সরে না আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে খেলা দেখতে সাহায্য করেন। বাল্য বয়সহেতু হযরত আয়েশা (রা)-এর পুতুল নিয়ে খেলা করার খুবই আগ্রহ ছিল, (এগুলো নামে মাত্র পুতুল যেসব কোন চিত্র বা ফটো ছিল না) এ জন্য মহল্লা থেকে প্রতিবেশিনী সমবয়সী মেয়েরা হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে খেলা করতে আসত। হুযূর (সা) বাড়ি আসলে খেলা ছেড়ে তারা সরে যেত। তিনি তাদেরকে এই বলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন যে, পালাচ্ছ কেন, আস তোমরা খেলা কর। নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে একবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন, দেখা যাক কে আগে যেতে পারে। হযরত আয়েশা (রা) তখন হালকা-পাতলা ছিলেন। তাই হুযূরের আগে সীমা পার হয়ে যান। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় প্রতিযোগিতা করেন। এবার হযরত আয়েশা (রা) মুটিয়ে গিয়েছিলেন, তাই তিনি হেরে যান। হুযূর (সা) বললেন ঃ এটা পূর্বেকার প্রতিশোধ।

এখন বলুন! কুমারী স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও মন যুগিয়ে চলা এহেন বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র নবী করীম (সা) ছাড়া দ্বিতীয় কার পক্ষে সম্ভব ? বয়স্ক লোকদের পক্ষে এ ধরনের আচরণ সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে সে আচরণই করেছেন, যা কোন যুবক স্বামী তার যুবতী স্ত্রীর প্রতিই সম্পাদন করতে পারে বরং যুবকের পক্ষেও ততটুকু সম্ভব নয় যা আল্লাহ্র নবী (সা) বাস্তবে কার্যকর করে দেখিয়েছেন।

মানুষ আজকাল আত্মসম্মান, আত্মসম্মান বলে চিৎকার করে থাকে। আসলে সেটা কি ? বস্তুত তা আত্মগর্ব বৈ নয়। একেই তারা আত্মসম্মান নামে অভিহিত করছে। মূলত আত্মসম্মান-বিরোধী কাজ তা-ই যদ্দ্বারা দীনের ওপর আঘাত আসে। আর যে কাজের দ্বারা দীনের ব্যাপারে কোন আঘাত পড়ে না কিন্তু ব্যক্তি চরিত্রের রসময়তা প্রকাশ পায় সেটাকে বলা হয় তাওয়া'যু বা বিনয়-নম্রতা। বর্তমানে আত্মসম্মানের পোটলা বগলদাবা করে স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাকে যারা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করে, মুখ সামলে তারা চোখ খুলে দেখুক যে, হুযূর (সা) হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। তবে কি (আল্লাহ্ না করুন) মহানবী (সা)-এর ঐ আচরণকেও তারা আত্মসম্মান-বিরোধী বলে মনে করে ? আদৌ নয়। আর কেউ যদি করে তবে তার ঈমানের খবর নেয়া দরকার। সুতরাং হুযূর (সা)-এর কাজ আত্মসম্মান-বিরোধী নিশ্চয়ই ছিল না। অবশ্য মনগড়া তথাকথিত আত্মসম্মানের পরিপন্থী ছিল বটে। সুতরাং সম্মানের দাবিদাররা যদি আত্মগর্বী না হয়, তবে স্ত্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমাদের দেখাক। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত তাদের দ্বারা এটা হবার নয়। অবশ্য যারা অহংকারী নয় এবং নবী করীম (সা)-এর পূর্ণ অনুসারী তাদের পক্ষে অবশ্যই এটা সম্ভব। আল-হামদুলিল্লাহ, এ সুন্নতের ওপর আমল করার ভাগ্য আমাদের হয়েছে।

(চার) ঃ এর মধ্যে অপর একটি হিকমত বা কল্যাণ রয়েছে। আর তা হলো, নারী জাতি সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ হুকুম অপর নারীদের পক্ষে কেবল স্ত্রীদের মাধ্যমে অবগত হওয়াই সহজ ও সম্ভব। তাতেও আবার ব্যক্তিবিশেষের আচার-আচরণে, আদত-অভ্যাসে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। কাজেই মাধ্যম ও সূত্র বিভিন্ন হওয়াতে সকল বিধি-বিধান প্রকাশ পাওয়াটা সহজ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বিবাহিতা স্ত্রী-ই এর একমাত্র মাধ্যম বা সূত্র হতে পারে।

মোটকথা, নবী করীম (সা)-এর বহু বিবাহে যেসব কল্যাণ নিহিত ছিল নমুনাস্বরূপ তার মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। নতুবা এতে আরো এত অধিক

কল্যাণ রয়েছে আজীবন বর্ণনা দিলেও যেগুলো ফুরাবে না। তা সত্ত্বেও ইচ্ছা করলে তিনি জীবনভর সবর করতে পারতেন। যেমনিভাবে পূর্ণ যৌবনকাল কাটিয়েছেন চল্লিশোর্ধ এক বিধবা সহধর্মিণীর সাথে। বস্তুত কল্যাণধর্মী এসব বিভিন্ন কারণেই তিনি বহু বিবাহে মনোযোগী হয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৈরাগ্যবাদ নয় বরং তাক্ওয়া ও আত্মসংযম অনুশীলনের মাধ্যমে ভোগ-বিলাস সীমিত করাটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অন্যথায় নবী করীম (সা) অবশ্যই বৈবাহিক সম্পর্ক এড়িয়ে যেতেন।

— তকলীলুল কালাম, পৃ. ৩২

**প্রশ্ন ঃ ১৫. আপনাদের নবীর কৌতুকপ্রিয়তা আত্মসম্মানের পরিপন্থী।**

উত্তর ঃ নবী করীম (সা)-এর কৌতুকের অন্তরালে বিভিন্ন হিকমত বা প্রজ্ঞা নিহিত ছিল। প্রথমত সাহাবীদের মনে আনন্দ দান করা। আর বন্ধু-বান্ধবের মনে আনন্দ দান করা ইবাদত। আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা ফাতাহ্ মুহাম্মদ সাহেবকে বলতে শুনেছি যে, একবার তিনি হাজী এমদাদুল্লাহ্ (র)-এর খেদমতে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর বিদায়কালে বললেন ঃ আজকে হুযূরের অনেক সময় নষ্ট করলাম, আপনার ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম। হাজী সাহেব বললেন ঃ শুধু নফল পড়াই কি ইবাদত, বন্ধুদের সাথে আলাপ করা কি ইবাদত নয় ? এটা তুমি কি বললে যে, সময় নষ্ট করেছি, আসল ব্যাপার তা নয় বরং এ পূর্ণ সময়টা ইবাদতের মধ্যেই কেটেছে। এমনিভাবে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (র) ফজরের নামাযের পর কোন কোন সময় মুসাল্লায় বসে ইশরাকের সময় পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা মনে করে এ সময়টা ইবাদতবিহীন অযথা ব্যয় হলো। কিন্তু তিনি এ সময়কেও ইবাদতের মধ্যে আছেন বলে মনে করতেন। কেননা মু'মিনের মন খুশি করাটাও ইবাদতের শামিল। এই হলো হুযূর (সা)-এর কৌতুকের এক রহস্য। দ্বিতীয় হিকমত ছিল যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। যৌবনে আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, রাণী ভিক্টোরিয়া এমন এক যানবাহনে আরোহিতা যার সাথে ইঞ্জিন, ঘোড়া অথবা গরু কোনটাই সংযুক্ত ছিল না। তখন আমি যানবাহনটির সঠিক পরিচয় জানতাম না। কিন্তু আজকাল দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত সেটা ছিল মোটর লরী জাতীয় যানবাহন। যা হোক দেখতে পেলাম রাণী ভিক্টোরিয়ার যানবাহনটি থানাভুনের অলি-গলিতে চক্কর দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর নিজেকেও আমি সে একই সওয়ারীতে উপবিষ্ট লক্ষ করলাম। এমতাবস্থায় রাণী ভিক্টোরিয়া আমাকে লক্ষ করে বললেন ঃ ইসলামের সত্যতার মধ্যে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা বিষয়ে মন দ্বিধা জড়িত। এর সমাধান হয়ে

গেলে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহের অবসান ঘটে যাবে। আমি বললাম, বলুন সন্দেহটা কি ? বললেন ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) সময় সময় কৌতুকও করতেন। (এটা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী, অথচ নবীর জন্য আত্মমর্যাদাশীল হওয়াটা অনিবার্য। বস্তুত এ প্রশ্ন মূলত রাজা-বাদশাদেরই উপযোগী। কেননা আত্মসম্মান রক্ষায় তারাই অধিক সচেষ্ট।) জবাবে আমি বললাম ঃ নবী করীম (সা)-এর কৌতুক বা রসাত্মক বাণী ছিল বিশেষ হিকমত তথা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীন। তা হলো—আল্লাহ্ পাক তাঁর সত্তায় এমন প্রভাব ও দীপ্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্যের কিস্‌রা পর্যন্ত রাজ সিংহাসনে বসে তাঁর নাম শুনে ভয়ে ভীত-বিহ্বল হয়ে যেত। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

نصرت بالرعب مسيرة شهر

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মাসের দূরত্ব অতিক্রমকারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর থেকে এক মাসের দূরত্বে অবস্থানকারী লোকদের অন্তরে পর্যন্ত তাঁর প্রভাব-দীপ্তি বিস্তৃত ছিল। নিকটবর্তী লোকদের কথা বলাই বাহুল্য। হুযূর (সা) তো ছিলেন আল্লাহর নবী, মহামানব, তাঁর কথা আলাদা। হযরত উমর, হযরত খালিদ (রা)-এর ন্যায় তাঁর গোলামদের নাম শুনেও সম্রাটগণ ভয়ে কম্পমান থাকত। এটা জানা কথা, হুযূর (সা) কেবল শাসকই ছিলেন না রাসূলও ছিলেন। যাঁর দায়িত্ব হলো—উম্মতের আধ্যাত্মিক, বাহ্যিক ও চারিত্রিক সংশোধন করা। শিক্ষা দেয়া ও নেয়ার এক অনাবিল প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেই কেবল এ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। যার জন্য শর্ত হলো—শিক্ষা গ্রহণকারীর অন্তর শিক্ষা দানকারীর সামনে প্রসন্ন হওয়া, যেন নিঃসংকোচে সে নিজের অবস্থা প্রকাশ করে সংশোধন করে নিতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এত অধিক পরিমাণে প্রভাব দান করেছিলেন যা সাহাবীগণের শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করত। এ কারণে নবী করীম (সা) সময় সময় কৌতুক ও রসাত্মক বাক্যালাপ করতেন যাতে সাহাবীদের অন্তর খুলে যায়। আর সর্বদা প্রভাবান্বিত অবস্থায় থেকে ভাব প্রকাশ করতে তাঁরা যেন বিরত না থাকেন। কৌতুকমাত্রই আত্মমর্যাদা ও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী একথা স্বীকৃত নয়। বরং গাম্ভীর্যের পরিপন্থী কেবল সেই কৌতুক যার মধ্যে কোন হিকমত বা প্রজ্ঞা বিদ্যমান না থাকে। অধিকন্তু এটাও জানা কথা যে, মহানবী (সা)-এর কৌতুক দ্বারা আত্মসম্মানে কোন আঘাত পড়ত না। বরং এর দ্বারা সাহাবীগণের অন্তর প্রসন্ন হয়ে মনের সংকোচ ভাব দূর হয়ে যেত, সীমাহীন প্রভাবের দরুন স্বভাবত যা অন্তরে চেপে থাকত। যার ফলে ভীতির পরিবর্তে নবী করীম (সা)-এর মহব্বতে সাহাবীদের অন্তর

পরিপূর্ণ হয়ে যেত। তিনি সময় সময় এ ধরনের কৌতুক না করলে ভালবাসার স্থলে তাঁর ভীতির প্রাধান্য চেপে থাকত। কিন্তু মহব্বতের প্রাধান্য হওয়ার ফলে তাঁর প্রভাবে কোনরূপ কমতি দেখা দেয়নি বরং পূর্বের তুলনায় অধিক মাত্রায় বেড়ে যায়। কেননা ইতিপূর্বের গাম্ভীর্যের ভিতর ছিল কেবল ভয়-ভীতি। এখন ভয় ও ভালোবাসা একত্রে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। কেউ যদি প্রশ্ন তোলে যে, কৌতুকের ফলে তো ভীতি উড়ে যায়? এর জবাব হলো ঃ এটা সে ক্ষেত্রেই সম্ভব যেখানে কৌতুককারীর প্রভাবে স্বল্পতা থাকে এবং কৌতুকের মাত্রা অধিক হয়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর ন্যায় প্রভাব যদি প্রবল হয়, যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আর কৌতুকের আধিক্য না থাকে, তা হলে এমতাবস্থায় সম্বোধিত ব্যক্তি নির্ভয় হতে পারে না। সুতরাং বাস্তব ঘটনার আলোকে এবং হাদীসের বর্ণনা মতে জানা যায়—সাহাবীদের মনে হুযূর (সা)-এর প্রভাব যে কি পরিমাণ ছিল। কখনো কোন ব্যাপারে রাগান্বিত হলে হযরত উমরের ন্যায় শক্ত প্রাণের বীরপুরুষ পর্যন্ত নতজানু হয়ে বসে যেতেন এবং অক্ষমতার সুরে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দিতেন।

আমার এ জবাবের পর সম্রাজ্ঞী বললেন ঃ এখন আমার মনে প্রশান্তি এসে গেছে। ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এখন আমার আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নাই।

—আল হুদূদ ওয়াল কুয়ূদ, পৃ. ৯

**প্রশ্ন ঃ ১৬. কাফিরের চেয়ে মুরতাদের স্তর নিকৃষ্ট পর্যায়ের কেন ?**

উত্তর ঃ ইসলাম ত্যাগ করার দুটি পর্যায় রয়েছে ঃ (১) হয় প্রথম থেকেই সে ইসলাম গ্রহণই করেনি। (২) নয় কবূল করার পর বর্জন করেছে। উভয় অবস্থার সাজা এটাই, বরং শেষোক্ত অবস্থা প্রথম অবস্থার তুলনায় অধিকতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রদ্রোহীর সাজা সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিবেচিত হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই এ রাষ্ট্রের নাগরিক না বরং অন্য কোন রাষ্ট্রের প্রজা। এমন সব লোকের ওপর জয়লাভ করলে হয় তাদেরকে গোলামে পরিণত করা হয় না হয় কৃপাবশত মুক্ত করে দেয়া হয় অথবা সম্মানের সাথে নজরবন্দী করা হয়। কিন্তু রাজদ্রোহীর সাজা প্রাণ সংহার করা কিংবা কালাপানিতে দ্বীপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। এর কারণ হলো—বিদ্রোহ রাষ্ট্রের জন্য অধিকতর অপমানজনক। তেমনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তা বর্জন করা ইসলামের পক্ষে চরম অপমানকর এবং অপরের কাছে ইসলামের মূল্যবোধকে হেয়প্রতিপন্ন করার শামিল। লক্ষ করুন, এক ব্যক্তি কখনো আপনার সুহৃদ ছিল না বরং আজীবন বিরোধিতাই করে আসছে, তার বিরোধিতায় আপনার তেমন কোন ক্ষতির আশংকা নেই। আপনার বিরুদ্ধে তার

দুর্নাম রটনায় মানুষ বড় একটা কান লাগায় না বা গুরুত্ব দেয় না। এর কারণ হলো—এ ধরনের শত্রুতামূলক আচরণ তো ইতিপূর্বে সে সব সময়ই করেছে। এটা নতুন কিছু নয়। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল আপনার বন্ধু থাকার পর শত্রু হয়ে যদি বিরোধীর ভূমিকায় নেমে আসে তাতে আপনার সমূহ ক্ষতির কারণ রয়েছে। তার বিরুদ্ধাচরণের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। কেননা তখন মানুষ মনে করে কেবল শত্রুতাবশতই সে এহেন ভূমিকায় নেমে আসেনি, অবশ্যই এর মধ্যে কোন কারণ রয়েছে, নতুবা এতদিন তার বন্ধু রইল কিভাবে? কাজেই মনে হয় দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের সুবাদে সে অমুকের গোড়ার খবর জেনে ফেলেছে। তাই এখন বিপক্ষে চলে গেছে। অথচ বন্ধুর ভেদের কথা জানার পরই বৈরী হওয়া জরুরী নয়। বরং সম্ভবত এ উদ্দেশ্যেই সে বন্ধু সেজেছিল যে, লোকেরা মনে করবে বন্ধুত্বের ছত্রছায়ায় আমি তার গোপন তথ্য জানতে পেরেছি। সে মতে আমার কথার প্রতি তাদের আস্থা সৃষ্টি হবে আর তথ্যভেদী হিসেবে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে। সুতরাং কোন কোন ইহুদী ইসলামের সাথে এহেন আচরণের মনস্থ করেছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِا لَّذِیْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

—আহ্‌লে কিতাবদের একদল বলল—মু'মিনদের ওপর যা নাযিল হয় তার প্রতি ঈমান আন দিনের প্রারম্ভে আর শেষ ভাগে তা অস্বীকার করে বস, তাহলে সম্ভবত তারা ফিরে আসবে।

মোটকথা, বন্ধুর বিরোধিতার অন্তরালে এ ধরনের হঠকারিতার সম্ভাবনাও বিদ্যমান রয়েছে। (সংকলক) কিন্তু বন্ধুর বিরোধিতায় মানুষ সাধারণত খুব দ্রুত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে (আর সে সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি মেলার কারো অবকাশ থাকে না)। কাজেই শরীয়ত, বিবেক-বুদ্ধি ও আইনের দৃষ্টিতে সহযোগিতার পর বিরোধিতাকারী ব্যক্তি গুরুতর অপরাধী। সুতরাং ইসলামী শরীয়ত ধর্মত্যাগী মুরতাদের বিরুদ্ধে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনে কঠোর শাস্তির বিধান করেছে।

—মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৯

**প্রশ্ন ঃ ১৭. 'কবীরা গুনাহ্ ক্ষমাযোগ্য অপরাধ'—এ বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে মুসলমানগণ এতে অধিক মাত্রায় লিপ্ত হয়।**

উত্তর ঃ এর একাধিক জবাব হতে পারে। (১) পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিণতি স্বীকার করে নিলে এর ফল এই হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল যে,

যেসব লোকের সম্পর্ক ইসলামের সাথে যত সুদৃঢ় যেমন—আলিম, মুত্তাকী ও সূফী-সাধক প্রমুখ এদের চরিত্রে এর প্রতিক্রিয়া অধিকতর প্রতিফলিত হওয়া। কেননা ধর্মের সাথে তুলনামূলকভাবে গভীর সম্পর্কশীল ব্যক্তির চরিত্রে এর প্রভাব অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের দাবি। অথচ বাস্তবের প্রেক্ষাপটে শুধু আমরাই নই, বিধর্মী কাফিররা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে থাকে যে, ইসলামের সাথে যাদের সম্পর্ক গভীর সে সকল পুণ্যাত্মা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা সন্দেহপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে পর্যন্ত দূরে থাকতে তাঁরা সদা সচেষ্ট। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমার এক বি-এ পাস বন্ধুর ঘটনা মনে পড়ল। একবার তিনি রেলে ভ্রমণ করছিলেন। তার সাথে তখন পনর সেরের অধিক ওজনের মালপত্র। সময়ের অভাবে বুক না করেই তিনি গাড়িতে উঠে বসেন। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছে স্টেশনের কেরাণী বাবুর নিকট গিয়ে ঘটনা ব্যক্ত করে বললেন ঃ ওঠার সময় তো সময়ের স্বল্পতার দরুন মাল বুক করা সম্ভব হয়নি এখন আপনি ওজন দিয়ে এর মাশুল নিয়ে নিন। বাবু "আমার অবসর নেই" বলে মাশুল নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিনা ভাড়ায় সেগুলো নিয়ে যেতে বলল। তিনি বললেন ঃ কেরাণী সাহেব! এটা মাফ করার আপনি কে, আপনি তো রেলের মালিক নন বরং একজন বেতনভোগী কর্মচারী। মাশুল নেয়া আপনার কর্তব্য। কেরাণী এবারও অস্বীকার করায় তিনি স্টেশন মাস্টারের নিকট গেলেন। তারও একই জবাব—মাশুল লাগবে না, আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান। এবারও তিনি একই কথা বললেন ঃ ক্ষমা করার আপনার কোন অধিকার নেই। অতঃপর স্টেশন মাস্টার ও কেরাণী বাবুর মধ্যে এ নিয়ে ইংরেজিতে বাক্যালাপ হতে থাকে। তার লেবাস-পোশাক দেখে তারা ভাবল লোকটা ইংরেজি বুঝে না। যাহোক আলাপ-আলোচনা শেষে তারা সাব্যস্ত করল লোকটা মনে হয় শরাব পান করে এসেছে। নতুবা আমরা তার কাছ থেকে মাশুল নিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও এত পীড়াপীড়ি কেন ? তিনি বললেন ঃ মাস্টার সাহেব, আমি নেশাখোর নই বরং আমার ধর্মের হুকুম হলো নিজ দায়িত্বে কারো পাওনা হক বা অধিকার ঝুলিয়ে রাখবে না। অবশেষে তারা উভয়ে বলল ঃ এখন আমাদের পক্ষে এ মালপত্র ওজন দেয়া সম্ভব নয়। অগত্যা মালপত্র নিয়ে তিনি প্লাটফরমের বাইরে চলে গেলেন। চিন্তা করতে লাগলেন--আয় আল্লাহ্ ! এখন আমি রেল কোম্পানীর প্রাপ্য ঋণ থেকে কি উপায়ে নিজেকে মুক্ত করব ? অতঃপর আল্লাহ্ সহায় হয়ে তার অন্তরে উপায় নির্দেশ করে দিলেন যে, কোনও রেল স্টেশন থেকে অতিরিক্ত মালের মাশুলের সমপরিমাণ মূল্যের টিকেট কিনে ছিঁড়ে ফেললে রেলের পাওনা পয়সা যথারীতি কোম্পানীর ঘরে পৌঁছে যাবে। তাই সে পন্থাই তিনি অবলম্বন করলেন।

আমার অপর এক বন্ধু ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। ঘটনা হলো—ছেলেসহ একবার তিনি রেলে ভ্রমণ করছিলেন। ছেলেটি খর্বাকৃতি ছিল বলে দৃশ্যত দশ বছরের মনে হতো। অথচ তার বয়স তখন তের বছরের কাছাকাছি। রেলের আইনানুযায়ী তার ফুল টিকেট দরকার। পুরো টিকেট নিতে চাইলে সাথীরা বারণ করে বলল—একে তের বছরের কে বলবে, আপনি হাফ টিকেট নিয়ে নিন, কেউ কিছু বলতে পারবে না। তিনি বললেন—বান্দা কিছু না বলুক তাই বলে আল্লাহ্ও কি ছেড়ে দেবেন ? তিনি কি জিজ্ঞেস করবেন না অন্যায়ভাবে পরের হক কেন নষ্ট করলে ? যাই হোক তিনি পুরা টিকেটই নিলেন। এদিকে সঙ্গীদের প্রতিক্রিয়া ছিল লোকটা বোকা! কবির ভাষায় ঃ

اوست دیوانه که دیوانه شد

—অর্থাৎ বস্তুত সে-ই পাগল যার অন্তর সত্যের উন্মাদনা শূন্য।

মোটকথা, কোন জাতি নিজ সম্প্রদায়ের কোন সদস্যের এহেন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারবে না।

এ ঘটনাকে সন্দেহমূলক বলা হয়েছে সাধারণ লোকের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে এটা সন্দেহের পর্যায়ভুক্ত বিষয় নয় বরং তা-হলো ওয়াজিব তথা অবশ্যপালনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং "কবীরা গুনাহ্ ক্ষমাযোগ্য" এ বিশ্বাসের ফলশ্রুতিই যদি মানুষকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করত তাহলে দীনদার ও আলিমগণেরই বে-পরোয়াভাবে এবং ব্যাপক হারে এতে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অথচ ইসলামের সঠিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত মুসলমানদের এ শ্রেণীর লোকরাই পাপাচার, গুনাহ্ ও সন্দেহজনিত বিষয় থেকে অধিকতর আত্মসচেতন এবং আত্মরক্ষাকারী। কাজেই বোঝা গেল, আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া এটা নয় যা প্রশ্নকর্তার ধারণা। বরং গুনাহ্ থেকে দূরে থাকা এবং পাপাচারের প্রতি ঘৃণাবোধ জন্মানোই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাসের প্রভাবে ঘৃণাবোধের কারণ একটু পরই ব্যক্ত করছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ঃ

چشم بد اندیش که برکنده باد
عیب نماید هنرش در نظر

—গুণ-বৈশিষ্ট্য যার দৃষ্টিতে দোষের কারণ এহেন কুচক্রীয় চোখ অন্ধ হওয়াই ভাল।

সুতরাং যে বিশ্বাসের শাণিত আঘাতে পাপাচারের শিকড় নির্মূল হয়ে যায় কুচক্রী লোকেরা সেটাকেই পাপের প্রেরণা ঠাওরাতে চায়। অতএব এ জবাব দ্বারা পাপাচারের প্রতি সৃষ্ট আগ্রহ-ইচ্ছা মুসলমানদের উক্ত বিশ্বাসের ফল বলে আপনাদের সে দাবি বাস্তব ঘটনা ও বিবেকানুভূতির আলোকে অসার প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

(২) এর যুক্তিপূর্ণ দ্বিতীয় জবাব হলো—"এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়," মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি এ কথার প্রতি সমর্থন দেয় না। কেননা এর সারমর্ম কেবল এতটুকুই যে, কবীরা গুনাহ্ সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেয়ার একচ্ছত্র অধিকারী। কিন্তু কাকে ক্ষমা করবেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ এ কথা কারো জানা নেই যে, আমার সম্পর্কে مشيت الهى (আল্লাহ্‌র ইচ্ছা) ক্ষমার আকারে আমার অনুকূলে না (যোগ্য হিসেবে আইনের দৃষ্টিতে—সংকলক) শাস্তিরূপে প্রতিকূলে প্রকাশ পাবে। কাজেই এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষে আযাব থেকে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেকেরই মধ্যে এ আশংকা প্রবল যে, সম্ভবত এ বিধান আমার ওপরই প্রয়োগ করা হবে। একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। যেমন ধরুন, পুরুষত্বহীন এক ব্যক্তি লোকলজ্জার কারণে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিষ পান করে। ঘটনাক্রমে সে বেঁচে যায় বরং বিষ হজম হয়ে তার দেহে পুরুষত্বশক্তি সঞ্জীবিত করে তোলে। কোন কোন জায়গায় এরূপ ঘটনা বাস্তবে ঘটেছেও। এখন কথা হলো, আকস্মিক এ ঘটনায় নির্ভরশীল হয়ে কেউ বিষ পানের দুঃসাহস দেখাতে পারে কি ? আদৌ এমন হতে দেখা যায় না। জ্ঞানবান মাত্রেরই জানা কথা যে, বিষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হলো প্রাণ বিনাশ করা কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী কোন কারণে এ ব্যক্তির মধ্যে বিষ তার সৃষ্টিগত স্বভাবের বিপরীত কাজ করেছে বিধায় যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য কেউ বিষ পানের দুঃসাহস সচরাচর দেখায় না। তদ্রূপ ক্ষেত্র বিশেষে এমনও হয় যে, প্রচলিত আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিছক দয়াবশত বাদশাহ্ হয়তো কোন খুনির প্রাণদণ্ড মওকুফ করে দেন। কিন্তু তাই দেখে প্রত্যেকে এ কাজের দুঃসাহস দেখাতে পারে না। কেননা জানা কথা যে, হত্যার নির্ধারিত সাজা ফাঁসি আর স্বভাবত এ বিধিই কার্যকর হয়ে থাকে। ক্ষমা কোন আইন নয়, নিছক রাষ্ট্রপতির দয়ার ওপর নির্ভরশীল। কার প্রতি তাঁর এ দয়া প্রদর্শিত হবে এটা জানা নেই। তাই এর ওপর ভরসা করে কেউ ফাঁসিযোগ্য অপরাধে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং কবীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়া নিছক রাজকীয় দয়ার ব্যাপার। তাই এ বিষয়কে কি প্রকারে অপরাধ প্রবণতার প্রেরণাদায়ী কারণ সাব্যস্ত করা যেতে পারে ? অনুরূপ বনে-জঙ্গলে পায়খানা করে ঢিলা ভাঙ্গতে গিয়ে মাটির নিচে কেউ সোনার

কলস পেয়ে গেল। এখন এ আকস্মিকতার ওপর নির্ভর করে ক্ষেতি-খোলা, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তদ্রূপ কবীরা গুনায় অপরাধী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট আযাব থেকে মুক্তি দেয়া আকস্মিক ও দৈবাতের বিষয় মাত্র। কাজেই এটা অপরাধ প্রবণতার কারণ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও যারা এহেন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়, মূলত সেটা তাদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক দোষের কারণে, আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাবে নয়।

(৩) অতঃপর শাস্তি না দিয়ে অপরাধী বিশেষকে ক্ষমা করে দেয়ার মূল হেতু কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, এটাও কোন সৎ কাজের ফলশ্রুতিতেই হয়ে থাকবে। আবূ দাঊদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—এক ব্যক্তি কোন মামলার ব্যাপারে নবী করীম (সা)-এর সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে বললো ঃ

اشهد بالله الذى لا اله الا هو ما فعلت ذالك –

অর্থাৎ সেই আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে বলছি যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই এরূপ কাজ আমি করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ فقال رسول الله بل قد فعلت لكن غفر الله لك باخلاص قول لا اله الا هو। অবশ্যই তুমি এ কাজ করেছ (আর তুমি মিথ্যা কসম খাচ্ছ, যা গুরুতর অপরাধ) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য لا اله الا الله -এর বরকতে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ই জানেন সে তখন কেমন অন্তরে আল্লাহ্র নাম নিয়েছিল যা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয়ে গেছে।

(অর্থাৎ পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ মনে সে তখন আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করছিল। যার বরকতে তার মিথ্যা কসমের শাস্তি মাফ হয়ে যায়।) এর অর্থ এ নয় যে, হুযূর (সা) তার অনুকূলে ডিক্রি দিয়েছিলেন। বরং "তার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে" কেবল এতটুকু ব্যক্ত করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কেননা ওহীর মাধ্যমে মিথ্যা কসমের সংবাদ জানার পর সে ব্যক্তির অনুকূলে রায় দেয়া মহানবী (সা)-এর পক্ষে কি করে সম্ভব। তাহলে দেখুন! অপরাধ কত মারাত্মক, একে তো মিথ্যা কসম। তাও আবার আল্লাহ্র রাসূলের সামনে! বস্তুত রাসূলুল্লাহ্র সামনে মিথ্যা কসম খাওয়া যেন স্বয়ং খোদারই সামনে কসম খাওয়া। বলা বাহুল্য, স্থান-কাল ভেদে কাজের গুরুত্ব বেড়ে যায়। কথাটা আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, যেমন—যিনা করা অপরাধ, কিন্তু মসজিদে করা অধিকতর গুরুতর। এ একই কাজ কোন পাপিষ্ঠ যদি কা'বা ঘরে করে বসে তাহলে সেটা আরো মারাত্মক। এমনিভাবে মিথ্যা কসম খাওয়া গুনাহ্। কিন্তু হুযূর (সা)-এর সামনে খাওয়া অধিক গুনাহ্র ব্যাপার। যেহেতু তিনি আল্লাহ্র নায়েব বা প্রতিনিধি তাই তাঁর সামনে মিথ্যা কসম খাওয়া যেন আল্লাহ্র সামনে খাওয়া। কেউ

হয় তো প্রশ্ন করতে পারে—আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ স্বয়ং আল্লাহ্র সামনে সম্পাদিত ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই হুযূর (সা)-এর সামনে কিংবা আড়ালে মিথ্যা কসমের গুনাহ্ সর্বত্র একই পর্যায়ের হওয়া উচিত ? এর জবাব হলো—তখন কসমকারী ব্যক্তি অবশ্যই আল্লাহ্র সামনে থাকে কিন্তু আল্লাহ্ তো তার সামনে হাযির থাকেন না (অর্থাৎ আল্লাহ্কে সে হাযির জ্ঞান করে না)।

আমার কথার উদ্দেশ্য হলো—হুযূর (সা)-এর সামনে কসম খাওয়া আল্লাহকে সামনে হাযির মনে করে কসম খাওয়ার সমতুল্য। মোটকথা—জানা দরকার যে, قرب বা নৈকট্য দু-প্রকার। (এক) قرب حسى তথা অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়গত নৈকট্য। এটা দুই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (দুই) قرب علمى . অর্থাৎ জ্ঞানগত নৈকট্য। এটা এক পক্ষ থেকেও হতে পারে। সুতরাং এখন যে আপনারা আল্লাহ্র সামনে রয়েছেন এটা قرب علمى অর্থাৎ জ্ঞানগত নৈকট্যের অন্তর্ভুক্ত যে, আপনাদের কোন অবস্থাই আল্লাহ্র নিকট গোপন নেই, সবই তিনি জানেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনাদের আল্লাহ্র নৈকট্য রয়েছে বলা যায় না। অন্যথায় সবই খোদার 'মুকার্‌রব' বা নৈকট্যশীল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর কিয়ামতের মাঠে আপনাদের আল্লাহ্র সামনে হওয়াটা উভয়পক্ষ থেকে হবে। আপনারা যেমন আল্লাহ্র সামনে হাযির হবেন তদ্রূপ তিনিও আপনাদের সামনে উপস্থিত থাকবেন। সুতরাং কুরআনের বাণী نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (অর্থাৎ আমি তার ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী) আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্যই বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই এটা বলা হয়নি যে, তোমরাও আমার নিকটবর্তী বরং এখানে কেবল আল্লাহ্ নিকটবর্তী এ কথাই বোঝানো হয়েছে। বস্তুত এখানে মজার ব্যাপার হলো—আল্লাহ্ তো আমাদের নিকটে রয়েছেন অথচ আমরা তাঁর থেকে দূরে। কবির ভাষায় ঃ

یار نز دیك تر زمن به من است
وین عجب ترکه من از وے دو رم

—বন্ধু তো আমার নিজের চেয়েও আমার নিকটে রয়েছে, অথচ কি আশ্চর্য আমি রয়েছি তার থেকে যোজন দূরে। সুতরাং হুযূর (সা)-এর সামনে মিথ্যা কসম খাওয়া কিয়ামতের ময়দানে স্বয়ং আল্লাহ্র সামনে মিথ্যা কসম খাওয়ার নামান্তর। যখন আপনারাও আল্লাহ্ তা'আলাকে নিজের সামনে হাযির-নাযির জ্ঞান করবেন।
—মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৯

(৪) চতুর্থ জবাব হলো—কোন কোন পাপের শাস্তি না হওয়া নেহায়েত মহান আল্লাহ্র কৃপা ও ক্ষমাশীলতা গুণের প্রকাশ মাত্র। যা শুনে মানুষ বুঝতে পারে যে,

আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি অসীম দয়ালু। আর দয়া ও দানের ফলে ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম, অবাধ্য হওয়াটা অযৌক্তিক আচরণ বৈ নয়। প্রভুর দয়া-প্রাচুর্যে আনুগত্যের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক কথা। কিন্তু মনিবের এহেন দয়া লাভের পরও চাকরের পক্ষে অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী হওয়া নিঃসন্দেহে তার বিকৃত মানসিকতা ও চরিত্রহীনতার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এর ফলে সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ভৃত্য প্রভুর পরম ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে থাকে। কাজেই এ বিশ্বাস পাপাচারের কারণ নয়; বরং অপরাধ প্রবণতার মূলোৎপাটনকারী। বিবেকবান লোকেরা মহান আল্লাহ্‌র এসব দান-অনুদানে আপ্লুত হয়ে পড়ে। সুতরাং ইসলামের সাথে সম্পর্ক যাদের গভীর তাদের চরিত্রে এ বৈশিষ্ট্যটাই নিবিড়ভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। এখন এ বিশ্বাস সত্ত্বেও কারো মধ্যে অপরাধপ্রবণতার মনোভাব ফুটে উঠলে সেটা আকীদার প্রভাবে নয়; বরং ব্যক্তির বক্রবুদ্ধির লক্ষণ। যেমন বাদশার উদারতা ও দয়ার প্রভাবে সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি অধিক অনুরাগী হয়ে থাকে, যদিও বিকৃত ও দুষ্টমতি লোকেরা এর ফলে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। তাহলে এর জন্য দায়ী কি বাদশার দয়া, না তাদের বিকৃত মানসিকতা ? বিবেকবানদের হাতে এর মীমাংসার ভার ছেড়ে দেয়া হলো। কেউ কেউ

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا –

—(আল্লাহ্‌র রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।) আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ধারে সক্ষম না হয়ে ধোঁকায় পড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কেননা আয়াতে لمن يشاء (যাকে ইচ্ছা) শর্ত না থাকায় তারা ধারণা করে নিয়েছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত যে, প্রথমত এ আয়াত ব্যাপক অর্থবোধক নয়; বরং সে সব লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী বটে, কিন্তু কুফরী অবস্থায় মারাত্মক পাপাচারে লিপ্ত ছিল। এখন পরিণাম কি হবে, ইসলাম গ্রহণের পরও কি সেসবের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, নাকি হবে না ? যদি জিজ্ঞাসাবাদই হলো তাহলে ইসলাম দ্বারা কি উপকার সাধিত হলো ? এসব চিন্তার কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল যে, মুসলমান হবে কি হবে না। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কাফিররা হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলো ঃ

لو اسلمنا فما يفعل بذنوبنا التى اسلفنا او كما قالوا –

—আমরা মুসলমান হলে আমাদের পূর্বকৃত গুনাহ্ সম্পর্কে কি ফয়সালা হবে ? অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে তাদের অভয় দেয়া হয় যে, ইসলামের পূর্বে

কুফরী অবস্থায় কৃত যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তাই বোঝা গেল আয়াতের মর্মানুযায়ী ক্ষমা হবে ঠিকই কিন্তু তা ব্যাপক হারে নয়। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, অন্যদের গুনাহ্ শাস্তি ছাড়া মাফই করা হবে না। বস্তুত ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ক্ষমা তাদেরও হবে, তবে সেই শর্তে ويغفر مادون ذالك لمن يشاء [অর্থাৎ আল্লাহ্ এ ছাড়া (কুফর ও শিরক) অন্যান্য গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন যাকে ইচ্ছা।]

আয়াত শর্তসহ বর্ণিত হয়েছে। এতে নিশ্চিত ওয়াদার উল্লেখ নেই; বরং مشيت তথা 'ইচ্ছার' শর্তে শর্তায়িত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে শর্তবিহীন ক্ষমার ওয়াদা কেবল নও-মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাদের ইসলাম-পূর্ব ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ্ অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য। আয়াতের শানে নুযুল এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। আর শানে নুযুল (অবতরণকালীন প্রেক্ষাপট) তাফসীরের পর্যায়ভুক্ত। এমনি বহুতর نص বা আয়াত দৃশ্যত ব্যাপক অর্থবোধক মনে হয়। কিন্তু শানে নুযুলের প্রেক্ষাপটে সেগুলো সীমিত ও গণ্ডিভুক্ত হয়ে যায়। —মাহাসিনে ইসলাম, পৃ. ৮

**প্রশ্ন ঃ ১৮. মুসলমানদের পশু জবাই করা নিষ্ঠুরতার শামিল।**

উত্তর ঃ মুসলমানদের প্রতি বিধর্মীদের প্রশ্ন—"এরা কি নিষ্ঠুর-নির্দয়, পশুর গলায় ছুরি চালাতে এদের পরাণে এতটুকু বাধে না"—নিছক অজ্ঞতা অথবা বিদ্বেষপ্রসূত উক্তি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—তাদের যত ওযর-আপত্তি তা শুধু গরু কোরবানীর বেলায়—ইঁদুর, বকরী, মুরগী, কবুতর ইত্যাদির ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। মনে হয় এর মধ্যে কোন কিন্তু আছে। বস্তুত এ সন্দেহ তাদের মায়া-মমতার ভিত্তিতে নয়, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও ধর্মীয় গোঁড়ামিই এর অন্তর্নিহিত কারণ। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ পাশ কাটিয়ে যদি সকল পশু সম্পর্কে এ অভিযোগ উত্থাপন করেন তা হলে তার জবাব হবে, মুসলমানের অন্তর শক্ত কি নরম এ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা কতটুকু ? তাদের এ অভিযোগ যদি সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট নাও হয় তবু অন্তত অজ্ঞতাপ্রসূত তো বটেই। এ অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তর্কশাস্ত্রবিদ আলেমগণ বিভিন্ন ভঙ্গিতে, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন। যাতে তর্কশাস্ত্রবিদ আলেমদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলার কোন আপাতঃসুযোগ থাকতে পারে না। কেননা এ পর্যায়ে বিষয়বস্তুর বৈধতা যাচাই করা উদ্দেশ্য থাকে না বরং এ পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষকে লা-জবাব করে দেয়াই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশ্য যেখানে বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য যাচাই এবং যথার্থ পর্যালোচনা করা উদ্দেশ্য হয় সেখানে আল্লাহ্র তরফ থেকে বিষয়টির সঠিক মর্ম 'এল্কা' বা প্রকাশ ঘটানো হয়। সুতরাং আল্হামদুলিল্লাহ্ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার মনে এর জবাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে,

মুসলমানদের অন্তর যে দয়াহীন-নিষ্ঠুর তাদের এ অনুভূতির ভিত্তি কি ? জবাই করার কালে মুসলমানদের প্রাণে ব্যথা লাগে কি লাগে না তলিয়ে দেখুন। সমসাময়িক কোন বুযুর্গের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে—জবাই করার সময় তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে যেত। কোন্ কারণে—কিসের টানে এমন হলো ? মায়া-দয়া তা হলে আর কোন্ জিনিসের নাম। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুসলমানদের ইনসাফপূর্ণ আচরণ একদেশদর্শী বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হচ্ছে ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ -

—এমনিভাবে তোমাদেরকে আমি এক মধ্যপন্থী উম্মতরূপে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য হবেন সাক্ষীস্বরূপ।

এখানে وسط অর্থ ইনসাফ ও মধ্যপন্থা অর্থাৎ শক্তি ও কর্ম উভয়টার মধ্যে যেন সমন্বয় সাধন করা হয়। বিষয়টা এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যেমন দুঃসাহস ও কাপুরুষতার মধ্যবর্তী বীরত্ব, তদ্রূপ কামুকতা এবং পাপাচারের মধ্যবর্তী সচ্চরিত্রতা। অতএব বীরত্ব ও সচ্চরিত্রতার সমষ্টি হলো আদল, ইনসাফ তথা ন্যায়নিষ্ঠতা। সুতরাং কুরআনের মর্মানুযায়ী উম্মতে মুসলিমা এমনি উম্মতে আদেলা বা ন্যায়নিষ্ঠ জাতি। কাজেই খোদায়ী বিধান এমন ছাঁচে প্রণয়ন করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে আদলের পরিমাণ যদি কমও থাকে তবু যেন সেগুলো কার্যকর করা বৈধ হয়। বাড়াবাড়ি এমন যেন না হয় যে, নির্দয়ভাবে ছুরি চালিয়ে দেয়া হলো অথবা জীব হত্যা মহাপাপের নামে একেবারে হাত থেকে ছুরিই ফেলে দিলো। মোটকথা আয়াতের মর্মার্থ হলো, এতদুভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করো। তাই আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো, অন্তরে দয়াও আছে আবার ছুরিও চালাই। কিন্তু কবির ভাষায় ঃ انکه جان بخشد اگر بخشد رواست সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ মৃত্যু ঘটালে আপত্তির কি আছে ? কেউ যদি প্রশ্ন করে তিনি তো মারেন নাই ? কবিতার দ্বিতীয় ছন্দে এর জবাব লক্ষ করা যায় نائب ست اور ست اور ست خداست (মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, মানুষের হাত খোদারই হাত)। এটা স্বীকৃত কথা যে, প্রাণের মালিক যিনি ইচ্ছা হলে তা ফিরিয়ে নেয়া তাঁরই অধিকার। আমরা তাঁরই প্রতিনিধি, আদেশ দিয়েছেন, তাই ছুরিকা চালাই। বস্তুত প্রাণীর জীবন আমরা হরণ করছি না, আমরা তো কেবল দেহ-পিঞ্জর থেকে প্রাণবায়ু বের হওয়ার পথ করে দিয়েছি মাত্র। তাহলে মুসলমানদের নির্দয় হওয়ার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে। আর আপনারা বড় দয়ালু! নিজেরা তো ইঁদুর পর্যন্ত মারতে নারাজ, দরকার হলে

মুসলমান মহল্লায় এনে ছেড়ে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য—তারা মারুক। তাহলে আপনারা চিকা মারার জন্য যে ক্ষেত্রে আমাদেরকে উকিল বানিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ গরু জবাই করার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করলে দোষের কি আছে। বস্তুত আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বে তো সুবিধাও রয়েছে যে, মারো আর খাও। আর আপনাদের প্রতিনিধিত্বের ফল হলো এই যে, মারো আর ফেলে দাও। সুবহানাল্লাহ! দয়ার কি নমুনা যে, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় তাই তোমরাই সাফ করো। ওকালতী আর বলে কাকে ? এটা তো মুখের কথারও বাড়া, মুখে পরিষ্কার বললে এ আবদার রক্ষা করা কোন মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কারণ নিজের কাজ-কারবার ফেলে কে এমন দায়ে ঠেকেছে যে, তোমাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইঁদুর মারা অভিযান করে বেড়াবে। তাই তোমরা আমাদের দুয়ারে ছুঁড়ে দিলে। ভাবখানা এই—হাতের নাগালে তুলে দিলাম, চলো এবার নিশ্চিন্তে মারতে থাকো। এটা এমনই দয়া যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল বড় লজ্জাহীন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার স্বামী কোথায় ? লজ্জার খাতিরে মুখে বলতে বাধল অথচ না বললেও চলে না, তাই তার সামনেই কাপড় তুলে প্রস্রাব করল অতঃপর তা ডিঙ্গিয়ে গেল। এর অর্থ হলো, নদীর ওপার গেছে। কাজেই বন্ধুগণ! কোন কোন দয়া এমনই হয়ে থাকে। এর আরো একটা উপমা দেয়া যাক। এক ব্যক্তি যিনা করার ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে যায়। সমাজে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, 'আযল' করলি না কেন ? (বীর্যপাতের পূর্বে লিঙ্গ বিযুক্তিকে 'আযল' বলা হয়।) উত্তরে সে বলল ঃ শুনেছি 'আযল' করা নাকি মাকরূহ। হতভাগা, পাপিষ্ঠ! যিনা করা কবে ফরয শুনেছিলি ? কারো কারো পরহেযগারী এ ধরনের হয়ে থাকে। কাজেই আপত্তিকারীদের দয়া উক্ত স্ত্রীলোকের শরমের সাথে তুলনীয় যে, মুখে বলতে তো লজ্জায় দিশেহারা অথচ পরপুরুষের সামনে কাপড় উল্টে নেংটা হয়ে বসতে শরমে বাধল না। আর সে মুখে কিনা মুসলমানদের উপর আপত্তি ? বন্ধুগণ! আল্লাহ্র কসম খেয়ে আমি বলতে পারি, মুসলমানদের ন্যায় মায়া-মমতা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। বাস্তবেই এটা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবির কয়েকটি ছন্দ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

دیکر قسم کھے کہ تو میرا لھو پیئے

کرپی نہ جائے جلد سے پیالہ شراب کا

اس وقت ھم سلام کرین قبلہ آپکو

گر کچہ بھی خوف کیجئے روز حساب کا

اور امتحان بغیر تویہ آپکا غلام

عامل نہیں ہے قبلہ کسی شیخ و شاب کا

—কসম দিয়ে সে বলল ঃ তুমি শীঘ্র যদি শরাবের পেয়ালা পান না কর, তবে যেন আমার রক্ত পান করছ। কিন্তু হুযূর! আমরা আপনাকে ভক্তি ও সালাম তখনি করব যদি আপনার অন্তরে হিসাবের দিন তথা কিয়ামতের কিছু ভয়-ভীতি জাগ্রত থাকে। আর আপনি যাই হোন না কেন পরীক্ষা ব্যতীত আমরা কারো কথা মানতে রাযী নই।

সুতরাং বাস্তবের ঘটনাপ্রবাহ এ সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দয়ার ক্ষেত্রে দয়া করা, মায়া দেখানো একমাত্র মুসলমানদেরই বৈশিষ্ট্য। কোন জাতিই মুসলমানদের ন্যায় দয়ার্দ্রচিত্ত নয়। একবার আমার নিকট জনৈক ব্রাহ্মণের একটি পত্র আসে। সারমর্ম ছিল—মুসলমানদের ওপর অপবাদ দেয়া হয় যে, গরু ইত্যাদি জবাই করে তারা জীব হত্যা করে থাকে। কিন্তু আমার মতে তারা কোন জুলুম-অন্যায় তো করে না। অথচ প্রশ্নকর্তার নিজ সম্প্রদায় এ অত্যাচার করে থাকে। উক্ত ব্রাহ্মণের বক্তব্য উল্লেখ করার আমার উদ্দেশ্য হলো—কবির ভাষায় ঃ

الحق ما شهدت به الا عداء –

—সত্যের বাণী দুশমনের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়।

বস্তুত মাথায় চড়ে বলার নামই তো জাদু। মুসলমানরা বড় দয়ালু ও বিনম্র মনের অধিকারী। সাক্ষী হিসেবে এর ওপর কয়েকটি প্রমাণ উপস্থিত করা হলো। সুতরাং তাদের মায়া-দয়া এর দ্বারাই প্রমাণ হয়ে যায়। —রূহুল আজ্জ ওয়াস্‌সাজ্জ, পৃ. ১৫

**প্রশ্ন ঃ ১৯. জবাই করলে যদি সহজে প্রাণ বের হয়ে যায়, তবে মানুষকেও জবাই করে দেয়া উচিত।**

উত্তর ঃ এ কথা জোর দিয়ে এবং দাবি করে বলা যায় যে, ইসলামী শরীয়তের তুলনায় অধিক দয়া অন্য কোন ধর্মে বর্তমান নাই। আর পশুকে জবাই করাটা দয়ার পরিপন্থী নয়। বরং পশুর বেলায় নিজে নিজে মরার চেয়ে ছুরির নিচে প্রাণ দেয়া অধিকতর আরামদায়ক। কেননা এতে কষ্ট কম হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে—যদি তাই হয় তবে তো মানুষকেও জবাই করে দেয়া উচিত, যেন আরামে মরতে পারে। এর জবাব হলো—অন্তিম মুহূর্তের পূর্বে জবাই করা জেনেশুনে হত্যা করারই শামিল। আর সে মুহূর্তের পরিচয় জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা এমনও দেখা গেছে যে, কোন মরণোন্মুখ ব্যক্তি পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন প্রাণীর বেলায় কথা থাকতে

পারে যে, এদের অন্তিম মুহূর্তের অপেক্ষাও তো করা হয় না ? এর উত্তর হলো— জীব-জন্তু এবং মানুষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে, মানব জীবন সংরক্ষণ করাই মূল লক্ষ্য। কারণ মানুষের কল্যাণেই জগতের সৃষ্টি। ফেরেশ্‌তা ও জগতের অন্যান্য বস্তু বর্তমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ আনুষঙ্গিক সবকিছুর অস্তিত্বের পরেই আসল উদ্দিষ্ট বস্তুটি সৃষ্ট বা উপস্থিত হয়ে থাকে। তাই মানুষকে হত্যা কিংবা জবাই করার হুকুম দেয়া হয়নি। নতুবা বহু লোক এমতাবস্থায় হত্যা করে ফেলার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। অথচ তাদের আরোগ্যের আশা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কেননা হত্যাকারীদের বিবেচনায় হয়ত এটাই তার অন্তিম মুহূর্ত।

পক্ষান্তরে পশুর জীবন কাম্য না হওয়ায় একে জবাই করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। একে তো এতেই এদের শান্তি, দ্বিতীয়ত এদের গোশত মানব দেহের জন্য উপকারী খাদ্য, যে মানব জীবনের সংরক্ষণই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জবাই ছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে "জীব-জন্তু" মরতে থাকলে এদের পচা গোশতের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল, যার ব্যবহার মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর হতো। কিন্তু কিসাস ও জিহাদের ময়দানে ব্যক্তির বিনাশ দ্বারা সমষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রে হত্যার মাধ্যমে প্রাণ সংহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও হুকুম রয়েছে যে, অপেক্ষাকৃত সম্ভাব্য সহজ পন্থায় যেন হত্যাকাণ্ড কার্যকর করা হয়। অর্থাৎ এখতিয়ারী হত্যা তথা কিসাসের ক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে কিন্তু জিহাদের ময়দানে আকস্মিক হত্যাকালে মুস্‌লা (হাত-পা, নাক-কান ইত্যাদি কর্তন) করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। —এফনাউল মাহবুব, পৃ. ৫

**প্রশ্ন ঃ ২০. মুর্দাকে দাফন করাতে পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়, তাই পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম।**

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়তে মরা পোড়ানো নিষিদ্ধ করে লাশ দাফনের হুকুম দেয়ার মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। কেননা দাফন করার মধ্যে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রমাণিত হয়, কিন্তু পুড়িয়ে ফেলা শরীয়তের মূলনীতি পরিহার করারই নামান্তর। কোন কোন দার্শনিক পোড়ানোর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে এবং মুর্দাকে কবরস্থ করার বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন ঃ এতে মাটি দূষিত হয়ে যায় এবং এর প্রতিক্রিয়ায় উত্থিত বাষ্প পর্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় যুক্তির মাধ্যমে তারা মৃত ব্যক্তিকে পোড়ানোর স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়াস চালায়। অথচ বাস্তবে আমরা এর বিপরীত অবস্থাই প্রত্যক্ষ করে থাকি। আজ পর্যন্ত কোন গোরস্থান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে দেখা যায়নি। পক্ষান্তরে চিতাখোলায় মানুষ পোড়ার দুর্গন্ধে দম

বন্ধ হওয়ার উপক্রম এবং নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার যোগাড়। সব কাজের পিছে
একটা যুক্তি দাঁড় করানো যায় যদিও সেটা অসার-অর্থহীন হোক। কিন্তু সুস্থ বিবে
বুদ্ধি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিজেই অনুধাবন করতে সক্ষম। বস্তুত দাফন করাটা
বাস্তব ও বিবেকসম্মত বিষয় এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কেননা এ
শরীরকে যেন তার মূল সত্তায় ফিরিয়ে দেয়া হলো। মৃত্তিকা যে দেহের মূল উপা
এর প্রমাণ হলো, আপন সত্তার প্রতি প্রত্যেক বস্তুর আকর্ষণ রয়েছে। কোন ব্য
ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে ওপরের দিকে ওঠতে পারলে প্রমাণ হতো যে, মা
দেহের উপাদানে আগুন কিংবা বায়ুর প্রাধান্য রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নদী-নালায় ড
তলিয়ে না গেলে বোঝা যেত তাতে পানির অংশ বেশি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ই
থাকলেও মানুষ না শূন্যে ওঠতে পারে আর না পানিতে ভাসতে সক্ষম। সুতরাং এ
বোঝা যায় মানবদেহের সৃষ্টিগত উপাদানে মাটির প্রাধান্য অধিক পরিমাণে রয়ে
যুক্তিসঙ্গত প্রবাদ রয়েছে— كل شئ يرجع الى اصله "প্রত্যেক বস্তুই তার মূল সত্
দিকে ফিরে যায়।" কাজেই মৃত্তিকা বক্ষে মৃতদেহ দাফন করাটাই মূলত যুক্তি
কথা। এর বাইরে যা কিছু আছে সবই স্বভাব ও জ্ঞানের পরিপন্থী। মরা পোড়ার
অবৈধ প্রথা কিরূপে শুরু হলো—এটা এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। সুতরাং এ প্রস
কোন বুযুর্গ বলেছেন ঃ দৃশ্যত মনে হয় এ মতবাদে বিশ্বাসীদের প্রাচীন ইতিহা
তাদের অবতার ও দেবতাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও জীবনাচরণের উপাখ্যান ব
ছিল। সম্ভবত তারা ছিল জিন জাতিভুক্ত, যাদের শরীয়ত মানুষের শরীয়ত থেকে পৃ
ও ভিন্নতর জিনিস। কাজেই অগ্নি প্রধান উপাদানে সৃষ্ট জিন দেহের স্বাভাবিক ও স
দাবি এই ছিল যে, মৃত্যুর পর তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে আপন সত্তা তথা অন
মিশিয়ে দেয়া। এ জাতীয় অজ্ঞতা থেকে আল্লাহ পাক রক্ষা করুন! পরবর্তীতে
প্রথাকেই পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সুন্নত মনে করে নিজেরাও তারা এর ওপর আমল কর
শুরু করে। কবির ভাষায় ঃ

چوں ندید ند حقیقت رہ افسانہ زدند

(অর্থাৎ মানুষ যখন সত্য পথ ভুলে যায় তখন মনগড়া অলীক কাহিনী গড়তে থাকে
এ কথা যদিও ইতিহাস সমর্থিত নয় কিন্তু এর প্রতি আনুষঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের সম
ও ইঙ্গিত রয়েছে। —রূহুল আজ্জ ওয়াসসাজ্জ, পৃ. ১

# দ্বিতীয় ভাগ

# রাফেযীদের বিভিন্ন সংশয়, সন্দেহ ও অভিযোগের ইসলামসম্মত সমাধান

# আশরাফুল জওয়াব

## প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ

## রাফেযীদের বিভিন্ন সংশয়, সন্দেহ ও অভিযোগের ইসলামসম্মত সমাধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**প্রশ্ন ঃ ১. অন্তিমকালে মহানবী (সা)-এর দোয়াত-কলম চাওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা)-এর মন্তব্য—'এর কি প্রয়োজন।'**

উত্তর ঃ (এক) এ অভিযোগ মূলত হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে নয় বরং এর দ্বারা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর ওপর সত্য গোপন রাখার অভিযোগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, বাস্তবে তাঁর ওপর এ জাতীয় কোন নির্দেশ যদি থেকেই থাকে, তবে তা তিনি প্রকাশ করলেন না কেন ? অথচ আল্লাহ্‌র হুকুম প্রচার করা তাঁর ওপর ফরয ছিল। এর পরও যেহেতু আরো কয়েকদিন তিনি জীবিত ছিলেন, কাজেই কোন কারণে সে মুহূর্তে দোয়াত-কলম যোগাড় করা যদি সম্ভব নাও হয়, অন্য সময় সংগ্রহ করে তা লিখিয়ে দেয়াতে তাঁর তেমন অসুবিধে তো থাকার কথা নয়। কেননা এ ঘটনা বৃহস্পতিবারের অথচ তাঁর ইন্‌তিকাল হয়েছে পরের সোমবার। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা)-এর প্রতি নতুন কোন নির্দেশ ছিল না, বরং এটা ছিল পূর্বোক্ত কোন হুকুমেরই তাকীদপূর্ণ পুনরুক্তি মাত্র।

(দুই) হযরত উমর (রা) যেহেতু আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাই মহানবী (সা)-কে এই মুহূর্তে কষ্ট দেয়াটা তিনি সমীচীন মনে করেন নি। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। যেমন চিকিৎসক কোন রোগীকে প্রথমে মৌখিক ব্যবস্থা বলে দিল। অতঃপর সদয় হয়ে তাকে বলল, দোয়াত-কলম নিয়ে এসো লিখে দেই। কিন্তু এতে চিকিৎসকের কষ্ট বিবেচনা করে রোগী নিজেই বলল ঃ থাক, কি প্রয়োজন, এ সময় আপনাকে কষ্ট দেয়া ঠিক নয়।

এ অভিযোগের একটা পাল্টা জবাব এও হতে পারে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে হযরত আলী (রা) চুক্তিপত্রে লিখেছিলেন—

هذا ما قضى عليه محمد رسول الله

—"এটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিনামা।" এতে প্রতিপক্ষ কাফের প্রতিনিধি আপত্তি তুলল যে, "মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ" লিখুন। কেননা বিবাদের মূল তো এখানেই। আমরা যদি তাঁর রেসালতই স্বীকার করে নিলাম তাহলে ঝগড়া কিসের ? নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন ঃ এ অংশটুকু কেটে দাও। তিনি অস্বীকার করলেন। সুতরাং এ জাতীয় বিরোধিতা তো এখানেও লক্ষ করা যায়, যেমনটি করেছিলেন উমর (রা)। অতঃপর তিনি [মাওঃ থানবী (র)] বললেন ঃ তর্কের খাতিরে তখন যদিও বলে দিয়েছি নতুবা এ ধরনের পাল্টা জবাব আমার মনঃপূত নয়। —মুজাদালাতে মা'দিলাত, প্রথম খণ্ড, দাওয়াতে আবদিয়ত, পৃ. ২৩৩

**প্রশ্ন ঃ ২. 'হযরত আলী (রা)-কেই প্রথম খলিফা নির্বাচন করা উচিত ছিল' —এ সন্দেহের অবসান।**

উত্তর ঃ (এক). আমাদের কোন কোন সরলমনা বন্ধু তর্ক জুড়ে দেয় যে, আলী (রা)-কে উপেক্ষা করে শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) নিজেরাই খলিফার পদ দখল করে নিয়েছিলেন। আমি বলতে চাই এর জন্য শায়খাইনের উদ্দেশ্যে দু'আ করুন। কেননা প্রথম থেকেই যদি হযরত আলী (রা)-কে খিলাফতের গুরু দায়িত্বে বসিয়ে দেয়া হতো আর সুদীর্ঘকাল তিনি খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন, তাহলে এটা ছিল তাঁর দুর্ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ারই নামান্তর, যা সহ্য করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। আর পার্থিব স্বার্থের মোহে নয়, বরং দীনের খাতিরে তাঁদের কষ্ট-বিড়ম্বনা সর্বজনবিদিত। তাই দয়াপরবশ হয়ে তাঁরা নিজেরা সে বিড়ম্বনার অংশ ভাগ করে নিয়েছেন তবু হযরত আলী (রা)-কে বিপদের কবলে ঠেলে দেননি। অবশ্য সাহাবীগণের পারস্পরিক মনোমালিন্য বেশির ভাগই ভ্রান্তিপূর্ণ প্রচারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত পারস্পরিক ভালবাসা ও মিল-মহব্বতের ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর মনোমালিন্য হয়েই থাকে। মাওলানা গাংগুহী (র) পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু এমন দুজন খাদেমকে একবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের দু-জনের মধ্যে কখনো কলহ-বিবাদও কি হয়ে থাকে ? তারা আরয করল—হুযূর! সময় সময় এমনটি হয়ে থাকে বটে, কিন্তু পরে মিটমাট হয়ে আবার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। এ সম্পর্কে কবি যওক বলেন ঃ

بے محبت نہی ائے زوق شکایت کے مزے

بے شکایت نہی ائے زوق محبت کے مزے

—হে যওক! প্রীতির বন্ধন ব্যতীত অভিযোগের স্বাদ মিলে না আর অভিযোগ ছাড়া প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায় না।

জনৈক আরব পণ্ডিত লেখেন ঃ

ويبقى الود ما يبقى العتاب

—"প্রীতির বন্ধন ততক্ষণই অটুট থাকে অভিযোগ যে পর্যন্ত স্থায়ী হয়।" এর কারণ হলো—অন্তরে মনোমালিন্য ও কালিমা না থাকা পর্যন্তই ভালবাসা টিকে থাকে। বন্ধুর বিরুদ্ধে অনুযোগ থাকলে প্রকাশ না করে মনে মনে তা পোষণ করতে থাকাতে আজীবন মনের কালিমা দূর হওয়ার উপায় থাকে না। তাই মনের বহিঃভাব প্রকাশ করার মাধ্যমেই কেবল অন্তরে নির্মলতা অর্জন সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা)-এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। সময় সময় তিনি অভিমান করে বসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন ঃ তোমার খুশি কিংবা অসন্তুষ্টি আমি লক্ষণেই ধরতে পারি। অসন্তুষ্টিকালে কসমের মধ্যে তুমি বলে থাক لا و رب ابراهيم (না, ইবরাহীমের রবের কসম) আর খুশির সময় তোমার মন্তব্য হয় لا و رب محمد (না, মুহাম্মদের রবের কসম)। হযরত আয়েশা (রা) নিবেদন করলেন ঃ هل اهجر الا اسمك (তখন আপনার নামটাই কেবল মুখে আনি না, নতুবা অন্তরে তো একমাত্র আপনার কথাই বিরাজমান)। সুতরাং তাঁদের পরস্পর কোন কথা কাটাকাটি যদি হয়েও থাকে তবে সেটা তাঁদের পারস্পরিক মান-অভিমানের ব্যাপার, তাতে আপত্তি তোলা আমাদের মুখে শোভা পায় না। কানপুরস্থ জনৈক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করত। ঘটনাচক্রে তার সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি একই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করলেন। স্বীয় মতের স্বপক্ষে ঃ من سب اصحابى فقد سبنى ومن سبنى فقد سب الله (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দিল সে আমাকেই গালি দিল। আর যে ব্যক্তি আমাকে গালি দেয় প্রকারান্তরে তা আল্লাহ্কে গালি দেওয়ারই শামিল) হাদীস উদ্ধৃত করে বললেন ঃ মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলী (রা) সম্পর্কে অশোভন উক্তি করতেন। কাজেই তিনি এ হাদীসের আওতায় এসে যান। আমি বললাম ঃ জনাব! আপনি চিন্তা করেন নি যে, হাদীসের যে অর্থ আপনি অনুধাবন করেছেন আসলে সেটা ঠিক নয়। বরং হাদীসের মর্ম ভিন্ন রকম। উক্ত হাদীসের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে আপনাকে বাকরীতির সাথে পরিচিত হতে হবে। কেউ যদি বলে—যে ব্যক্তি আমার ছেলের প্রতি

চোখ তুলে তাকাবে তার চোখ আমি উপড়িয়ে ফেলবো। এখন বলুন—এ ধমকী কার বিরুদ্ধে ? নিজের অন্যান্য সন্তানের ওপরও কি এটা বর্তাবে যে, তারা পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হলে তাদের সাথেও এহেন আচরণ করা হবে নাকি অনাত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ?

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ হুমকি পরের বেলায়। সুতরাং হাদীসের মর্মও তাই যে, কোন অসাহাবী আমার কোন সাহাবী সম্পর্কে এ জাতীয় মন্দোক্তি উচ্চারণ করলে তার সাথে এ আচরণ করা হবে। —ফাযায়েলুল খাশিয়া, পৃষ্ঠা ৩৬

(দুই) আমি কসম করে বলতে পারি, আলী (রা)-এর অন্তরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি শায়খাইনের কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করবেন যে, তাঁকে বরং বিপদ থেকে উদ্ধারই করা হয়েছে। কেননা সাহাবীগণের খিলাফত আওধ—রাজদের রাজত্ব ছিল না যে, দিন-রাত আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দেবেন। তাঁদের খিলাফতের চরিত্র তো এই ছিল যে, প্রচণ্ড গরমে লু-হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এমনি এক দুপুরে খলিফা উমর (রা) একা মরুপ্রান্তরে রওয়ানা হন। দূর থেকে লক্ষ করে উসমান (রা) চিনে ফেলেন যে, তিনি খলিফা উমর (রা)। তাঁর বাসভবনের নিকটবর্তী পৌঁছলে আওয়াজ দিলেন—আমীরুল মু'মিনীন! এই প্রচণ্ড গরম ও মরুর লু'য়ের তীব্র দাবদাহে যাচ্ছেন কোথায় ? তিনি বললেন ঃ বাইতুলমালের উট হারিয়ে গেছে তারই খোঁজে। উসমান (রা) বললেন ঃ কোন খাদেমকে পাঠিয়ে দিলেই হতো। খলিফা উমর (রা) উত্তরে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রশ্ন তো করা হবে আমাকে, খাদেমকে নয়। হযরত উসমান (রা) আরয করলেন ঃ তাহলে একটু অপেক্ষা করে যান, তাপের মাত্রা কমে আসুক। জবাবে হযরত উমর (রা) نار جهنم اشد حرا —"জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও প্রচণ্ড"—উক্তি করে সেই তীব্র রোদ ও লু-হাওয়া উপেক্ষা করে ময়দানে বেরিয়ে পড়লেন। এই ছিল তাঁদের রাজত্ব ও খিলাফতের নমুনা।

হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে একবার খুতবা দিচ্ছেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ اسمعوا واطيعوا (অর্থাৎ তোমরা শোন এবং আনুগত্য কর)। শ্রোতাদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ لا نسمع ولا نطيع (আমরা শুনবও না, আনুগত্যও করব না)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন ? প্রশ্নকর্তা জবাবে বললেন গনীমতের মাল বণ্টনসূত্রে আমাদের সবার ভাগে পড়ল মাত্র একখণ্ড বস্ত্র, কিন্তু আপনার পরনে দেখছি দুই খণ্ড। কোথায় পেলেন, জবাব চাই। উমর (রা) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। হে আবদুল্লাহ! তুমিই এর জবাব দাও। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ নামায পড়াবার উপযোগী কোন কাপড় আজ আমীরুল

মু'মিনীনের ছিল না। তাই আমার ভাগের টুকরাটা ধারস্বরূপ তাঁকে আমি দিয়েছি। এভাবে তাঁর দুই খণ্ড বস্ত্র হয়। এর একটিকে তিনি লুঙ্গী বানিয়েছেন অপরটিকে চাদর। উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তার চোখে পানি এসে যায়। বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, এখন আপনি খুতবা দিন, আমরা শুনব এবং আনুগত্য করব। এই ছিল তাঁদের শাসনের নমুনা। প্রজাদের যে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাসীন খলিফার ওপর আপত্তি উত্থাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। অতএব এহেন অবস্থায় খিলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা কোন সুখের উপাদান নয়, যা কামনা করা যেতে পারে। আল্লাহ্র কসম! এর চেয়ে বিপদের জিনিস দ্বিতীয়টি হতে পারে না। কাজেই সে খিলাফত পাননি বলে হযরত আলী (রা) আদৌ মনোক্ষুণ্ন হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত যদি স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, খিলাফত বড়ই সুখের বস্তু, তাহলে এটাকে সে ব্যক্তি প্রত্যাশা করুক যার অন্তরে পার্থিব মোহ ও লালসা বিদ্যমান। তবে কি نعوذ بالله (আল্লাহ্ না করুন) তারা হযরত আলী (রা)-কে দুনিয়াদার সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে, খিলাফত না পেয়ে তিনি হয়তো মনোক্ষুণ্ন হয়ে থাকবেন। ধন্য হোক তাদের এ কল্পনা-বিলাস। কিন্তু এ পর্যায়ে আমাদের বিশ্বাস তো এই যে, হযরত আলী (রা)-এর অন্তরে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব বা কামনা আদৌ ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন تعلق مع الله (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক) সম্পদে সম্পদশালী—যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হলো ঃ

آں کس که تراشناخت جاں را چه کند
فرزند و عیال و خانماں را چه کند

—যে লোক তোমার পরিচয়ে ধন্য হয়েছে নিজের প্রাণ, সন্তান, পরিজন ও বাড়ি-ঘরে তার কি প্রয়োজন ?

কাজেই খিলাফত তিনি দেরীতে পেলেন কি আদৌ পেলেন না তাতে দুঃখ হতে পারে না। বরং তিনি খুশিই ছিলেন। তাই যে কাজে তিনি খুশি তাতে আপনি দুঃখ করার কে ? এটা তো বরং "ফরিয়াদি নীরব আর সাক্ষী সরব" হওয়ার তুল্য। পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা ও মূল্যহীনতা ঘোষণা করে কুরআনে বলা হয়েছে—"সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের রকমারি চাকচিক্য বিশেষ।" (মুযাহিরুল আ'মাল, পৃষ্ঠা ১৯)

(তিন) কোন এক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় لحمك لحمي و دمك دمي অর্থাৎ তুমি-আমি রক্ত মাংসে এক ও অভিন্ন হাদীস দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর ধারাবাহিক খিলাফত প্রমাণের প্রচেষ্টা চালায়। উক্ত হাদীস বলে তাদের যুক্তি হলো—হযরত আলী (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যেহেতু অভিন্ন সত্তায় অস্তিত্ববান কাজেই আলী (রা)-এর

বর্তমানে অপর কেউ খিলাফতের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। এর প্রথম জবাব তো এই যে, আলোচ্য হাদীস প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত আমি বলব, যদি একাত্মতা ও অভিন্ন সত্তার মূল অর্থই স্বীকৃত হয়, তবে এর দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের দাবিই নস্যাৎ হয়ে যায়। কারণ কেউ আপন সত্তার খলিফা হতে পারে না, খলিফা সর্বদা পর ব্যক্তি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় আলোচ্য হাদীসের প্রমাণ এতটুকুই কেবল যে, হযরত আবূ বকর (রা) যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলিফা ছিলেন তদ্রূপ হযরত আলীরও তিনি খলিফা। যদি তাই হয়, তবে তোমাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই! কবির ভাষায় ঃ

شادم كه از رقيبان دامن كشاں گذشتى
گومشت خاك ماهم برباد رفته باشى

(আমি অতিশয় আনন্দিত যে, আঁচল বাঁচিয়ে তুমি আমার প্রতিযোগীদের অতিক্রম করে পার হয়ে গেছ, যদিও তাতে আমার এক মুঠো মাটিও নষ্ট হয়েছে।) এর দ্বারা প্রতিপক্ষের দলীল তো বাতিল হলো।

অন্যান্য আলিম এর অপর এক জবাবে বলেছেন ঃ হযরত আলী (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যদি অভিন্ন সত্তার অধিকারী হন, তাহলে হযরত ফাতেমা (রা)-এর সাথে আলী (রা)-এর বিয়ে সিদ্ধ হয় কিরূপে ? আল্লাহ্ না করুন, এটা তো তাহলে হযরত হাসানাইনের (হাসান ও হুসাইন) প্রতি অশ্রাব্য-অকথ্য গালি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সত্তা অর্থ মৌলিক না হয়ে যদি রূপক ধরা হয়—যেমন সূফী সম্প্রদায় এ অর্থেই মহানবী (সা)-কে "আইনে হক" বলে থাকেন—তাহলে এটা আলী (রা)-এর কোন বৈশিষ্ট্য নয়। এহেন রূপক অর্থে প্রত্যেক সাহাবীই "আইনে রাসূল" ছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁদেরই রূহানী সম্পর্ক ছিল, এ হিসেবে কেউই পর ছিলেন না। —ইরযাউল হক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২

**প্রশ্ন ঃ ৩. পবিত্র স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।**

মহানবী (সা) দু'আ করেছেন ঃ

اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا অর্থাৎ হে আল্লাহ! প্রয়োজন অনুপাতে মুহাম্মদ-পরিবারের রিযিক দান কর। قدر قوت বলা হয়, যদ্দারা অভাব পূরণ হয় আর উদ্বৃত্ত কিছুই না থাকে। পবিত্র বিবিগণ নবী-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এটা নিশ্চিত। কাজেই তাঁরাও উক্ত দু'আয় শামিল ছিলেন। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততিও এর অন্তর্ভুক্ত। আভিধানিক অর্থে বিবিগণ মুহাম্মদ-পরিবারের মূল সদস্য আর সন্তানগণ আনুষঙ্গিক।

কেননা আল্ বলা হয় পরিবার-পরিজনকে। আর স্ত্রীগণ সবার আগে এ অর্থের পর্যায়ভুক্ত। তাই এ সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না যে, সন্তানরা তো 'আলের' অন্তর্ভুক্ত আর স্ত্রীগণ বহির্ভূত। অপর এক হাদীস দৃষ্টে কারো কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, উম্মুল মু'মিনীনগণ আহ্‌লে শামিল নন। হাদীসটি হলো ঃ মহানবী (সা) একবার হযরত আলী, ফাতিমা ও হাসান-হুসাইন (রা) প্রমুখকে স্বীয় 'আবায়' আচ্ছাদিত করে বললেন ঃ اللهم هؤلاء اهل بيتى হে আল্লাহ! এরাই আমার "আহ্‌লে বাইত" তথা পরিবার-পরিজন। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি (!) এ হাদীসের অর্থ করেছেন—নবীপত্নীগণ আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন। অথচ হাদীসের সঠিক মর্ম হলো—হে আল্লাহ! এরাও আমার পরিবারের সদস্যভুক্ত, এদেরকেও انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرا (হে, আহ্‌লে বাইত! আল্লাহ্ কলুষমুক্ত করে তোমাদেরকে নির্মল-নিষ্কলুষ রাখতে আগ্রহী) আয়াতোক্ত ফযীলত ও মর্যাদায় শামিল করা হোক। এখানে সীমিতকরণ উদ্দেশ্য নয় যে, এরাই কেবল আহ্‌লে বাইত, স্ত্রীগণ এর বাইরে। অধিকন্তু আলোচ্য হাদীসের কোন কোন সূত্রে বর্ণিত আছে—মহানবী (সা) তাঁদেরকে স্বীয় আবায় আচ্ছাদিত করে উক্ত দু'আ করার সময় উম্মে সালমা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এতে তিনি বললেন, তুমি স্বস্থানেই রয়েছ। এর অর্থ হলো এই যে, তোমাকে আবায় শামিল করার প্রয়োজন নেই, পূর্ব থেকেই তুমি আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত আলী (রা) ছিলেন উম্মে সালমা (রা)-এর জন্য পর-পুরুষ। তাই তাঁর উপস্থিতিতে উম্মে সালমা (রা)-কে আ'বার আচ্ছাদনভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। এটা তো হলো অভিযোগ ভিত্তিক জবাব। নতুবা দাবির সপক্ষে অভিধানগত দলীলই যথেষ্ট যে, আলে মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে বিবিগণ প্রথমেই শামিল রয়েছেন। দ্বিতীয়ত পবিত্র কুরআনের বাকরীতি এ ধরনেরই। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা যে, ফেরেশতা তাঁকে সন্তানের সুসংবাদ দান করলে হযরত সারা এতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যান। এমতাবস্থায় কুরআনে ফেরেশতার মন্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

—ফেরেশতাগণ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত শুনে তুমি অবাক হয়ে গেলে কি ? অথচ হে আহ্‌লে বাইত! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বরকত তোমাদের ওপর রয়েছে, তিনি অতি প্রশংসিত, মর্যাদাশীল।

বলা বাহুল্য, হযরত সারাও এখানে আহ্‌লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়ই। যেহেতু

সম্বোধন তাঁরই প্রতি। সুতরাং বোঝা গেল পবিত্র বিবিগণও যে আহ্‌লে বাইতের পর্যায়ভুক্ত তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। —আন্ নিস্‌ওয়ান-ফী-রামাযান, পৃষ্ঠা ৪

**প্রশ্ন ঃ ৪. "কোন কোন জ্ঞান সীনা-ব-সীনা চলে আসছে" এ সন্দেহের অবসান।**

উত্তর ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بشئ دون الناس قال لا اله الا فهما اوتيه الرجل فى القرآن او ما فى هذه الصحيفة –

—হযরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, মহানবী (সা) অন্য লোকদের বাদ দিয়ে আপনাকে তথা আহ্‌লে বাইতকে একক ও বিশেষ কোন কথা বলেছেন কি? তিনি বললেন, না, তবে এতটুকু যে, আল্লাহ্ কুরআনের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান হয়তো কাউকে দান করে থাকেন (তখন সে ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যায়) অথবা এই সহীফায় উল্লিখিত বিষয় কয়টি।

অতঃপর উক্ত লিপি খুলে দেখা গেল তাতে দিয়াত বা রক্তপণ সম্পর্কিত কয়েকটি নির্দেশ বর্ণিত রয়েছে। যা কেবল হযরত আলী (রা)-এরই একক জ্ঞাত বিষয় ছিল না; বরং অন্য সাহাবীগণও এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। বস্তুত হযরত আলী (রা)-এর এ জবাবের উদ্দেশ্য ছিল—বিশেষ কোন জ্ঞান আপন সত্তায় গণ্ডিভূত জনিত সাধারণ বিশ্বাসের অস্বীকৃতি। তাতে এটাও বোঝা গেল যে, ব্যক্তিভেদে জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্য হওয়া সম্ভব। যার ফলে এক ব্যক্তি কুরআনের এমন সব জ্ঞানের অধিকারী হয় যা থেকে অন্যরা বঞ্চিত থাকে। কুরআনের সাথে হযরত আলী (রা)-এর গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে অন্যদের তুলনায় তিনি অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যে কারণে কারো কারো মনে সন্দেহ জাগে এবং সর্ব সাধারণ্যে প্রচারিত হয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবত হযরত আলী (রা)-কে এককভাবে বিশেষ কোন তত্ত্ব শিখিয়ে গেছেন। তখন থেকেই এ অভিনব ধারণা সৃষ্টি হয় যে, "কোন কোন জ্ঞান বক্ষাশ্রয়ী", সিনা থেকে সিনায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। মূলত এ বিশ্বাস কুরআন-হাদীস ভিত্তিক নয়; বরং এটা 'সাবাই' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবার আবিষ্কার। যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মূলোৎপাটন করা। কারণ আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ছিল মূলে ইয়াহুদ বংশজাত। পরে সে মুসলমান হয় কপটতার আশ্রয়ে। অতঃপর হযরত আলী (রা)-এর প্রতি গভীর ভক্তি-অনুরক্তির অন্তরালে সে মুসলিম সমাজে মিথ্যা আকীদার বিষ ছড়াতে থাকে। যেহেতু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, অস্ত্রবলে ইসলামের বিনাশ সাধন

সম্ভব নয়, তাই তারা ইসলামী বিধি-বিধানে ভ্রান্তির সংমিশ্রণের কৌশল অবলম্বন করে। আর এর জন্য উপায় আবিষ্কার করল যে, কোন কোন জ্ঞান অন্তরাশ্রয়ী। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ –

—"কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী।" আল্লাহ স্বয়ং যেহেতু দীনের হিফাযতকারী, তাই ইসলামী-বিধিবিধানে কোনরূপ মিশ্রণ আসতে পারে না। অতীতে যদিও বহু পথভ্রষ্ট ফিরকা জন্ম নিয়েছে এবং বর্তমানেও এর কমতি নেই। যাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে—আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফিরকায়। উক্ত ৭৩ সংখ্যা তো মূলনীতির হিসেবে, নতুবা প্রত্যেক ফিরকার আবার রয়েছে বহু শাখা-প্রশাখা। এমনকি আজকাল প্রত্যেকেই এক একটি নির্দিষ্ট ফিরকায় পর্যবসিত। কেননা দীনের ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মত পোষণ করে থাকে। অবশ্য এর পিছনেও রহস্য আছে যে, এ ফিরকাবন্দীর কারণে কেউ যেন বিচলিত না হয়। কারণ মতবিরোধ হওয়াটা অনিবার্য, যে কোন প্রকারে এর প্রকাশ ঘটবেই। রহস্যপূর্ণ এ জগত এমনটি হতে পারে না যে, কোন বিষয় বিরোধমুক্ত থাকবে। এখন মাঝেমধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সত্যান্বেষীর মনে স্বভাবতই সন্দেহ জাগত যে, জানি না এদের মধ্যে কোন্ দল যে সত্যাশ্রয়ী। কিন্তু নিত্য দিন নতুন নতুন ফিরকার উদ্ভব হওয়ার ফলে এর দুষ্ট প্রভাব কমে আসা স্বাভাবিক। মনে মনে তারা ভাবে—বাস্তবে দেখা যায় মতবিরোধের কোন সীমা সংখ্যা নেই, যা দৈনিকের ডাল-ভাত তুল্য। কথায় কথায় কত আর সন্ধান লওয়া যায়। সুতরাং আমাদের জন্য প্রাচীন পন্থাই নিরাপদ। মোটকথা, এ ধারণা নিতান্ত ভুল যে, কোন কোন জ্ঞান অন্তরাশ্রয়ী। অবশ্য এটা ঠিক যে, এমন জ্ঞানও রয়েছে যা অর্জন করতে উচ্চতর মেধার প্রয়োজন, মধ্যম কিংবা নিম্নতর মেধা যথেষ্ট নয়। —আল-ইরতিয়াব, পৃষ্ঠা ৪

এ সম্পর্কে কেউ কেউ সূফী সম্প্রদায়কে কলংকিত করে থাকে যে, তাদের মতবাদেও অন্তরাশ্রয়ী বিশেষ জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। মূলত কুরআন ও হাদীসই তাঁদের জ্ঞানের উৎস। অবশ্য অন্তরাশ্রয়ী বলতে তাদের কাছে যা আছে সেটা হলো—আধ্যাত্মিক পথ এবং এর সাথে সম্পর্ক, যা প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে হাসিল হয়। এমনকি সুতারী ও বাবুর্চিগিরিতেও কাজের সাথে সম্পর্ক এবং দক্ষতা বলতে যা বোঝায় সেটা গভীর মনোনিবেশ আর অন্তরের আকর্ষণেরই ফল। এরই নাম অন্তরাশ্রয়ী জ্ঞান। আর এ জ্ঞান কেবল ওস্তাদের

সান্নিধ্যেই অর্জিত হতে পারে, কেবল পুস্তক পাঠ কিংবা মৌখিক নির্দেশে অর্জন করা সম্ভব নয়। সকল প্রকার পাক প্রণালী নির্দেশক "খানে নে'আমত" নামে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এখন এটা পড়েই কি কেউ দক্ষ বাবুর্চি হতে পারে ? আদৌ না। কোন দক্ষ বাবুর্চির সাহচর্যের আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ব্যতীত এটুকুর জ্ঞান অর্জন করাও সম্ভব নয়। তাও আবার এক দু'বার দেখায় চলবে না বরং বারবার দেখতে হবে, শিখতে হবে। সুতরাং এক মহিলা গুলগুলা তৈরিকালে স্বামী এসে বলল ঃ তুমি অমুক কাজটি সেরে আস, গুলগুলা আমি বানাব। স্ত্রী বলল ঃ এটা তোমার কাজ নয়। স্বামী বলল, বলে কি, এটা আবার একটা কাজ হলো, এভাবে দিলাম আর বানিয়ে ফেললাম। ব্যস, হয়ে গেল। স্ত্রী বলল—বেশ, এখনই দেখা যাবে। অতএব স্বামী বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে উত্তপ্ত ঘিয়ে গুলগুলা ঢেলে দিল। আর গরম ঘিয়ের ছিটা পড়ে শরীর পুড়ে গেল। স্ত্রী এসে বলল—বলেছিলাম না, এটা তোমার কাজ নয়। স্বামী মনে করেছিল, এটা আবার একটা কঠিন কাজ হলো, চুলায় দিলাম আর হয়ে গেল। তদ্রূপ গংগুহের এক অতিভোজী পীর বলত, আহার করা এমন কি কঠিন কাজ, মুখে পুরে দাও আর গিলে ফেল, পথচলা আবার কঠিন হলো ? পা উঠাও আর ফেল, ব্যস হয়ে গেল। সে বেচারা দৈনিক অধিক ভোজন আর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করত। কিন্তু এ দু'টি শব্দ দ্বারাই কি কাজ হয় ? আপনি একবার করেই দেখুন না, তখন বুঝে আসবে। একইভাবে এক-দু'বার দেখেই মিস্ত্রীর কাজ করা যায় না। সুতারকে দেখে বানর মিস্ত্রীর কাজ করতে চেয়েছিল। পরিণাম কি হয়েছিল ? তাই বলা হয়—کار بوزینه نیست نجاری—বানরের কাজ মিস্ত্রীগিরি করা নয়।

মোটকথা, সূফীবাদে অন্তরাশ্রয়ী বলতে যা আছে তা হলো, অধ্যাত্ম জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক ও পারদর্শিতা। অপরটি হলো, বরকত, দিব্য চোখের দর্শন ব্যতীত যা অনুভব করা যায় না। যেমন নাবালেগ ছেলে সংগমস্বাদ উপভোগ করতে পারে না। একবার ঘটনা হলো—কয়েকজন সখী মিলিত হয়ে পরস্পর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় যে, বিয়ের স্বাদ না জানি কেমন। একজন বলল, আমার বিয়ে হোক তখন বলব। তার বিয়ে হলে সখীরা চেপে ধরল, এখন বল। সে জবাব দিল, বিয়ে এমনই জিনিস যা তোমার হলে পরে বুঝে আসবে। মোটকথা, অন্তর্লোকের বিষয়কে প্রকাশ করা যায় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারাই কেবল সেটি অনুভব করা চলে। অনুরূপভাবে বরকতও কেবল প্রত্যক্ষ দর্শনের আশ্রয়েই অনুভবযোগ্য। অতএব যারা ধারণা পোষণ করে যে, হযরত আলী (রা) বিশেষ কোন গোপন বাণী অথবা অন্তরাশ্রয়ী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তারা মূলত শরীয়তের বিধি-বিধানে ভ্রান্তিজালের মিশ্রণ প্রয়াসী। হযরত আলী (রা)

নিজেই এ ধারণা বাতিল ঘোষণা করে বলেছেন ঃ হ্যাঁ, অন্তরাশ্রয়ী জ্ঞান থাকতে পারে, সেটা হলো—কারো পক্ষে কুরআনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। কুরআন দ্বারা এখানে খোদায়ী শরীয়ত সম্পূর্ণটাই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল ঃ কিতাবুল্লার নির্দেশানুযায়ী আমাদের মামলা নিষ্পত্তি করে দিন। অতঃপর তিনি মহিলাকে 'রজম' আর পুরুষকে একশ দোররা এবং দেশান্তরের হুকুম দিলেন। অথচ কুরআনে রজমের হুকুম নেই। কাজেই কিতাবুল্লাহ দ্বারা এখানে ইসলামী শরীয়ত উদ্দেশ্য। কেননা আংশিক কিংবা সামগ্রিক সর্বাবস্থায় শরীয়তের বিধানাবলী কিতাবুল্লার সাথেই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইবনে মাসউদ (রা) হাদীসের কোন কোন বিধানকে কুরআন নির্দেশিত আখ্যা দিয়ে— مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (অর্থাৎ রাসূল যা নির্দেশ করেন তাকে আঁকড়ে ধর আর যা নিষেধ করেন তা থেকে নিবৃত্ত থাক) আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। এরি নাম মার্জিত ও পরিশীলিত অনুভূতি, ব্যক্তি ভেদে যার তারতম্য ঘটে থাকে। এক ব্যক্তির হাদীস জানা আছে কিন্তু এ দ্বারা কি কি মাসআলা উদ্ভাবিত হতে পারে সে অনুভূতি তার না-ও থাকতে পারে। সুতরাং কুফার জনৈক খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে। উক্ত মুহাদ্দিস আবূ ইউসুফ (র)-কে প্রশ্ন করেন—আপনার ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর বিরুদ্ধাচরণ কেন করলেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ মাসআলায়? মুহাদ্দিস বললেন ঃ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ফতোয়া হলো—বিক্রি করাই বাঁদীর জন্য তালাক (অর্থাৎ মনিব বিবাহিতা বাঁদী বিক্রি করে দিলেই তালাক পড়ে যাবে, স্বামীর তালাক নিষ্প্রয়োজন)। অথচ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, বিক্রি তালাকের মধ্যে গণ্য হবে না। আবূ ইউসুফ (র) বললেন ঃ আপনিই তো আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাঁদীর বিক্রয়কে তালাক সাব্যস্ত করেননি। মুহাদ্দিস বললেন ঃ আমি কবে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ আপনি আমার নিকট হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) 'বারীরা'কে খরিদ করার পর মুক্ত করে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পূর্ব স্বামীর সাথে বিয়ে অক্ষুণ্ন রাখা অথবা বাতিল করে দেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। তাই বাঁদীকে বিক্রি করাই যদি তালাক হয়, তাহ-লে অধিকার দেয়ার কি মানে? মুহাদ্দিস চিন্তা করতে লাগলেন, বললেন ঃ হে আবূ ইউসুফ! এ মাসআলা সত্যি কি উক্ত হাদীসের অন্তরালে নিহিত? বললেন—জি হ্যাঁ। মুহাদ্দিস বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আপনারা চিকিৎসক আর আমরা আতর বিক্রেতা।

বন্ধুগণ! ফকীহ্গণের বিশ্লেষণের আশ্রয়ে আমাদের পক্ষেও অনুভব করা সম্ভব হয়েছে যে, অমুক হাদীস, অমুক আয়াত থেকে এ মাসআলা উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যা ছাড়া এটা বোঝা অতীব কঠিন ব্যাপার। এরই নাম ইজতিহাদ। এ অনুধাবন ক্ষমতাকেই আলী (রা) ব্যক্ত করেছেন—الا فهما اوتيه الرجل فى القران (কিন্তু অনুভব ক্ষমতা যা কোন ব্যক্তিকে কুরআন সম্পর্কে দান করা হয়) উক্তি দ্বারা।

## বিদআতপন্থীদের জবাব

**প্রশ্ন ঃ ৫. বিদআতের পরিচয় ও এর স্বরূপ কি ?**

উত্তর ঃ (ক) বিদ'আতের এক পরিচয় হলো—কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াস—এ চার দলীলের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত নয় অথচ দীনী কাজ মনে করে তার ওপর আমল করা হয় সেটাই বিদ'আত। বিদ'আতের এ পরিচয় জানার পর উরস করা, ফাতিহা দেয়া, দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে ইসালে সওয়াবের অনুষ্ঠান পালন ইত্যাদি কোনটাই বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় অথচ দীন মনে করেই এসব আচার-অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে কি-না লক্ষ করুন। এসব ব্যাপারে খাস লোকদের আকীদা-বিশ্বাস যদিও খারাপ নয়, কিন্তু হানাফী মাযহাবে বিধান রয়েছে—শরীয়তসম্মত নয় বিশিষ্ট লোকদের এমন পছন্দনীয় আমলের প্রভাবে সাধারণের মধ্যে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির আশংকা দেখা দিলে তাদের পক্ষে সে কাজ বর্জন করা উচিত। অবশ্য যদি সে কাজ শরীয়তসম্মত হয় আর তাতে অনৈসলামী কোন বিষয় মিশ্রিত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজ এ থেকে মুক্ত করতে হবে, তাকে বর্জন করা চলবে না। যেমন—জানাযার মধ্যে অনৈসলামী কার্যকলাপ মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও এর সাথে গমন করা ও শোক প্রকাশ বর্জন করা যাবে না। কেননা জানাযার সাথী হওয়া, শোক প্রকাশ করা শরীয়তসম্মত বিধান। ইসালে সওয়াবে দু'টি বিষয় রয়েছে। (ক) সময় নির্দিষ্ট করা এবং (খ) ইসালে সওয়াব তথা সওয়াব পৌছানো। বৈধ হওয়া সত্ত্বেও প্রথমটি শরীয়তের কাম্য নয়। সময় নির্ধারণ দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এটিকে আমাদের বর্জন করতে হবে। কিন্তু গোটা জাতির আকীদায় যদি এটাকে অনিবার্যতার রূপ দেয়া না হয়, তবে সাধারণ-অসাধারণ সবাইকে এর অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে অধিকাংশের ধারণা—নির্দিষ্ট দিনে সওয়াব পৌছালে কবূল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অথচ এ বিশ্বাস শরীয়তসম্মত নয়। কাজেই এর অনুমতি কিভাবে দেয়া যাবে ? একজন আমাকে বলল, আঠার তারিখ পর্যন্ত ফাতিহা ইয়াযদহম চলতে পারে, এরপর নয়। কোন এক ওয়াযে আমি

দিলাম, যে কল্যাণ কামনায় খাদ্যের ওপর সূরা পাঠ করা হয় একই উদ্দেশ্যে কখনো টাকা কিংবা কাপড়ের ওপর পড়লেই বা অসুবিধা কি ? অথচ তা তো করা হয় না। উপরন্তু নিয়তের পরিশুদ্ধি একান্ত জরুরী। কেননা বেশির ভাগ নিয়ত এই হয় যে, আমরা তাদের প্রতি সওয়াব পৌছালে আমাদের পার্থিব উদ্দেশ্য সফল হবে।

কাজেই বন্ধুগণ! আকীদাগত ত্রুটির দিকে না তাকিয়ে এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন—কারো নিকট আপনি হাদিয়ার মিষ্টি উপস্থিত করে বললেন, ভাই সাহেব! আপনাকে আমার মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হবে। আন্দাজ করুন সে কি পরিমাণ ব্যথিত হবে। কাজেই এর দ্বারা দুনিয়াদারদের মনে ব্যথা আসতে পারলে আল্লাহ্ওয়ালাদের অন্তর অধিক দুঃখিত হবে। বিশেষত মরণের পর সূক্ষ্মতা আরো বেড়ে যায়। কেননা মানুষ তখন দেহপিঞ্জর বিমুক্ত হয়ে নিখুঁত আত্মায় পরিণত হয় এবং তার অনুভূতি শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অতএব আত্মা যখন বুঝতে পারে যে, এটা মতলবের হাদিয়া তখন কি পরিমাণ ব্যথিত হবে ? অধিকন্তু ওলী-আল্লাহগণের সাথে পার্থিব স্বার্থে মহব্বত ও সম্পর্ক স্থাপন অধিক লজ্জার ব্যাপার। বন্ধুগণ! এখন তাঁরা দুনিয়া কোথায় পাবেন ? তাঁদের নিকট পার্থিব উপকারের আশা করা স্বর্ণকারের নিকট লোহার জিনিস গড়ার কামনা কিংবা কোন চিকিৎসকের নিকট ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করে দেয়ার বায়না ধরার সমতুল্য।

বন্ধুগণ! হযরত গাউসুল আযমের সাথে আমাদের ভক্তি-ভালবাসা এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে হিদায়েতের পথনির্দেশ করেছেন। এর প্রতিদানে সামান্য সওয়াব রিসানী দ্বারা তাঁদের আত্মাকে খুশি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ফলে আল্লাহ্ও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আমার এ বক্তব্যে আশা করি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আমরা ইসালে সাওয়াব থেকে নিষেধ করি না বরং এর অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করি মাত্র। যেদিন জনগণের আকীদা-বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করেছে মনে করব সেদিন থেকে এ নিষেধবাক্য উচ্চারণ থেকে আমরাও বিরত থাকব। কিন্তু এটা না হওয়া পর্যন্ত একে না-জায়েয আমাদের বলতেই হবে । রইল দুর্নামের কথা—আল-হামদুলিল্লাহ দীনের প্রচারকল্পে এর কোন পরোয়াই আমরা করি না। এ ব্যাপারে আমাদের নীতি বা মাযহাব হলো ঃ

ساقیا بر خیز ودر ده جام را

خاك بر سر كن غم ایام را

گرچه بد نامیست نزد عاقلاں

مانمی خواهیم ننگ و نام را

—হে সাকী! ওঠ মদিরাপাত্র পরিবেশন কর, কুসংস্কারের ভয়ের মুখে ছিটিয়ে দাও ধূলির গুঁড়া। মানুষের নিকট এটা যদিও দুর্নামের বিষয়, কিন্তু সুনাম বা কুনাম কোনটারই আমরা পরোয়া করি না। —তাক্‌বীমুয্‌যায়গ, পৃষ্ঠা-২৯

(খ) আলোচনা চল্‌ছিল বিদ'আতের বৈধতা নিয়ে যে, কেউ যদি যোহরের ফরয নামায চার রাকাতের স্থলে পাঁচ রাকাত আদায় করে এমতাবস্থায় তার পাঁচ তো পাঁচ, চার রাকাতও আদায় হবে না। হয়তো সে যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে—এমন কি মন্দ কাজটা করলাম ? নামাযই তো পড়েছি, তাও এক রাকাত বেশি। কিন্তু কথা তো সেটা নয়। আসল ব্যাপার হলো, সে শরীয়তের বিধান লংঘন করেছে। যেমন দুই পয়সার ডাক টিকিটের স্থলে খামের ওপর কেউ আট আনার কোর্ট ফি সেঁটে দিলে চিঠি বিয়ারিং হয়ে যায়। এখানেও সে যুক্তি খাড়া করতে পারে, দুই পয়সার স্থলে আট আনা ব্যয় করলাম তাতেও বিয়ারিং ? কিন্তু এখানেও একই কথা, সরকারের আইনের বরখেলাফ বিপথে ব্যবহারের দরুন তার টিকিট বাতিল গণ্য হবে। একই টিকিট সে যথাস্থলে আদালতে ব্যবহার করলে কাজে আসত। উক্ত পাঁচ রাকাত তদ্রূপই মনে করুন। মজার ব্যাপার হলো, উক্ত পাঁচ রাকাত বাতিল হওয়াতে কারো দ্বিধা নেই যে, সে তো সৎ কাজই করেছে ? তাহলে বাতিল হবে কেন ? অথচ বিদ'আতের ক্ষেত্রে ব্যাপার অন্যরকম। এর অবৈধতার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হয় না।

এক ব্যক্তি বিবরণ দিল যে, মাওলানা গাংগুহী (র) "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লার" সাথে "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" বলতে নিষেধ করেছেন। সন্ধানের পর প্রকৃত ঘটনা জানা গেল যে, আযানের শেষ বাক্য মুয়ায্‌যিনের "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র" জবাবে কোন কোন অজ্ঞ লোক "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" বলে দেয়। অথচ আযানের জবাবে আযানের শব্দ উচ্চারণ করাই হাদীসের নির্দেশ। সুতরাং শেষ বাক্য—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র পর যেহেতু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলার নির্দেশ নেই এজন্য কেবল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেই জবাব শেষ করতে হবে। এই ছিল মাওলানা গাংগুহীর নিষেধের তাৎপর্য। এটাকেই এমনভাবে বিকৃতির রং চড়ানো হয়েছে যে, তিনি কালিমার মধ্যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলতে নিষেধ করেন। (আল্লাহ মাফ করুন) আযান শরীয়তের অংশ, এটা স্পষ্ট। এর মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন বিদ'আত। তদ্রূপ শরীয়তের নিষিদ্ধ অন্যান্য বিদ'আতের অবস্থা একই ধরনের, পার্থক্যের কোন কারণ থাকতে পারে না।

—মাকালাতে হিকমত, দাওয়াতে আবদিয়াত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭

(গ) বিদ'আত অবৈধ হওয়ার তাৎপর্য এখানেই, এতে গভীর চিন্তা করা হলে এর অবৈধতায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিত্যকার ঘটনাবলী লক্ষ করুন। সরকারী আইন গ্রন্থ ছাপতে গিয়ে কোন ছাপাখানা যদি শেষের দিকে একটি দফা যোগ করে দেয়, রাষ্ট্রের জন্য তা যতই কল্যাণকর হোক এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব দুনিয়ার আইন বইয়ে এক দফা যোগ করা যদি অপরাধ হয়, তবে শরীয়তের আইনে বিদ'আত নামক দফা যোগ করাটা অপরাধ হবে না কেন ? তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ গোশত খাওয়া বর্জন করলে অবশ্যই সেটা অপরাধ হবে। আল্লাহ্ওয়ালাদের কেউ কেউ ব্যাধিজনিত কারণে গোশত খাওয়া বর্জন করেছিলেন কেবল চিকিৎসাকল্পে শরীয়তের বিধান লঙঘনের দৃষ্টিতে নয়। পক্ষান্তরে অজ্ঞ-মূর্খরা দীন, ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে বিদ'আতের আশ্রয় নিয়ে থাকে। — ইহ্সানুত্ তাদবীর, পৃ. ১২

(ঘ) জানা দরকার—সর্বোত্তম যুগের পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত বিষয় দু-ধরনের। এক. যার আবিষ্কারের কারণ বা উপলক্ষ নতুন কিন্তু অন্যান্য আদিষ্ট বিষয়ের বাস্তবায়ন সেটার ওপর নির্ভরশীল। যেমন ধর্মীয় গ্রন্থাবলী রচনা ও সংকলন, মাদ্রাসা-খানকা নির্মাণ ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এ সবের প্রয়োজন তীব্র হয়ে ওঠে। কথাটা একটু বিশ্লেষণসাপেক্ষ। তা এই যে, দীনের হিফাযত করা সবার দায়িত্ব এটা জানা কথা। তাহলে বুঝুন যে, উত্তম যুগে এর জন্য পরবর্তীতে উদ্ভাবিত পন্থা ও উপায়সমূহের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। কেননা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবার জন্য নবুয়তের সাহচর্য-প্রভাবই যথেষ্ট ছিল। তাদের স্মরণশক্তি এত তীব্র ছিল যে, যা কিছু শুনতেন শিলাখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ে সে সব অংকিত হয়ে যেত। অনুভূতি ও মেধা এত উন্নতমানের ছিল যে, তাঁদেরকে সবক আকারে পাঠদানের প্রয়োজন ছিল না। সবার মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারী ও আল্লাহভীতি প্রবল ছিল। এর পরবর্তী যুগে অলসতা বেড়ে যায়, স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে ভোগবাদী ও জ্ঞানপূজারীদের প্রভাবে দীনদারী আচ্ছন্ন হতে থাকে। এমতাবস্থায় সমকালীন আলিম সমাজ ইসলাম বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় শংকিত হয়ে পড়েন। আর দীনী বিষয়াদি সামগ্রিকভাবে সংকলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকাহ্, উসূলে ফিকাহ্, আকাঈদ ইত্যাদি বিষয়ে দীনী গ্রন্থাবলী রচিত হয় এবং বিভিন্ন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। একইভাবে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাধারণের অনীহা দৃষ্টে পীর-মাশায়েখগণ খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ এ ছাড়া দীনের

হিফাযতের দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। অতএব উত্তম যুগে প্রয়োজন ছিল না বিধায় এসব উপায় ও পন্থা পরবর্তী যুগের অনিবার্য আবিষ্কার বটে, কিন্তু দীনের সংরক্ষণ এসবের উপর নির্ভরশীল। তাই এ কর্মপন্থা দৃশ্যত যদিও বিদ'আত পরিলক্ষিত হয় কিন্তু মূলত مقدمة الواجب واجب (অর্থাৎ ওয়াজিবের ভূমিকাও ওয়াজিব) নীতির প্রেক্ষাপটে এর অনিবার্যতা অনস্বীকার্য।

দুই ঃ দ্বিতীয়ত সেসব কাজ, যেগুলোর কারণ বা উপাদান পুরাতন ও প্রাচীন। যেমন প্রচলিত মিলাদ, দশমী, তীজা, চল্লিশা ইত্যাদি বিদ'আত। এগুলোর উপাদান পূর্বেই বর্তমান ছিল। যথা মিলাদ অনুষ্ঠানের কারণ ও মূল উদ্দেশ্য হলো, মহানবী (সা)-এর জন্মের দরুন আনন্দ প্রকাশ করা। এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) কিংবা সাহাবীগণ কেউই এ অনুষ্ঠান পালন করেন নি। তাহলে (আল্লাহ্ না করুন) সাহাবীগণের অনুভূতি কি এ পর্যায়ের ছিল না ? নবুয়তী যুগে এর কারণ উপস্থিত না থাকলে হয়তো একটা কথা ছিল। কিন্তু এর হেতু ও ভিত্তি মৌজুদ থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিংবা সাহাবীগণ কি কারণে একটি বারও মিলাদ অনুষ্ঠান পালন করলেন না ? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উপযুক্ত কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয়নি সে কাজ আকৃতিগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে নিশ্চিত বিদ'আত যা من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه (যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত নয় এমন বিষয় সৃষ্টি করে তা অনিবার্যরূপে পরিত্যাজ্য) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে অবশ্য বর্জনীয়। আর প্রথম প্রকার ما منه (যা শরীয়তসম্মত)-এর আওতাভুক্ত হওয়ার দরুন গ্রহণযোগ্য। বিদ'আত ও সুন্নতের পরিচয় লাভের এই হলো নীতিমালা, যদ্দ্বারা এর সকল শাখা-প্রশাখা উদ্ভাবিত হতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে আরো একটি আশ্চর্যরকম ব্যবধান রয়েছে। তা হলো, প্রথম প্রকার আলিম সমাজ কর্তৃক প্রস্তাবিত ও উদ্ভাবিত, এতে সাধারণ লোকের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিষয়ের প্রস্তাবক বিবেকহারা সাধারণ মানুষ আর এর পরিচালনায় তাদেরই থাকে মুখ্য ভূমিকা। সুতরাং মিলাদ শরীফের আবিষ্কারক ছিলেন জনৈক বাদশাহ, যিনি অনালিম সাধারণ লোক বৈ নন। উপরন্তু সাধারণ লোকরাই এতে যোগদানে অধিক মাত্রায় উৎসাহ প্রদর্শন করে।

—আস্‌সুরূর, পৃষ্ঠা ২৭

**প্রশ্ন ঃ ৬. হকপন্থীদের ওহাবী বলা বানোয়াট কথা।**

বিদ'আতীরা বলে আমরা ওহাবী। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ আজ পর্যন্ত বুঝে আসল না। কেননা ওহাবী বলা হয় ইবনে আবদুল ওহাবের সন্তান কিংবা তাঁর

অনুসারীদেরকে। ইবনে আবদুল ওহাবের জীবনী সংকলিত রয়েছে। তা পাঠ করে প্রত্যেকেই অবগতি লাভ করতে পারে যে, তিনি আমাদের অনুকরণীয় বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত নন কিংবা আমরা তাঁর উত্তরপুরুষেও শামিল নই। অবশ্য বর্তমানের গায়রে মুকাল্লিদরা এক হিসেবে ওহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারে, যেহেতু তাদের অধিকাংশ আকীদা-বিশ্বাস ইবনে আবদুল ওহাবের ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদেরকে বরং হানাফী বলাই সঙ্গত। কারণ শরীয়তের উসূল কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাতে রাসূল, ইজমায়ে উম্মাত এবং মুজতাহিদের কিয়াস এ চারটিতে সীমিত। এর বাইরে অপর কোন উৎস নেই। মুজতাহিদ আছেন অনেক। কিন্তু ইজমায়ে উম্মাতের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, এ চারটি মাযহাবের আওতামুক্ত অপর কোন মাযহাবের উপস্থিতি অবৈধ। অধিকন্তু এটাও স্থিরীকৃত যে, এ চার মাযহাবের মধ্য হতে বহুল প্রচলিত মাযহাবের অনুসরণ করাই বিধেয়। কাজেই এ উপমহাদেশে যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অধিক প্রচলিত তাই আমরা তাঁরই অনুসরণ করি। অবশ্য ওহাবী আখ্যা প্রাপ্তিতে আমরা বড় একটা বিষণ্নচিত্ত নই। কিন্তু এতটুকু বলে রাখি কিয়ামতের দিন এ মিথ্যা অপবাদের জবাব অবশ্যই দিতে হবে।

—তাক্বীমুয্ যায়গ, পৃষ্ঠা ২৯

**প্রশ্ন ঃ ৭. শায়খ আবদুল কাদের জীলানীর ফাতেহা ইয়াযদহম পালনকারীদের কর্মগত, বিশ্বাসগত ও ঐতিহাসিক ভ্রান্তি।**

বর্তমানে বহুলোক গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জীলানী (র)-এর ফাতেহা ইয়াযদহম তথা মৃত্যু দিবসে প্রথাগত অনুষ্ঠান পালনে বিশেষ তৎপর। প্রথমত لا تتخذوا قبرى عيدا (আমার কবরকে তোমরা উৎসবকেন্দ্রে পরিণত করো না) হাদীস দ্বারা এর বৈধতা বাতিল হয়ে যায়। কারণ মিলাদুন্নবীর ন্যায় এ দিনটিও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেখানে অপরিবর্তনীয় জিনিস তথা মহানবী (সা)-এর কবরকে উৎসবকেন্দ্র সাব্যস্ত করা হারাম সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল তথা বড় পীরের একাদশীকে উৎসবে পরিণত করা জায়েয হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে ? দ্বিতীয়ত এ তারিখেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে কোন ঐতিহাসিক এ কথা লিখেননি। আল্লাহ্ জানেন জনসাধারণ এগার তারিখের সন্ধান লাভ করল কোন্ কেরামতী সূত্রে। কেউ কেউ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে যে, গাউসুল আযম নিজে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফাতেহা ইয়াযদহম পালন করতেন।

প্রথমত এ রেওয়ায়েত প্রমাণিত নয়, এর প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত।

দ্বিতীয়ত যদি প্রমাণিত হয়ও তবে কি তারা গাউসুল আযমকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমকক্ষ স্বীকার করে নিচ্ছে যে, মহানবী (সা)-এর ফাতেহা বাদ দিয়ে তারা বড় পীরের ফাতেহা পালন করছে। এটা তো তাদের বিশ্বাসেরও পরিপন্থী। কেননা যদি স্বীকার করে নেয়াও হয় যে, গাউসুল আযম মহানবী (সা)-এর ফাতেহা পালন করতেন তাহলেও তাঁর পক্ষে এটা সহ্য করা সম্ভব ছিল না যে, আমার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বর্জন করে আমার একাদশী তথা মৃত্যু দিবস পালন করা হোক।

তৃতীয়ত হযরত গাউসুল আযমকে রাসূলুল্লাহ্‌র সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়ে তাঁর মিলাদের সাথে তুলনা করে বড় পীরের ফাতেহা অনুষ্ঠানের আকীদাই মূলত ভ্রান্ত ধারণা। কোথাও কোথাও বড় পীরের মিলাদও শুরু হয়ে গেছে। তিনি যেন মহানবী (সা)-এর সমকক্ষ হয়েই গেছেন। বিপদের কারণ আরো আছে। ফাতেহাপন্থীরা বিশ্বাস করে যে, একাদশীর ফাতেহা পালিত না হলে বালা-মুসিবত নাযিল হবে। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে কোন্ অঘটন না জানি ঘটিয়ে বসেন। (আল্লাহ্ মাফ করুন) তিনি যেন মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্য ওঁত পেতে বসে আছেন। অধিকন্তু ফাতেহা পালন করাকে সন্তান ও সম্পদের উন্নতির কারণ মনে করা হয়। এর দ্বারা গাউসুল আযমের সাথে স্বার্থ বিজড়িত সম্পর্কই প্রমাণিত হয়। বড় লজ্জার ব্যাপার, যে মুর্দার তিনি ত্যাগ করে গেলেন সে পার্থিব স্বার্থেই তাঁর সাথে সম্পর্ক পাতানো হচ্ছে। মোটকথা, এগার তারিখের ফাতেহার মধ্যে কর্মগত ও বিশ্বাসগত ভ্রান্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। একে বর্জন করাই উচিত। হযরত গাউসুল আযমের সাথে ভক্তি-ভালবাসার দাবিদারদের পক্ষে কুরআন পড়ে অথবা তারিখ নির্দিষ্ট না করে গরীবদেরকে খানা খাইয়ে তাঁর প্রতি সওয়াব রিসানী করাটাই হলো যথার্থ কাজ।—আল-হুবূর, পৃষ্ঠা ৩২

**প্রশ্ন ঃ ৮. হযরত আবদুল কাদের জীলানী (র) সম্পর্কে ভিত্তিহীন ঘটনা।**

একটা ঘটনা এভাবে প্রচার করা হয় যে, জনৈকা বৃদ্ধা বড় পীরের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট মৃত পুত্র জীবিত করে দেয়ার আবেদন জানায়। তিনি বললেন ঃ ছেলের হায়াতের সমাপ্তি ঘটেছে তাই জীবন দান সম্ভব নয়। কিন্তু বৃদ্ধা বারংবার অনুরোধ জানিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। তখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিবেদন করলেন ঃ উক্ত ছেলেকে জীবিত করে দেয়া হোক। উত্তর আসল, ছেলের ভাগ্যে নির্ধারিত হায়াত শেষ তাই জীবিত হতে পারে না। তিনি তখন আল্লাহ্‌কে বললেন ঃ একটু অনুগ্রহ করুন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ করে তিনি বল্‌লেন, হুযূর! তার ভাগ্যে জীবন নাই বলেই তো আপনার প্রতি অনুরোধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর ভাগ্যে জীবনের কিছু অংশ বাকি থাকলে তার জীবন দানে আপনি

নিজেই বাধ্য ছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্ মাফ করুন!) সেখান থেকে জবাব এল—কিন্তু তাকদীরের বিরুদ্ধে কাজ তো হতে পারে না। এতে গাউসুল আযম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাশফের শক্তিবলে মালাকুল মউতকে তালাশ করলেন যে তিনি কোথায় আছেন। অতঃপর লক্ষ করে দেখতে পান যে, সে দিনের মুর্দারগণের রূহসমূহ থলিতে পুরে মউতের ফেরেশতা নিয়ে যাচ্ছে। হেড কোয়ার্টারে পৌঁছার পূর্বেই তিনি তাকে বললেন ঃ ছেলের রূহ ফেরত দাও, একে নিতে পারবে না। ফেরেশতা অস্বীকার করতে থাকলেন। তিনি তাঁর হাত থেকে থলি ছিনিয়ে এনে তার মুখ খুলে দিলেন। ফলে সমস্ত রূহ ফর ফর করে উড়ে গেল আর সেদিনের সকল মুর্দা জীবন লাভ করল। গাউসুল আযম এবার আল্লাহ্কে বললেন ঃ কেমন! এখন রাযী হলেন তো ? এক মুর্দাকে জীবন দিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু আমি যখন সকল মুর্দাকে জীবিত করে দিলাম এতে কত আত্মাই না আনন্দিত হবে! তওবা, তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এ ধরনের কথা বলার দুঃসাহস থাকা অসম্ভব। মূলত এসব ঘটনা গণ্ড-মূর্খদের বানানো অলীক কাহিনী মাত্র। শুধু কি তাই ? ঘটনা বিবৃত করার পর তারা আরো বলে—গাউসুল আযম এমন কাজ করতে সক্ষম যা আল্লাহ্র পক্ষেও করা সম্ভব নয়। এহেন কুফরীর কি কোন কূল-কিনারা আছে ? এসব জাহিলরা গাউসুল আযমকে এই পর্যায়ে নিয়ে ঠেকিয়েছে। মহানবী (সা)-এর স্বভাব-চরিত্র এবং মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত না থাকলে এরা তাঁকে যে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছাতো কল্পনারও অতীত। —ফানাউন্ নুফূস ফী-রিষাইল কুদ্দূস, পৃষ্ঠা ৮

**প্রশ্ন ঃ ৯. কেউ কেউ হাদীস রচনা করেছে—মহানবী (সা) খোদার আসনে আসীন।**

কেউ কেউ মনগড়া হাদীস রচনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খোদা সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছে। সুতরাং এ জাতীয় একটা বানোয়াট হাদীস হলো— انا عـرب بلا عين (আমি আইনবিহীন আরব)। বাক্যটির শব্দরূপই নির্দেশ করে যে, এটি কোন মূ-র্খের অবসর সময়ের কীর্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইচ্ছা করলে পরিষ্কারই বলতে পারতেন انا رب (আমিই খোদা) ? তা-না করে এহেন ধাঁধার আশ্রয়ে انا عرب بلا عين বলার কি দরকার ছিল, আমাদের বুঝে আসে না। আর এ বাক্য দ্বারা তাদের দাবিই বা কি করে প্রমাণ হয় তাও বোধগম্য নয়। কেননা عرب -এর 'বা' বর্ণটি তাশদীদবিহীন। এ থেকে 'আইন' বর্ণটি বিচ্ছিন্ন করলে বাকি থাকে رب (রাবুন) যার কোন অর্থ হয় না। তাহলে এর দ্বারা তাশ্দীদযোগে رب (রাব্বুন) কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত 'আরব' নন বরং তিনি ছিলেন عربی (আরবী), তাই "আনা আরবুন" (انا عرب) বাক্য প্রয়োগ

অশুদ্ধ বচন। অথচ তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও পণ্ডিত। তাঁর বাক্য ও কথা খুঁত ধরা আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। বোকারা হাদীসের নামে বাক্য গড়ে তাও এমন বাক্য বিন্যাসের আশ্রয়ে নিম্নশ্রেণীর একজন ছাত্রও অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভুল দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মুহাদ্দিসগণ মত প্রকাশ করেছেন—শব্দগত অশুদ্ধিও জা হাদীসের নিদর্শন। অথচ আলোচ্য বাক্যে শব্দরূপের সাথে সাথে অর্থ এবং মর্ম অস্পষ্ট, অশুদ্ধ। কেননা উক্ত বাক্যের অর্থ رَبّ না হয়ে رَب হয়, যা অর্থহীন শব্দ এ কতিপয় বর্ণের সমষ্টি মাত্র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে তারা অপর একটি হাদীস বানিয়েছে— احمد بلا میم (আমি মীম ছাড়া আহমাদ)। বস্তুত এটা হাদীস নয়; বরং আহমাদ জাম (র)-এ চেতনাহীন অবস্থার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ উক্তি। ব্যাখ্যার সুযোগ না থাকলে এটা বর্জনীয় পরিত্যাগযোগ্য। কেননা কারো অচেতন অবস্থার বাক্য বা উক্তি গ্রহণযোগ্য নয় হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে আরো একটি হাদীস তারা রটনা ক থাকে যে, তিনি মহানবী (সা)-কে মদীনার কোন গলিতে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন:

رأیت ربی یطوف فی سکک المدینة -

অর্থাৎ মদীনার গলিপথে আমার খোদাকে আমি ঘোরাফিরা করতে দেখেছি একেই যদি হাদীস বলা হয় তাহলে তো প্রত্যেক সূফীই একেকজন খোদা। যেমন এক সূফী বলত—আল্লাহ্ যাকে বলা হয় আমিই সে আল্লাহ্। (নাউযুবিল্লাহ! আল্লা মাফ করুন!) এ নির্বোধরা এ জাতীয় অসংলগ্ন উক্তি দ্বারা অধ্যাত্মবাদকে (তাসাউফ কলংকিত করে ফেলেছে। ফলে ইসলাম আজ অমুসলমানদের হাসির পাত্র। এ ইংরেজ জনৈক মুসলমানকে উদ্দেশ করে বলে—তিন খোদা বলাতে আমাদের ওপ তোমাদের আপত্তি অথচ তোমাদের 'টুপী' তো (সূফী) প্রত্যেক বস্তুকেই খোদা সাব্য করে রেখেছে। সঠিক অর্থ না বোঝার দরুন এ মূর্খরা "ওয়াহ্দাতুল ওয়াজুদের (একক সত্তা) সর্বনাশ ঘটিয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পর্যন্ত তারা মানুষে উর্ধ্বে তুলে খোদার আসনে বসিয়েছে। অথচ বাস্তবের সাক্ষী হলো—মানুষেরই ন্যা তিনি চলাফেরা, খাওয়া-পরা, প্রস্রাব-পায়খানা সবই করেছেন। উহুদের ময়দা দুশমনের আঘাতে আহত হয়েছেন, ইহুদীর যাদু তাঁর ওপরও ক্রিয়া করেছে জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর স্বরূপ প্রকাশের আবেদন করলে জিবরাঈল নিজে আস রূপ জাহির করেন, তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অচেতন হয়ে পড়েন।

—তাহ্সীলুল মারাম, পৃষ্ঠা

**প্রশ্ন ঃ ১০. পশু-পাখি ইত্যাদিকে কুলক্ষণ মনে করা কুসংস্কার।**

মাওলানা থানভী (র)-কে একবার প্রশ্ন করা হয়—ঘোড়া ইত্যাদিকে অশুভ লক্ষণ মনে করা হয়, এর কোন্ ভিত্তি আছে কি ? তিনি বললেন, আদৌ না, সব কুসংস্কার। এ সম্পর্কে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি—একবার এক নিগ্রো পথে পাওয়া আয়নায় আপন চেহারা দেখে ভাবল আয়নাই খারাপ। তদ্রূপ আমাদের অবস্থা—নিজের দোষ পরের চরিত্রে লক্ষ করি। বস্তুত বিপদ তো চাপে নিজের গুনাহ্র প্রতিক্রিয়ায়। এখন এটাকে পশুর সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়—অমুক ঘোড়ার লক্ষণ সুবিধার না। অথবা অমুক প্রাণী অমুক সময় আওয়াজ দিয়েছিল তাই কাজটা ভেস্তে গেল। এ সময় একটি হাদীসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "অন্তরে কখনো অশুভ লক্ষণের ভাব সৃষ্টি হলে অমুক দোয়া পাঠ করবে।" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত এর কোন প্রভাব রয়েছে যা থেকে বাঁচার জন্য দোয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন ঃ এটা কেবল মনের বিচলিত ভাব দূর করত প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, অন্যথায় এর দ্বারা কোন প্রতিক্রিয়ার অনিবার্যতা প্রমাণ হয় না।

অতঃপর নেক ফাল তথা শুভ লক্ষণ গ্রহণের হাদীস-প্রদত্ত অনুমতি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ সেটাও কোন বাস্তব ক্রিয়াশীল নয়। নেক ফালের সারবত্তা এই যে, কোন ভাল জিনিস সামনে আসলে আল্লাহ্র প্রতি ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ্ চাহেন তো আমার কাজ সমাধা হবে। পক্ষান্তরে অন্তরে অশুভ লক্ষণ পোষণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্র প্রতি কু-ধারণা কল্পনা করা। কাজেই এটা নিষিদ্ধ আর সুধারণা অনুমোদিত। —মুজাদালাতে মা'দিলাত, দাওয়াতে আবদিয়ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪

**প্রশ্ন ঃ ১১. সূফীদের পরিভাষায় কাফির অর্থ—নশ্বর, বিলীনকারী।**

প্রশ্ন উঠেছে কুফরী বাক্য তো দূরের কথা, মিথ্যা ও কুফরীর সম্ভাবনা রয়েছে যাহেরী আলিমগণের নিকট আজো পর্যন্ত এ জাতীয় বাক্য ও মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ সূফীদের কথাবার্তায় 'কাফির' শব্দের ব্যবহার প্রায়শ লক্ষ করা যায় যা দ্বারা খোদার প্রতি বাস্তব অস্বীকৃতি প্রমাণিত ও অনিবার্য হয়ে পড়ে। জবাবে বলা হয়—জি-না, অর্থ এটা নয়। সূফীদের পরিভাষায় কাফির অর্থ—বিলীনকারী, নশ্বর। কবি খসরুর ভাষায় ঃ

کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست
هر رگ من تار گشته حاجت زنار نیست

—প্রেমানলে আপন সত্তা ও আত্মা আমি বিলিয়ে দিয়েছি, তাই আমার আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, আমার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা সূত্রবৎ, কাজেই পৈতা আমার কোন্ কাজের।

اے فانی عشقم অর্থাৎ আমার প্রেমে লীন ওহে! এ অদৃশ্য আওয়াজের মর্ম দাঁড়ায়—যথেচ্ছ আমল কর, তোমার মৃত্যু হবে নিবেদিতপ্রাণ এবং বিলিয়ে দেয়া সত্তা হিসেবে। কথাটা সে হাদীসেরই সমার্থবোধক যাতে বলা হয়েছে—

اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

—মহান আল্লাহ্ বদরী সাহাবীগণের প্রতি লক্ষ করে বলেছেন ঃ তোমরা যথেচ্ছ আমল কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

সূফীগণ এ অর্থ অভিধান থেকে গ্রহণ করেছেন। কেননা অভিধানে 'কুফর' অর্থ লুকানো, আচ্ছাদিত করা। আর ফানী ( فانى ) অর্থ আপন সত্তা গোপনকারী। বলা বাহুল্য, সূফীদের পরিভাষা কোথাও অভিধান থেকে, কোথাও প্রচলিত অর্থ থেকে, কোথাও কালাম ও দর্শনশাস্ত্র হতে আবার কখনো অন্য বিষয় থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের এ মিশ্রণের উদ্দেশ্য হলো আসল ভেদ গোপন রাখা।

কবি বলেছেন ঃ

بامدعی مگوئید اسرار عشق ومستی
بگذار تابمیرد در رنج خود پرستی

—প্রতিপক্ষের নিকট প্রেমের রহস্য উন্মোচন করবে না, ছেড়ে দাও মরে যাক সে আত্মগর্বে।

এ জন্যই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভেদ-রহস্য নিষ্প্রয়োজনে প্রকাশ্যে প্রচার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি এখন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই বর্ণনা করছি। মোটকথা, এ গায়েবী আওয়াজ ছিল সূফীদের পরিভাষার ব্যাখ্যা, সাধারণ পরিভাষার নয়। আশেক তথা প্রেমিকের সাথে কিছু সময় রসিকতার ছলে এ শিরোনাম গ্রহণ করা হয়েছে। আর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) কোন কোন সময় নির্দোষ কৌতুক করেছেন। সুতরাং জনৈকা বৃদ্ধার জান্নাত লাভের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি বললেন ঃ لا تدخل العجوز الجنة অর্থাৎ বৃদ্ধা নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধা কান্না জুড়ে দিলে انا انشأنا هن انشاء فجعلنا هن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين - [আমি তাদেরকে (নারীদেরকে) নতুন করে সৃষ্টি করব আর তাদেরকে আমি জান্নাতীদের সমবয়সী এবং

অনিন্দ্য সুন্দরীরূপে সৃষ্টি করব। অধিকন্তু তারা হবে কুমারী] আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সান্ত্বনা দান করেন। যার মর্ম হলো—বৃদ্ধা নারী বৃদ্ধাবস্থায় নয় বরং যুবতী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবূ যর গিফারী (রা) একবার একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করাতে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক বার জবাব দেন এবং শেষ বার বলেন ঃ وان رغم انف ابی ذر অর্থাৎ আবূ যরের নাক ধুলায় লুটালেও জবাব এটাই। এটাও ভর্ৎসনার সুরে কৌতুকই ছিল। কিন্তু প্রেমিক এতেই স্বাদ পায়। তাই দেখা যায় হযরত আবূ যর (রা) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন শেষে বলতেন وان رغم انف ابی ذر وان رغم انف ابی ذر (আবূ যরের নাক ধুলায় লুটালেও আবূ যরের নাক ধুলায় লুটালেও)। কেননা এতে তিনি আনন্দই লাভ করতেন। শায়খ আবুল মাআলী (র)-এর জনৈক মুরীদ হজ্জে রওয়ানা হলে তার মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা পাকে সালাম পাঠান। মদীনা পৌঁছে উক্ত মুরীদ যথারীতি সালাম আরয করলে রওযা পাক থেকে উত্তর আসে "তোমার বিদ'আতী পীরকে আমার সালামও পৌঁছিয়ে দিও।" কাশফযোগে শায়খ ব্যাপারটা জানতে পারেন। মুরীদ ফিরে আসলে সালাম পৌঁছিয়েছে কি-না তিনি জানতে চাইলে মুরীদ বলল ঃ জী-হ্যাঁ, পৌঁছিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও আপনাকে সালাম বলেছেন। শায়খ বললেন ঃ হুবহু রাসূলুল্লাহ্‌র ভাষায় বল। মুরীদ বলল ঃ আপনার নিজেরই যেহেতু জানা আছে তাই আমাকে কেন বে-আদব বানাচ্ছেন। তিনি বললেন, এতে বে-আদবীর কি কথা, এখন তো এটা তোমার মুখের কথা নয়, বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌র মুখের ভাষা। তুমি কেবল তাঁরই ভাষ্যকার। যাই হোক অবশেষে মুরীদ ব্যক্ত করল যে, "তোমার বিদ'আতী পীরকেও আমার সালাম পৌঁছাবে।" একথা শোনা মাত্রই শায়খ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন এবং ছন্দ আবৃত্তি করেনঃ

بدم گفتی وخور سندم عفاك الله نكو گفتی
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا

—তোমার মন্দ বচনেও আমি পুলকিত, সুন্দর কথাই বলেছ, আল্লাহ তোমায় উত্তম প্রতিদান দিন, কটুবাক্য ও তিক্ত জবাব সুন্দর মুখেই শোভা পায়।

হযরত আবূ যর (রা)-এর বারবার وان رغم انف ابی ذر উচ্চারণে এ রহস্যই নিহিত রয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

اگر ایکبار بگوید بنده من – از عرش بگزرد خنده من

—মাত্র একটি বার সে আমাকে "আমার গোলাম" সম্বোধন করলে আমার

আনন্দের লহরী আরশের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। আর এটাই হবে আমার সর্বাধিক প্রিয় নাম।

এমনকি হাদীসেও স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক কৌতুকের প্রমাণ রয়েছে। বর্ণিত আছে—জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলমানদের উপাধি হবে 'জাহান্নামী'। আর এতেই তারা আনন্দ উপভোগ করবে। বলা হয়েছে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবেন ঃ বল, কি চাও। সে আরয করবে—জাহান্নামের দিক থেকে আমার চেহারা ঘুরিয়ে দেয়া হোক। আল্লাহ বলবেন, এরপর আর কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে—না। সুতরাং তাই করা হবে। তখন জান্নাতের একটি বৃক্ষ দেখতে পেয়ে সে আরয করবে—হে আল্লাহ্! আমাকে উক্ত বৃক্ষের নিচে পৌঁছিয়ে দিন। বলা হবে—তুমি না আর কিছু চাইবে না বলে ওয়াদা করেছিলে ? সে নিবেদন করবে—আমার এ আবেদনটুকু কেবল পূরণ করা হোক এর অধিক আর কিছুই চাইব না। যাহোক এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে সে জান্নাতেই পৌঁছে যাবে। মোটকথা—জান্নাতে তাকে পৌঁছানো হবে, তবে কৌতুক রসে একটু ঘষা-মাজার ছত্রছায়ায়। সুতরাং সে ঘটনায় আপত্তির আর কোন অবকাশ থাকতে পারে না। যেহেতু তাতেও কৌতুকের প্রমাণ রয়েছে। দ্বিতীয়ত গায়েবী আওয়াজে উল্লিখিত 'কাফের' অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়, বরং 'তাগূত'কে অস্বীকার করা। কুরআন শরীফেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى -

—আর যে ব্যক্তি খোদাদ্রোহী তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্কে বিশ্বাস করবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় রজ্জু। —আল-মুরাবিত, পৃষ্ঠা ২৬

**প্রশ্ন ঃ ১২. বিদায়ী খুৎবা উপকারবিহীন, নিছক বিদ'আত।**

বিদায়ী খুৎবার উপকারিতা ব্যাখ্যা করা মূলত আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের নামান্তর। বিভিন্নমুখী উপকারিতার প্রেক্ষিতে কোন বিদ'আত কাম্য হওয়ার দরুন সে ব্যক্তির ধারণায় যেন কুরআন-হাদীসের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল যে, কোন কোন জরুরী শিক্ষা বাদ পড়েছিল তাই এর দ্বারা সেটুকু পূরণ করা হলো। বলা বাহুল্য, এর সমর্থক কেউ হতে পারে না। এরই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বিদ'আত মাত্রকেই ضلالت তথা গোমরাহী আখ্যা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন বিদ'আত পছন্দনীয় হওয়া দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হলে বলতে হয় মূলত সেটা বিদ'আতই নয়। এ জাতীয় সন্দেহ বিদায়ী খুৎবায় হতে পারে না। কারণ এটা সুন্নতের পরিপূরক অথবা

অর্থবোধক হলে পূর্ববর্তী বুযুর্গদের জীবনাচরণে এর নযীর অবশ্যই বিদ্যমান থাকার কথা। যা ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁদের জীবনাদর্শের সাথে দূরবর্তী কোন ক্ষীণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব যদি হয়ও তাহলে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার সমাধান কি হবে যে, জনসাধারণ একে অনিবার্য মনে করার ফলে প্রথমত তা বিদ'আত এবং পরে গোমরাহীতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাহান্নামের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্র বাণী মূলত আল্লাহ্রই কালাম। সুতরাং এ ধরনের কার্যকলাপ অনিবার্য মনে করা এবং এর উপকারিতা ব্যক্ত করা একদিকে আল্লাহ ও রাসূলের ওপর অভিযোগ সৃষ্টি, দ্বিতীয়ত আল্লাহ ও রাসূলের শানে বিদ্রূপের নামান্তর। কিন্তু "রাসূলের বাণী আল্লাহ্রই কালাম" আমার এ উক্তি দ্বারা কারো এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া সমীচীন নয় যে, মহানবী (সা) ইজতিহাদ করতেন না। বস্তুত ইজতিহাদ তিনি অবশ্যই করতেন, কিন্তু তার বাস্তবায়ন ছিল ওহী-নির্ভর। এর বিপক্ষে ওহীর ভাষ্য না থাকলে সেটা দলীলরূপে গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে নীরবতা সমর্থনের নিদর্শন। অথবা ওহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইজতিহাদকে সংশোধন করে দেয়া হতো। মোটকথা, যে কোন অবস্থায় সেটাও ওহীর মর্যাদা লাভ করত। সুতরাং তাঁর ইজতিহাদ সত্ত্বেও এটা বলা যথার্থ যে,

گفته او گفته الله بود - گرچه از حلقوم عبد الله بود

—তাঁর কথা মূলত আল্লাহ্রই ভাষ্য, যদিও তা রাসূলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

—ইকমালুল আওয়াম ওয়াল ঈদ, পৃষ্ঠা ৬

**প্রশ্ন ঃ ১৩. কবরবাসীর নিকট সাহায্য কামনা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।**

(ক) মাওলানা থানভী (র) বলেন ঃ কুরআনের اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ (আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবেন না) আয়াতে উল্লিখিত শিরকের পরিচয় হলো—কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। আর কারো সামনে দীনহীন, কাতর ও মিনতিপূর্ণ আত্মনিবেদনের নাম ইবাদত। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা, কাজেই তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে এভাবে আত্মনিবেদন করা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। যেমন কোনও দু-জন লোকের একজন মর্যাদাবান। এখন তিনি ভিক্ষুকের হাতে কিছু দান করলেন। আর ফকীর দাতার স্থলে দ্বিতীয়জনের গুণ-কীর্তন ও স্তুতিবাক্য আরম্ভ করে দিলে দাতার মনে অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তদ্রূপ শিরকের কারণে মহান আল্লাহ্র আত্মমর্যাদায়ও আঘাত পড়ে। কবর-মাযারে

ওলী-আল্লাহ্দের নিকট প্রার্থনাকারীদের উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করা দরকার যে, তা
কি কেবল উপায়-অসীলা হিসাবে আবেদন জানায় নাকি এর সাথে অতিরিক্ত আ
কিছু যুক্ত থাকে। আরবের পৌত্তলিকরা নৈকট্যলাভের উপায় হিসেবেই মূর্তি পূজ
লিপ্ত ছিল। সুতরাং কুরআনের ভাষায় ঃ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى (একমা
নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা এদের পূজা করে থাকি।) তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক
হয়েছে যে, খোদার নৈকট্য লাভের আশায়ই তারা শিরকে লিপ্ত ছিল, তা সত্ত্বে
তাদেরকে মুশরিক আখ্যা দেয়া হয়েছে কোন্ কারণে ? ব্যাপারটা পর্যালোচ
সাপেক্ষ। প্রণিধানযোগ্য যে, অসীলা দুই প্রকার। দৃষ্টান্তের আলোকে ব্যবধানটা স্প
হবে। যেমন মনে করুন, জনৈক কালেক্টর তার কাজকারবার, হিসাব-নিকাশ ইত্যা
যাবতীয় বিষয়-আশয় দেখাশুনার ভার একজন দক্ষ কেরাণীর হাতে অর্পণ করে দিল
তদ্রূপ অপর একজন কালেক্টর, তারও কেরাণী আছে। কিন্তু তিনি অতিশ
ন্যায়পরায়ণ, কেরাণীর দায়িত্বে না দিয়ে কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য নিজে
দেখাশুনা করেন। এখন প্রথমোক্ত দক্ষ কেরাণীর নিকট কোন বিষয়ে কেউ দরখা
পেশ করতে চাইলে তাকে কর্মকর্তা মনে করেই করবে, তাকে তোষামোদও করবে
যদিও চূড়ান্ত সই কালেক্টরই দেবে। কিন্তু কেরাণীর অমতে নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতী
কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে হলেও কেরাণীর মাধ্যমেই আসতে হবে
কেননা সে মনিবের প্রিয়জন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে মনিবের কাছে কেউ যে
সাহস পায় না। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়—উভয়ক্ষেত্রে মাধ্যম যদিও কেরাণী কিন্তু নিয়তে
ব্যবধান সুস্পষ্ট।

বলা বাহুল্য, জনগণের ভক্তি-ব্যবহারে কবরবাসীদের সাথে প্রথম কেরাণীর ন্যা
আচার-আচরণই প্রকাশ পায়। এটা শিরক নয়তো কি ? অবশ্য নামমাত্র অসীল
ধারণা করা অন্য কথা। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে গায়রুল্লাহ্র ইবাদতই শিরক, চা
অসীলার আকারেই হোক না কেন। মোটকথা, শরীয়তসম্মত উপায়ে অসীলা গ্রহ
জায়েয, কিন্তু অসীলার মাধ্যমে ইবাদত করা শিরক।

—মাকালাতে হিকমত, নং ৫৭, দাওয়াতে আবদিয়ত, ১ম খ

(খ) মানুষ পার্থিব সাহায্য-সহায়তা পাওয়ার আশায় মাযারে ধরনা দেয়। কি
অলী-আল্লাহ্দের শানে এটাও এক ধরনের বে-আদবী। কেননা তাঁরা মহান আল্লাহ্
নৈকট্যশীল, জীবিতকালেই যে ক্ষেত্রে পার্থিব ঝামেলা তাঁদের পছন্দ ছিল না—এক্ষ
মরণোত্তর জীবনে নির্ভেজাল পরকাল বিষয়ে ডুবে থাকা অবস্থায় একই বস্তু তাঁদে
মনঃপূত কি করে হতে পারে ? এমতাবস্থায় পার্থিব বিষয়াদি তাঁদের সাহায্য কাম

শরীয়ত ও বিবেক-বুদ্ধি উভয়ের পরিপন্থী। কেননা পার্থিব বিষয়াদি বর্তমানে তাঁদের ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত। কাজেই কারো নিকট 'নেই' বস্তুর কামনা অযৌক্তিক, অর্থহীন। তবে হ্যাঁ, প্রার্থনা এমন বিষয়ে করা যেতে পারে, যা তাদের অধিকারে আছে। সুতরাং সাহেবে নিসবত তথা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি এখনো তাঁদের কাছ থেকে ফয়েয ও বরকত লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের গোটা মাযার খনন করলেও টাকা-পয়সা কিংবা ধন-দৌলতের কোন হদিস মিলবে না। কাজেই এমন জিনিস প্রার্থনা করা বিবেক বর্জিত কাজ। অবশ্য তাঁদের দোয়ার আশায় যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ নিয়তে যায় কোন্ ভাগ্যবান ? সাধারণ বিশ্বাস তো এই যে, পীরসাহেব নিজে দান করেন। সুতরাং কানপুরের জনৈকা বৃদ্ধা এক ব্যক্তির কাছে এসে ধরল, বড় পীরের নামে 'নিয়ায' করে দাও। সে বলল, বুড়ি মা! নিয়ায তো আল্লাহ্র নামে আর তার সওয়াব দেই পীর সাহেবের নামে। বৃদ্ধা বলল, না, আল্লাহ্র নিয়ায তো আমিই দিয়েছি, এতে কেবল বড় পীরের নিয়ায করে দাও। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণের ধারণায় পীর-বুযুর্গগণ মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী। একবার জামে মসজিদে জনৈকা বৃদ্ধা এসে বলল, তাযিয়ার ওপর ঝুলানোর উদ্দেশ্যে এক টুকরা কাগজ লিখে দাও। আমি বললাম, এখানে এরূপ কেউ লিখতে জানে না। আরেকবারের ঘটনা—এক লোক ঘটনার বিবরণ দিল যে, তাযিয়ার মধ্যে আমি মোমের পুতুল দেখেছি। প্রকৃত ঘটনা হলো, এক ব্যক্তি তাযিয়ার মধ্যে সন্তান লাভের আবেদনপত্র ঝুলিয়ে দিলে অপর একজন এর নিচে লিখে দেয় যে, "তোমার স্ত্রী বন্ধ্যা, একে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে কর।" তার নিচে ছন্দ লিখল ঃ

زمین شور سنبل بر نیاید
در و تخم عمل ضائع مکر دان

(অর্থাৎ লবণাক্ত যমীনে ফসল ফলে না, কাজেই এর পিছনে নিষ্ফল পরিশ্রম করো না) শেষে লিখেছে—লেখক ইমাম হুসাইন।

দরখাস্তকারী লেখা পড়ে তো গোস্সায় আগুন! "আমার সাথে বিদ্রূপ করল কে?" একজন বলল ঃ আপনি কি করে বুঝলেন এটা যে অন্যের লেখা। দরখাস্ত যেহেতু ইমাম হুসাইন বরাবরে, কাজেই সম্ভবত তিনি নিজেই লিখেছেন। কারণ যে পড়তে জানে সে লিখতেও তো পারে ?

মোটকথা—এই হলো মানুষের বর্তমান অবস্থা, যা শরীয়ত ও শালীনতার পরিপন্থী এবং বে-আদবী। সত্য বলতে কি দুনিয়া সে সকল বুযুর্গদের এতই অপ্রিয় ভদ্র মজলিসে যেমন মল-মূত্রের আলোচনা। হযরত রাবেয়া বসরীর সাহচর্যে বসে

কয়েকজন বুযুর্গ দুনিয়ার নিন্দা চর্চায় লিপ্ত হন। তিনি বললেন, চলে যাও দরবার ছেড়ে, মনে হয় দুনিয়া তোমাদের প্রিয় বস্তু। কেননা من احب شيئا اكثر ذكره যে যাকে ভালবাসে তার চর্চাই সে বেশি করে। —ইত্তেবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ৯

**প্রশ্ন ঃ ১৪. জন্মদিনকে উৎসবে পরিণত করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবমাননা।**

নিজেদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিজাতীয়দের আচরণের অনুসরণে এ উপমহাদেশস্থ আধুনিকতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একশ্রেণীর প্রগতিমনা লোককে মহানবী (সা)-এর জন্মদিবসকে আনুষ্ঠানিক উৎসব দিবসে পরিণত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বেশ তৎপর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত যে, মিলাদুন্নবীর আনন্দ পার্থিব পার্বণ নয়, এটা একটা ধর্মীয় উৎসব। কাজেই এর নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়নে সবার আগে ওহীর অনুমতি প্রয়োজন। কেউ যদি বলে যে, আমরা বার্ষিকী হিসাবে প্রচলিত নিয়মাকারে এ উৎসব পালনে আগ্রহী, তবে আমি বলব—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শানে এটা চরম বে-আদবী। বন্ধুগণ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ ও কর্মের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই এমনসব রাজা-বাদশাহ্দেরকে তাঁর সাথে তুলনা করা সঙ্গত হবে কি যে, এই নিয়মে, অভিন্ন রূপকাঠামোতে আমরাও তাদের জন্মোৎসবের ন্যায় মিলাদুন্নবী উৎসবে মেতে উঠি ?

چه نسبت خاك را باعالم پاك

সে পবিত্র জগতের সাথে এ মর্ত্যলোকের কি সম্পর্ক ? এ পর্যায়ে 'অরণ্যবাসী জনৈক বুযুর্গের ঘটনা আমার মনে পড়ল। তিনি একটি কুকুরী পালন করতেন। ঘটনাক্রমে কুকুরীর বাচ্চা হলে তিনি শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সেখানকার বুযুর্গ ব্যক্তিকে এ থেকে বাদ রাখলেন। তাই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বলে শহরের বুযুর্গ দাওয়াত থেকে বাদ পড়ার অনুযোগ পাঠান। অরণ্যবাসী বুযুর্গ জবাবে বলে পাঠান যে, হযরত! আমার এখানে বাচ্চা হয়েছিল কুকুরীর, তাই দুনিয়ার কুকুরদের দাওয়াত করেছি। এসব দুনিয়ার কুকুরদের সাথে আপনাকে দাওয়াত করাটা আমি চরম বে-আদবী মনে করেছি। দোয়া করুন আমার সন্তান হলে সে আনন্দে অবশ্যই আপনাকে দাওয়াত দেব আর এসব কুত্তার একটিকেও জিজ্ঞেস করব না। তাই ওলী-আল্লাহদের সাথেই যেক্ষেত্রে দুনিয়াদারের ন্যায় আচরণ বে-আদবীতুল্য সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দুনিয়াদারের ন্যায় আচরণ বে-আদবী কেন হবে না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মদিনের আনন্দ যে পার্থিব নয়—ধর্মীয় উৎসব এর স্বপক্ষে প্রমাণ নিন। এটা সবার জানা কথা যে, ইহজগত বলতে এ মাটির পৃথিবী এবং এর সংলগ্ন কয়েক মাইল শূন্যলোক বোঝানো হয়। তাই কোন জাগতিক

আনন্দের প্রভাব এ পৃথিবীর পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অথচ মহানবী (সা)-এর জন্মলগ্নে দুনিয়ার সৃষ্টিকুলই নয়; বরং ফেরেশতাকুল, আরশ, কুরসী তথা সমগ্র সৃষ্টিজগত আনন্দে আত্মহারা ছিল। কেননা মহানবী (সা)-এর জন্ম ছিল কুফরী ও গোমরাহীর তমসা ছিন্নকারী আর একত্ববাদ, সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পতাকাবাহী। যাঁর অসীলায় বিশ্ব জাহান স্থিতিবান। আর কিয়ামতের আগমনে অধিকাংশ ফেরেশতাও বিলীন হয়ে যাবে। অতএব তাঁর আবির্ভাব সৃষ্টি জগতের স্থায়িত্বের অসীলা। তাই এ আনন্দ সমগ্র সৃষ্টিকুলের মহোৎসব। এর প্রভাব ইহজগতের গণ্ডি ছেদন করার কারণে এটাকে নিছক জাগতিক আনন্দ বলা যায় না। যখন প্রমাণিত হলো যে, এটা ধর্মীয় উৎসব কাজেই এর উদযাপন পদ্ধতি প্রণয়ন এবং নীতিমালা নিরূপণে ওহীর নির্দেশ অনিবার্য। এখন মিলাদ অনুষ্ঠানের প্রস্তাবকরা আমাদের সামনে পেশ করুক কোন্ ওহীর ভিত্তিতে মিলাদুন্নাবীর অনুষ্ঠানসূচী এবং রূপকাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। কেউ যদি قل بفضل الله (বল–আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে) আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করতে ইচ্ছা করে, তবে আমি বলব—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যলাভকারী আর জগতের সর্বাধিক কুরআনিক তথ্য ও তত্ত্ববিদ সাহাবীগণের বিবেকে এ মাসআলাটা কেন স্থান পেল না ? অথচ তাঁদের রক্ত-মাংসে, দেহের অণু-পরমাণুতে রাসূলের ভালবাসা মিশ্রিত ছিল। তদ্রূপ জগত বিখ্যাত মুজতাহিদ তাবেঈগণের দূরদৃষ্টিই বা এ পর্যন্ত পৌঁছল না কেন ? অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমোদিত বিষয় অবশ্যই পালন করা উচিত। যেমন তিনি স্বীয় জন্মদিনে রোযা রেখেছেন আর বলেছেন ঃ ذالك اليوم الذى ولدت فيه (এটা আমার জন্মদিন)। কাজেই এ দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব হতে পারে। দ্বিতীয়ত এ দিনে বান্দার আমলনামা আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়। সুতরাং এ উভয় কারণে অথবা যে-কোন একক কারণের ভিত্তিতে রোযা পালন করাও বিশুদ্ধ। কিন্তু এ আমল ততটুকুর মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে, যে পরিমাণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

—আকমালুস্‌সওম ওয়াল ঈদ, পৃষ্ঠা ৩৪

**প্রশ্ন ঃ ১৫. উরসের সঠিক মর্ম, প্রচলিত উরস শরীয়তসম্মত নয়।**

মানুষ বর্তমানে বুযুর্গদের নামে উরসের যে পন্থা অবলম্বন করেছে এটা শরীয়তসিদ্ধ নয় এবং সীমালংঘনের শামিল। মূলত উরসের আভিধানিক অর্থ—আনন্দ ও খুশি, প্রেমিক-প্রেমাস্পদের মিলনে যা অর্জিত হয়ে থাকে। ওফাতের মাধ্যমে যেহেতু প্রেমাস্পদের সাথে তাদের মিলন সাধিত হয়, কাজেই তাদের মৃত্যুদিবসকে 'ইয়াওমুল উরস' বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে—কোন সত্যপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর

পর কবর জগতের প্রশ্নোত্তর শেষে ফেরেশতা তাদেরকে বলেন ঃ نم كنومة العروس (নব্য বিবাহিতের ন্যায় ঘুমাও)। তাই এ দিনটি তাদের জন্য উরসের দিন তুল্য। এ মর্মে জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ

خوشا روزے وخرم روز گارے
که بارے بر خورد از وصل یارے

—(সে দিনটি বড়ই আনন্দের, একবার যেদিন বন্ধুর সাথে মিলন-সুধা উপভোগের সুযোগ মিলে)। পরজগতের ন্যায় পার্থিব জীবনে যদিও তাঁদের মিলন ঘটে, কিন্তু দুই মিলনে বিরাট ব্যবধান। কারণ জাগতিক মিলন পর্দাসহ আর মর-ণোত্তর মিলন আবরণমুক্ত। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

گفت مکشوف وبرهنه گو که من
مے نه گنجم باصنم در پیر هسن

—প্রেমিক প্রেমাস্পদকে সম্বোধন করে বলতে লাগল—আবরণমুক্ত হও, কেননা প্রেমাস্পদের সাথে বস্ত্রের আচ্ছাদনে আমার ঠাঁই হয় না।

মহান আল্লাহ, দেহ ও আনুষঙ্গিক বস্তু থেকে পবিত্র কিন্তু এটা কেবল দৃষ্টান্তমূলক ভাষ্য। হযরত গাউসুল আযম বলেছেন ঃ

بے حجابا نه در آ از در کاشانه ما
که کسے نیست بجز درد تو در خانه ما

—আবরণমুক্ত অবস্থায় আমার আস্তানায় পদার্পণ কর, কেননা তোমার বিরহ জ্বালা ব্যতীত আমার অন্তরে আর কিছুই নাই।

এ তো হলো মরণোত্তর মিলনের অবস্থা। কিন্তু পার্থিব জীবনে পর্দার আড়াল হেতু তাঁদের অতৃপ্ত মনের অবস্থা হলো ঃ

دل آرام در بر دل آرام جو
لب از تشنگی خشك وبر طرف جو
نگویم که بر آب قادر نیند
که بر ساحل نیل مستسقی اند

—তোমার প্রিয়জন তোমারই কোলে অবস্থিত অথচ তুমি প্রিয়জনের অন্বেষণে ব্যস্ত। পিপাসায় তোমার ওষ্ঠ শুকিয়ে গেছে অথচ তুমি স্রোতের কিনারে অবস্থিত রয়েছ। আমি এ কথা বলি না যে, তুমি পানি পানে সক্ষম নও, কেননা পিপাসা-কাতর রোগী উপবিষ্ট রয়েছে নীল নদের কিনারায়।

মরণোত্তর জীবনেই যেহেতু তাঁদের এ সম্পদ অর্জিত হয় তাই মরণ কামনায় ব্যাকুল প্রাণে-উৎকণ্ঠচিত্তে তাঁরা বলে ওঠেন ঃ

خرم آنروز کزین منزل ویراں بروم

راحت جان طلبم وز پئے جانان بروم

—সেদিন আমি চির সন্তুষ্ট হব যেদিন এই উজাড় বাড়ি হতে প্রস্থান করব, জীবনে শান্তি অন্বেষণ করব এবং প্রেমাস্পদ ও প্রিয়জনের পিছনে পিছনে গমন করব।

মরণ যেহেতু ওলী-আল্লাহগণের আনন্দের উপাদান তাই এতে তাঁরা সদা প্রফুল্ল। সুতরাং জনৈক নক্শবন্দী বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে—মৃত্যুর পূর্বে তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যে, নিম্নোক্ত ছন্দ পাঠরত অবস্থায় আমার লাশ তোমরা বহন করবে ঃ

مفلسا نیم آمده در کوئے تو

شیا لله از جمال روئے تو

دست بکشا جانب زنبیل ما

آفرین بر دست وبر بازوئے تو

—শূন্য হাতে তোমার আস্তানায় উপস্থিত হয়েছি কেবল তোমার রূপ দর্শনের আশায়। আমার ঝুলির প্রতি হাত বাড়াও, ধন্য হোক তোমার প্রসারিত হাত আর অমলবাহু।

এটা ছিল তাঁদের চরম প্রশান্তির লক্ষণ। কেননা ব্যাকুল প্রাণে কেউ এ জাতীয় ফরমাইশ দিতে পারে না। সুলতান নিযামুদ্দীন আউলিয়ার ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। মৃত্যুর পর তাঁর লাশ বহনকালে জনৈক মুরীদ শোকের আতিশয্যে ছন্দ আবৃত্তি করে ঃ

سرو سیمینا بصحرا می روی

سخت بے مهری که بے ما میروی

ائے تماشا گاه شالم روئے تو

تو کجا بهر تماشا می روی

—হে সুন্দর ! আজিকে এ বিরাণ-বিজন মাঠে কোথায় তোমার গমন, একি কঠোর আচরণ যে, আমাদের ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ। হে সুন্দর! যার চেহারা সৃষ্টিকুলের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু! তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে তুমিই আবার যাচ্ছ কোথায় ?

বর্ণিত আছে, কাফনের ভিতরই তাঁর হাত উঁচু হয়ে যায়। বন্ধুগণ! এমন ব্যক্তি যার অবস্থা হলো ঃ

پا بدستی دگرے دست بدست دگرے

—"যার হাত-পা পরের কাঁধে সমর্পিত" তার তো ওয়াজ্‌দ হতে পারে না। এতে বোঝা গেল বাস্তবেই সে দিনটি বড় আনন্দের।

অপর একজন বুযুর্গ মৃত্যুকালে প্রেমাসক্ত অবস্থায় বলেন ঃ

وقت آمد که من عریان شوم
جسم بگذارم سراسر جان شوم

—আমার আবরণমুক্ত হওয়ার সময় সমাগত, এখন দেহ ত্যাগ করে আমি পরিপূর্ণ আত্মায় রূপান্তরিত হব।

যেহেতু তিনি অনুভব করছেন যে, এখনই আমার ইহজাগতিক পর্দা উন্মোচিত হয়ে প্রেমাস্পদের দর্শনে আমি ধন্য হব, কাজেই তাঁর এ অবস্থা হবে না কেন ? হযরত ইবনুল ফারেযের ঘটনা উল্লিখিত আছে যে, মৃত্যুকালে তাঁর সামনে জান্নাত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি ছন্দ ঃ

ان كان منزلتي فى الحب عندكم
ما قد رأيت فقد ضيعت ايامى

"উপস্থিত যা লক্ষ করছি এই যদি হয় আমার ভালবাসার প্রতিদান তাহলে তো আমার সময় নষ্ট করেছি কেবল" উচ্চারণ করে বললেন যে, প্রাণই তো আপনাকে বিলিয়ে দিচ্ছি, জান্নাতে আমার কি প্রয়োজন। অতঃপর জান্নাত অদৃশ্য হয়ে আল্লাহ্‌র নূরের দীপ্তি প্রকাশিত হয় এবং তিনি পরপারে যাত্রা করেন। তাঁর অবস্থা হুবহু এই হয়েছিল যেমন ঃ

گر بیاید ملك الموت که جانم ببرد
تانه بینم رخ تو روح رمیدن ندهم

—আমার প্রাণ নেয়ার উদ্দেশ্যে যদি মালাকুল মউত উপস্থিত হয়, আপনার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত নিতে দেব না।

এ অবস্থা শুনে অধিকাংশ লোক হয়তো হতবাক হয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের এ বিস্ময় কেবল এজন্য যে, নিজেরা এ থেকে বঞ্চিত। তাদের সম্পর্কে ঃ

تو مشو منکر که حق بس قادر است

—"তুমি অস্বীকার করো না আল্লাহ তো সবই করতে সক্ষম।" ছন্দ আবৃত্তিই যথেষ্ট। মোটকথা, বুযুর্গদের অবস্থা এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁদের মৃত্যু দিবস উরসের দিন। কিন্তু লোকেরা এর অর্থ ও পাত্র উভয়টাই বিকৃত করে দিয়েছে। প্রয়োগের বিকৃতি তো বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত উরসের অঙ্গীভূত। অর্থের বিকৃতি এভাবে হয়েছে যে, উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করত বিয়ে-শাদীর উপায়-উপকরণ পর্যন্ত সেখানে জমা করা হয়। সুতরাং অধিকাংশ স্থানে প্রথা অনুযায়ী বুযুর্গদের কবরে মেহেন্দী লাগানো হয়, ঢোল-বাজনা ইত্যাদিও সেখানে ব্যবহৃত হয়। বেচারা মুর্দার তো নাগালের বাইরে যত অপকর্ম সব কবর গাত্রে সম্পন্ন হয়।

মূলত বুযুর্গদের আনন্দের দিন বিধায় এটা উরস হিসেবে বিবেচিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উরস যেহেতু নিছক ইহলৌকিক আনন্দের বিষয় নয়, কাজেই এর নিয়ম-পন্থা নির্ধারণে ওহীভিত্তিক নির্দেশ থাকা অনিবার্য। অথচ এর প্রচলিত পদ্ধতির সমর্থনে ওহী তো নাইই বরং ওহীর ভাষ্য এর প্রতিকূলে। সুতরাং এ সম্পর্কিত মহানবী (সা)-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ لا تتخذوا قبرى عيدا

—আমার কবরকে তোমরা উৎসবকেন্দ্রে পরিণত করো না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—ঈদ তথা উৎসবের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য। (১) জনসমাবেশ, (২) সময় নির্ধারণ এবং (৩) আনন্দ। অতএব হাদীসোক্ত নিষেধের সার-সংক্ষেপ এই যে, নির্দিষ্ট দিনে আনন্দের উপকরণসহ আমার কবরে তোমরা জনসমাবেশ ঘটাবে না। অবশ্য ঘটনাক্রমে অন্য কোন উপলক্ষে লোক সমাগমের ফলে অনাহূত গণসমাবেশের আকার ধারণ করলে সেটা ভিন্ন কথা।

দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়াটা তাঁর পক্ষে আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু আমাদের জন্য তো শোকের কারণ। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে "নশরুত্‌তিব" গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর ওফাতকে আমাদের উপর নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা বলে আমি উল্লেখ করেছি সেটা ছিল ভিন্ন প্রসংগে, অন্য হিসেবে। মোটকথা—স্বয়ং মহানবী (সা)-এর রওযা পাকের অঙ্গনে এ জাতীয় সমাবেশ অবৈধ, সে ক্ষেত্রে অন্যদের কবর পাশে সেটা কিরূপে জায়েয ও বৈধ হতে পারে? বস্তুত এটা এক বিস্ময়কর বরকত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রওযা মুবারকে আজো পর্যন্ত দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করত কোন সমাবেশ ঘটেনি। —ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬

**প্রশ্ন ঃ ১৬. আনন্দ ও শোক প্রকাশের প্রচলিত প্রথা শরীয়ত বিরুদ্ধ এবং অবশ্য বর্জনীয়**

(১) আনন্দোৎসব এবং শোক প্রকাশের বর্তমানে প্রচলিত লোকাচার "শরীয়ত সম্মত"—কোন মুসলমান একথা বলতে পারে না। কারো জানা না থাকলে এ সম্পর্কিত বই-পুস্তক পাঠ করা উচিত অথবা এ সমাবেশে উপস্থিত লোকেরা জেনে নিতে পারেন এর তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ। তাহলে শুনুন! আনন্দ ও শোক প্রথা দু-ধরনের। এক. যার নিন্দনীয় ও অবৈধ হওয়াটা সুস্পষ্ট। শিষ্ট-সম্ভ্রান্ত ও রুচিবান জনসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত। এখন কেবল নিম্নশ্রেণীর এবং দুষ্কৃতকারী জনগোষ্ঠীই এর পক্ষপাতী। যেমন—গান-বাজনা কিংবা নাচ-রংয়ের মাধ্যমে এ জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করা। দুই. সেসব প্রথা যেগুলোর অবৈধতা অতি সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট । সাধারণ-অসাধারণ সমাজের সর্বস্তরের লোক জায়েয ও বৈধ ধারণা করেই এতে লিপ্ত হয়। এমনকি তাকওয়ার দাবি তুলে বলা হয়—আনন্দ আর উল্লাস প্রকাশে আমরা তো আর নাচ-গানের আসর জমাইনি, তাহলে এমন কি গুনাহ করে ফেললাম। কিন্তু প্রথমে আমাকে বলুন, গুনাহ্ বলে কাকে? বলা বাহুল্য—শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়কেই গুনাহ ও পাপাচারে আখ্যায়িত করা হয়। চাই সেটা নাচ-গানের আকারে হোক, চাই অন্য কোন পন্থায়। কেননা নাচ হারাম এজন্যই যেহেতু শরীয়ত একে নিষেধ করেছে। এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো—নাচ-গান ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আচার-অনুষ্ঠান শরীয়ত হারাম এবং অপরাধ সাব্যস্ত করেছে কি না? "ইসলাহুর রুসুম" পুস্তিকায় এর বিশদ ব্যাখ্যা দেখে নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে এর একটা সংক্ষিপ্ত ও সীমিত পর্যালোচনার আলোকে বিষয়টাকে তুলে ধরার আমি চেষ্টা করছি। সবাই অবগত আছেন যে, কুরআন ও হাদীসে অহংকার ও গর্ব করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে! সুতরাং কুরআনের ভাষ্য ان الله لا يحب كل مختال فخور —নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন গর্বিত-অহংকারীকে পছন্দ করেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر -

—অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার পোষণ করে এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অপর এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

من لبس ثوبا شهرة البسه الله ثوب الذل يوم القيامة -

—"যে ব্যক্তি সুনাম ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পোশাক পরাবেন।" অতএব বোঝা গেল অহংকারপূর্ণ মনে কোন কাজ করা হারাম। এ সম্পর্কিত অপর এক হাদীসের মর্ম হলো—লোক দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে কাজ করা হারাম। এখন চিন্তা করুন!

বিয়ে-শাদীতে আমরা যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকি, যেমন আত্মীয়-স্বজন খাওয়ানো, মেয়েকে এটা-সেটা দেয়া ইত্যাদিতে আমাদের উদ্দেশ্য কি থাকে। বন্ধুগণ! সুন্দর সুন্দর শব্দের রং চড়ালেই জিনিসের স্বরূপ বদলায় না। নিয়তই হলো সবকিছুর মূল। সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আমাদের এসব কার্যকলাপ নিছক প্রথাগত আচরণ। এ উপলক্ষে বোনকে কিছু দান করে সেটাকে "সিলা রাহ্‌মী" তথা আত্মীয়তার বন্ধন আখ্যা দেয়া হয়। কি জনাব! আজ থেকে আটদিন পূর্বেও তো এ-বোন আপনার বোনই ছিল। আপনি কি তার খবর নিয়েছেন, তার অভাব মোচনে সহায়তা করেছেন? দ্বিতীয়ত আত্মীয়তার উদ্দেশ্যে করা হলে লোক-সমাজে প্রদর্শনীর কি প্রয়োজন? নিজের মেয়েকে কাপড় কিনে দিলে কিংবা খাওয়ানোর সময়ও কি আপনি আত্মীয়-স্বজন জড়ো করে প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকেন? উত্তর যদি নেতিবাচক হয়, তবে যৌতুকের বেলায় লোক জমানোর উদ্দেশ্য কি? এতে বোঝা গেল একমাত্র খ্যাতির উদ্দেশ্যেই এসবের আয়োজন। কাজেই এসব রেওয়াজ-প্রথার মূলে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান বলা হলে যথার্থই বলা হবে। আর কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সুনামের উদ্দেশ্যে কৃত যাবতীয় রেওয়াজ-রুসূম হারাম। বিশেষত একটা রেওয়াজ তো এতই ঘৃণিত যে তওবা দ্বারাও ক্ষমার আশা ক্ষীণ। কেননা এ থেকে তওবা করাও মুশকিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো—দৃশ্যত এটাকে ইবাদত মনে করে গর্ব করা হয়। সেটা হলো—বিয়ের মধ্যে উপহার (ঢাকার উত্তরাঞ্চলীয় ভাষায় 'শেউলী') সামগ্রীর আদান-প্রদান। মানুষ এটাকে "করযে হাসানা" তথা উত্তম ঋণ ধারণা করে বলে ঃ এর দ্বারা ভাই কর্তৃক অপর ভাইকে সাহায্য করা হয়। আর ভাইয়ের সাহায্য করা ইবাদত। যেন উপহার দান করা ইবাদত! অথচ এটা একটা অত্যন্ত ঘৃণিত প্রথা যা আপনাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এখনই আমি এর স্বরূপ তুলে ধরছি। আপনাদের কাছে তা নতুন ঠেকবে না, মনে হবে এ তো জানা বিষয়। কিন্তু মনোযোগ না দেয়ার কারণে সবাই ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। এ ক্ষেত্রে ভুলটা হচ্ছে কেবল ফল নির্ধারণে, নতুবা ভূমিকা সবার নিকট স্বীকৃত। যেমন কেউ বানান করল ت - ب যবর 'তাব' تب - ب - ت যবর 'বাত' কিন্তু টানা পড়ল بطخ তদ্রূপ আপনারাও বানান ঠিকই করেছেন, কিন্তু টানা পাঠে ভুল হয়ে গেছে। বিষয়টা এখন আরো পরিষ্কার করে বলছি। এটা সবাই স্বীকার করবেন যে, বিয়েতে দেয় উপহার মূলত ঋণভিত্তিক দান। আর ঋণ আদায় করা ওয়াজিব।

তৃতীয়ত, ঋণদাতার মৃত্যুর পর তার যাবতীয় ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়। চাই নগদ টাকা-পয়সা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হোক কিংবা

পাওনা ঋণ হোক। যেমন এক ব্যক্তি মারা গেল, তার সম্পদের মধ্যে রইল নগদ একশ টাকা আর পাওনাযোগ্য ঋণ একশ টাকা। এখন তার ত্যাজ্য সম্পত্তি মোট দু'শ টাকা হিসাবে আসবে। এখন অন্যান্য সম্পত্তির সাথে উক্ত দু'শ টাকা যোগ করত ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করতে হবে। আলোচ্য মাসআলা তিনটি জানার পর লক্ষ করুন, বিয়ের উপহারের ধরনটা কি হয়। বাস্তবে এর ধরন এই হয় যে, মনে করুন এক ব্যক্তি দুই টাকা করে পঁচিশ জায়গায় উপহার দিল। ফলে এভাবে তার মোট পঞ্চাশ টাকা ঋণ ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর একজন বালেগ একজন নাবালেগ দুই পুত্র রেখে সে মারা গেল। আর যাবতীয় সম্পত্তি দুইজনে আধাআধি সমান হারে ভাগ করে নিল, তাও বড়জন ঈমানদার হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাপের দেয়া উপহার-ঋণ তো কেউ ভাগ করে না। তাই বাস্তবে দেখা যায় উক্ত বড় ছেলের কোন সন্তানের বিয়ে হলে প্রাপ্য উপহার সবাই এখানে এনে জমা করে আর সেও নিজের হক মনে করেই সব ব্যয় করে। অথচ উক্ত পঞ্চাশের মধ্য হতে সে মাত্র পঁচিশের মালিক, বাকি অর্ধেক ছোট ভাইয়ের অংশ। সাধারণত উপহারের অবস্থা এই হয়। এখন আমার প্রশ্ন—ফরায়েযের বিধান মতে উপহার ভাগ করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত কেউ উপস্থিত করতে পারবে কি? আমার বিশ্বাস, আদৌ না। এ ক্ষেত্রে গুনাহ দুই তরফা হলো। একে তো বড় ভাই অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল তসরুফ করার—যে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ـ

—অন্যায়ভাবে যারা ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে নিশ্চয়ই তারা যেন অগ্নিকুণ্ড উদরস্থ করল, শীঘ্রই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

দ্বিতীয়ত, উপহার প্রত্যর্পণকারী দুই শরীকের মাল এক শরীকের হাতে অর্পণ করে গুনাহ্র ভাগী হলো। অধিকন্তু তারা মনে করে—যাক, ঋণমুক্ত হলাম। অথচ ইয়াতীমের পঁচিশ টাকা এখনো তার দায়িত্বে বাকি। দুররুল মুখতার গ্রন্থে বর্ণিত আছে—কারো তিন পয়সা ঋণের দায়ে কিয়ামতের দিন সাত শ নামায পাওনাদারকে দেয়া হবে। এটা তো হলো যদি মালিকের ছেলেকে দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়—কয়েক পুরুষ গত হয়ে যায় তবু এ ঋণ আদায় করা হয় না। এমতাবস্থায় সকল হকদারের পরিচয় জানাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেউ বলতে পারে—বাপ-দাদার আমল থেকেই তো এ প্রথা চলে আসছে। জবাবে আমি বলব—এ কৈফিয়ত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্ব থেকে ধারা যদি এটাই চালু থাকত, তবে আজকে আমাদের পক্ষে মুসলমান হওয়া ভাগ্যে জোটার কথা নয়। আমাদের বাপ-দাদা

নিজেদের পূর্ব-পুরুষের রীতি-নীতি, রেওয়াজ-রুসুম বর্জন করেছিলেন বলেই না আজকে আমরা মুসলমান হিসেবে পরিচিত। কাজেই এ কৈফিয়ত অযৌক্তিক-অর্থহীন। এর একমাত্র সমাধান এটাই যে, সন্ধান করে করে পূর্বঋণ শোধ করে দেয়া এবং ভবিষ্যতে এ প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করা। এ ছাড়া আরবি কি ইংরেজি শিক্ষিত যে কোন ব্যক্তি আমাকে দ্বিতীয় কোন উপায় নির্দেশ করুক। বস্তুত বাহ্য দৃষ্টিতে গরীবের কিছুটা উপকার থাকা সত্ত্বেও ঋণভিত্তিক উপহার-প্রথা একটা ঘৃণিত রেওয়াজ। সেক্ষেত্রে উপকারবিহীন অন্যান্য রেওয়াজের আলোচনা না করাই উত্তম। এমনিতর প্রতি পদে পদে আমরা অভিনব প্রথা আবিষ্কার করে নিয়েছি যার অবর্তমানে শাদী-বিয়েই অচল। এসব প্রথার অন্তরালে পার্থিব ক্ষতি নির্দেশ করাটা আমার দায়িত্ব নয়, তা সত্ত্বেও গরীবের উপকার বিবেচনায় আনুষঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত করে দিচ্ছি। মুসলিম জাতির ওপর আপতিত বিপর্যয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব রেওয়াজ-প্রথারই ফল। কেননা সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য বিবর্জিত মুসলমানদের আয়-ব্যয়ের হিসাব কারো অজ্ঞাত নয়। ফল দাঁড়িয়েছে এই—আজ একজনের জমি বন্ধক, কালকে বাস্তু-ভিটায় ঋণের দায়ে ক্রোক নোটিশ, পরশু হয়তো দেখা গেল অলংকারপাতি, মালপত্র নিলামে চড়েছে অথচ এহেন পরিস্থিতিতেও প্রথা পালনে মিয়া সাহেবদের ঠাট কত! কেউ কেউ জবাব দেয়—আমাদের তো সামর্থ্য আছে, ঋণ লাগে না। জবাবে বলব—প্রথমত একথা স্বীকৃত নয়। কেননা প্রত্যেক স্তরের লোকই সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে ব্যয়ের অংক কষায় অভ্যস্ত। ফলে ঋণ গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, যদি স্বীকার করে নেয়াও হয় যে, তাদের ঋণের দরকার পড়ে না, তা সত্ত্বেও গরীব প্রতিবেশীর ওপর তাদের দৃষ্টি রাখা উচিত যে, আমাদের এ জাতীয় কার্যকলাপে উৎসাহিত হয়ে গরীবরা সর্বহারার দল ভারী করবে। তাই আমরাই বিরত থাকি। তৃতীয়ত, পার্থিব ক্ষতির আশংকা যদি না-ও থাকে, তবু অন্তত গুনাহ্র ভয়ে তো বর্জন করা উচিত। তদ্রূপ শোক প্রথাও নিছক সুনামের উদ্দেশ্যেই করা হয়, আল্লাহ্র জন্য নয়। কেননা আল্লাহ্র জন্য করা হলে বাহ্যিক আড়ম্বর এবং কষ্টকর প্রদর্শনীর আয়োজন ব্যতীত গোপনে করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। তাই বোঝা যায় একান্ত খ্যাতির জন্যই এ সবের আয়োজন। কথাটা এভাবেই পরীক্ষা হতে পারে—কোন রুসুমপন্থীকে যদি বলা হয়—এ অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তুমি পঞ্চাশ টাকা গোপনে দশ জন গরীবকে দান কর। কিছুতেই সে রাযী হবে না। বরং মনে মনে চিন্তা করবে বেশ তো মৌলভী সাহেবের রায়, গাঁট থেকে পঞ্চাশের অংক উড়ে যাবে অথচ কেউ তা জানবেই না, পঞ্চাশটি টাকাই তাহলে ভেস্তে যাওয়ার পালা।

বন্ধুগণ! এই হলো সমাজের অবস্থা। এর পরও বলা হয় মৌলবী সাহেব সওয়াব পৌঁছাতে পর্যন্ত বারণ করছেন। তাহলে বল—সওয়াব নিজেই কখন পেলে যে অপরকে পৌঁছাবে? আমি যথার্থই বলছি যে, আলিমগণ সওয়াব পৌঁছাতে নিষেধ নয় বরং তা অর্জন এবং পৌঁছানোর যথার্থ উপায় নির্দেশ করেন মাত্র। আর সে পন্থা হলো—ডান হাতে দাও বাঁ হাতও যেন জানতে না পায়, নিজের নির্দিষ্ট অংশ থেকে দাও, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় দান করবে না, যাতে বালেগ নাবালেগ সকলে সমভাবে অংশীদার। দিতে চাইলে ভাগ করে নিজস্ব অংশ থেকে দাও। একত্র থাকাবস্থায় মোটেই দেবে না। এই হলো—সওয়াব হাসিলের সঠিক পন্থা। কিন্তু আপনাদের আবিষ্কৃত পন্থা সওয়াব লাভের উপায় নয়। মানুষ এক সাথে সুনাম ও সওয়াব দু'টিই লাভ করতে চায়, কিন্তু প্রদর্শনীতে সওয়াব কোথায়, এটা তো বরং আযাবের উন্মুক্ত দ্বার মাত্র। শেখ সাদী (র) বলেছেন ঃ

کلید در دوزخ است آن نماز
که در چشم مردم گذاری دراز

—লোক দেখানো, প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে প্রলম্বিত নামায মূলত জাহান্নামের দরজার চাবি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত কয়েকটি প্রথার বাস্তব নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো, অন্যগুলো এর উপর কিয়াস করা যেতে পারে। এবার আমার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিভিত্তিক কয়েকটি প্রমাণ লক্ষ করুন। স্বীয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর বিয়ে দ্বারা মহানবী (সা) আদর্শ স্থাপন করেছেন, বিয়ে-শাদী কোন্ পন্থায় সম্পাদিত হওয়া উচিত। অনুরূপ রাসূল-তনয় হযরত ইবরাহীম (রা)-এর মৃত্যুতে শোক পালন দ্বারাও শোক প্রকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এরপরও মনগড়া আমল এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করা হলে অনুকরণ কোথায় হলো, এতে নবীর ভালবাসার কি প্রমাণ রইল? অতঃপর আমাদের সমাজ-নামায সবই যেখানে শরীয়ত বিরোধী, এর সাথে সম্পর্কহীন এমতাবস্থায় কে বলতে পারবে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে আমাদের ভালবাসা সজীব-সতেজ। (আসারুল মুহাব্বত, পৃষ্ঠা ১৩)। (২) অর্থ সমাগমের উদ্দেশ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে তারা ইসালে সওয়াবের এমন পন্থা উদ্ভাবন করে নিয়েছে তাদেরকে ছাড়া এর সন্ধান পাওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। যেমন প্রথম قل هو الله পড়তে হবে, পরে تَبَارَكَ الَّذِىْ পরে এটা তারপর ওটা, কোন্ সূরায় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হয়, কোন্টার্তে হয় না ইত্যাদি। এগুলি এমন বিষয় মাওলানারা পর্যন্ত যার ইশারা-ইঙ্গিত ঠাওর করতে অপারগ। একমাত্র আবিষ্কারকরাই জানে এ সবের

মর্মকথা। তাই সাধারণ লোক সেদিকেই ছোটে। এভাবে তাদের দুই-দশ কড়ি আমদানির পথ হয়। এর মধ্যে তথাকথিত পীর সাহেবদের বিস্ময়কর সূক্ষ্ম চালাকি লক্ষণীয়। ঘটনা শুনুন, জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার কাছে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বলল—তখন আমি কোন এক থানায় কর্মরত। এক ব্যক্তি এই মর্মে থানায় কেস ডায়েরী করাতে আসল যে, কে জানি তার 'ফাতিহা' চুরি করে নিয়ে গেছে। শুনে তো আমি বিস্ময়ে হতবাক, বলে কি! ফাতিহা চুরির কি অর্থ ? তাকে ব্যাপারটা খুলে বলতে বলায় সে বলল, তদন্তে চলুন, জানতে পারবেন। অবশেষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যা জানতে পারলাম তা নিম্নরূপ। বছরান্তে এক পীর সাহেব অত্র এলাকায় আসেন এবং এক বছরের জন্য ফাতিহা পাঠ করে নলের ভেতর আবদ্ধ করে যান—দরকার মত তা থেকে একটু একটু ঝেড়ে নিলেই হলো। নল প্রতি মাশুল ধার্য করা থাকে। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তির নিকট পয়সা ছিল না অথচ তার ফাতিহার দরকার, কাজেই সে অভিযোগকারীর গোটা নলটাই চুরি করে নিয়ে যায়। এই হলো কেসের বিবরণ। এর চাইতেও বিস্ময়কর ঘটনা মাওলানা গাংগুহী (র) বর্ণনা করতেন। কোন মসজিদে এক মোল্লা থাকত, সবাই তার দ্বারাই নিয়াস-ফাতিহা ইত্যাদি করিয়ে নেয়। একবার তার অনুপস্থিতিতে জনৈকা বৃদ্ধা খানা নিয়ে মসজিদে হাযির হয়। ঘটনাচক্রে সেখানে তখন এক বিদেশী মুসাফির বসা ছিল। বৃদ্ধা মনে মনে ভাবল, সওয়াবই তো উদ্দেশ্য, যাক মুসাফিরকেই দিয়ে দেই। খানা রেখে মসজিদের দরজায় মাত্র পা রেখেছে অমনি ইমাম সাহেব হাযির। জিজ্ঞেস করল, বুড়ি মা কি মনে করে এদিকে ? বৃদ্ধার মুখে ঘটনা শুনে শীঘ্র মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম সাহেব লাঠি হাতে হৈ-হুল্লোড় করে বিছানাপত্র ঝাড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে দুড়ুম করে মেঝেতে পড়ে গেল। শোরগোল শুনে মহল্লাবাসী জমা হয়ে জিজ্ঞেস করল, মোল্লাজী ব্যাপার কি ? বলতে লাগল, ভাইসব! দীর্ঘদিন যাবত আমি এখানে আছি, সব মুর্দাকে আমি চিনি, সওয়াব আমি তাদেরকেই পৌঁছাই। নতুন লোক সওয়াব না জানি কোথায় বখশিয়েছে। আর তো এখানকার সকল মুর্দার আমাকে ধরেছে। ছাড়াবার বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু একা আর কত কুলায়। অবশেষে ক্লান্ত দেহে লুটিয়ে পড়েছি। দু-চার বার এরূপ ঘটলে আমি মরেই যাব। তাই বিদায় নেয়াই আমার উচিত। লোকেরা বলল, মোল্লাজী আর কোথাও যেতে হবে না, সবকিছু আমরা আপনাকেই পৌঁছাব।

মোটকথা, স্বার্থকেন্দ্রিক এসব প্রথার বিনিময়ে যখন কিছুই মিলবে না তখন পৃথক ঠিকানায় ফাতিহা পৌঁছানো তাদের নিজেদের কাছেই বেতাল ঠেকবে। এভাবেই

এসব প্রথা সমাজ থেকে নির্মূল হতে থাকবে। এসব প্রথা দীনের অঙ্গবহির্ভূত হওয়ার এটাও একটা নিদর্শন। কারণ শরীয়তের মূল বিষয় সর্বদা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। তাই দেখা যায়, কেবল শরীয়তসিদ্ধ বিষয়ই যথাস্থানে বাকি থাকে। দেখুন, "কি মিয়া এখন সেসব প্রথা পালিত হয় না কি কারণে ?" আমার এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকজন বলল—ক'জনের চল্লিশা পালন করব, মড়ক মহামারীর যা অবস্থা চল্লিশা-কুলখানি তো নিত্যদিন লেগেই আছে। আমি বললাম ঃ এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এসব প্রথা-পার্বণ শরীয়ত বহির্ভূত জিনিস। মহামারী সত্ত্বেও তো এমনটি হয়নি যে, কোন মুর্দার নামায-কাফন ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। অথচ অনেকেরই কুলখানি-চল্লিশা পালিত হয়নি। মোটকথা, দীনের কাজেও নানান প্রথা আবিষ্কার করা হয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের আশা সুদূরপরাহত।

—ইস্‌সানুত্‌তাদবীর, পৃষ্ঠা ১৯

(৩) আরো একটি উল্লেখযোগ্য প্রথা হলো—বরযাত্রা, যা মূলত হিন্দুদের আবিষ্কার। এর পটভূমিকা হলো—পূর্ববর্তী যমানায় রাস্তা-ঘাট নিরাপত্তাহীন ছিল বিধায় নববধুর হিফাযতের উদ্দেশ্যে রক্ষী হিসেবে একদল লোকের প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্যে পরিবার প্রতি একজন করে লোক বাছাই করা হতো যেন কোন অঘটন ঘটলে প্রতি পরিবারের মাত্র একজনই বিধবা হয়। কিন্তু এখন তো নিরাপত্তা বিরাজমান, তাই এত লোকের কি প্রয়োজন ? আর কোন আশংকা যদি সত্যি থাকে, তবে কনেকে এভাবে অলংকার সজ্জিত করার কি অর্থ ? যদি বলা হয়—বরযাত্রার পিছনেও নিরাপত্তামূলক কল্যাণ চিন্তা নিহিত আছে। তবে এর কি জবাব যে, বরযাত্রীরা যায় তো দল বেঁধে, কিন্তু আসার পথে যে যার পথে ফেরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। প্রায়শ বৌ নিয়ে বেহারাকে একাই ফিরতে দেখা যায় কেন ? বাস্তব কর্ম দ্বারা প্রমাণ তো এটাই হয় যে, বৌ-রক্ষা উদ্দেশ্য নয়, নিয়ত হলো—সামাজিক প্রথার অনুশীলন এবং সুনামের চিন্তা। তদুপরি সাধারণত বৌ নিয়ে রওয়ানা হয় যখন বেলা তখন ডুবে ডুবে। আর মা-বাপও এহেন পড়ন্ত বেলায় মেয়ে বিদায় করে। সম্ভবত তাদের ধারণা, মেয়ে কি আর এখন আমাদের আছে ? তা-না হলে এখন তো আরো বেশি করে হিফাযতের দরকার। কেননা কন্যা এখন গয়না-গাটি জড়ানো, পথে আল্লাহ্ জানে কোন বিপদে পড়ে কি না।

বন্ধুগণ! দীন ছেড়ে দিলে মানুষের বিবেকও বিদায় নেয়। সাধারণত মানুষের ধারণা বিবাহিতা মেয়ের তুলনায় কুমারী মেয়ের হিফাযত বেশি প্রয়োজন। এ ধারণা হিন্দু সমাজ থেকে উদ্ভূত। এর রহস্য হলো—তারা মনে করে কুমারী মেয়ের চরিত্রে

কোন অবাঞ্ছিত কথা উঠলে সমাজে কলংক রটে, কিন্তু বিয়ের পর হলে সে ভয় নেই। কেননা তার স্বামী আছে, সে-ই বুঝবে। কিন্তু এ ধারণা মূর্খতাপ্রসূত। বিবেকবুদ্ধির আশ্রয় নিলে দেখা যাবে কুমারী মেয়ের তুলনার বিবাহিতা মেয়ে হিফাযতের অধিক মুখাপেক্ষী। কারণ কুমারীর স্বাভাবিক লজ্জাই তাকে অপকর্ম থেকে নিরাপদ রাখে। পক্ষান্তরে বিয়ের পর বিবাহিতার জন্মগত লজ্জার আবরণ ছিন্ন হয়ে মানসিক প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। তাই তার চারিত্রিক নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা থাকা চাই। দ্বিতীয়ত কুমারী মেয়ের স্বাভাবিক লজ্জা ছাড়া কলংকের ভয় অধিক। কিন্তু বিয়ের পর সে বালাই থাকে না এবং তার দুষ্কর্ম স্বামীর আড়ালে ঢাকা দেয়া সম্ভব। তাই সে অপেক্ষাকৃত নির্ভয় হওয়ার কারণে কুমারীর তুলনায় তার মন-মানসিকতা কুকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সহজতর। কাজেই তার হিফাযতই বেশি হওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপ এর বিপরীত। কারণ মানুষ আজকাল মান-সম্মান অপেক্ষা দুর্নামের গুরুত্ব বেশি দেয়। কাজেই এর আশংকায় বিবাহিতার তুলনায় কুমারীর মান রক্ষায় অধিক তৎপর হয়। তারা মনে করে হিফাযতের সময়কাল বিয়ের আগে নির্ধারিত । এ ধারণার বশবর্তী হয়েই পিতা-মাতা অসময়ে মেয়ে বিদায় করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু পাত্রপক্ষ না হোক অন্তত পাত্রীপক্ষের তো এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। এই হলো বরযাত্রার তাৎপর্যগত ত্রুটি। আমার দৃষ্টিতে এসব ত্রুটি স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে অবশ্য আমিও বরযাত্রায় শরীক হয়েছি। কিন্তু বুঝে আসার পর এখন আমি এ প্রথা হারাম মনে করি। কারো বুঝে না আসলে আমার রচিত 'ইসলাহুর রুসুম' পুস্তিকা দেখে নিতে পারে। এসব রেওয়াজ-প্রথা নিষেধ করার কারণেই জনৈক গ্রাম্য লোক আমায় বলে বসে—শুনলাম আপনার মাসআলা নাকি কড়া খুব বেশি। বললাম, মাসআলা এমনি হওয়া উচিত যাতে সতর্কতা বেশি থাকে। বস্তুত মাসআলা আমার কড়া ঠিক নয়; তবে আল্লাহ্ আমার কলম দ্বারা কোন কোন বিষয়ের অপকারিতা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যার প্রকাশে অন্যরা বিরত। কাজেই আমাকে কঠোর প্রাণের চিত্রিত করা হয়।

মোটকথা, বরযাত্রার উদ্দেশ্য যদি কনের হিফাযত করাই হয়; তবে তাদেরকে একা ফেলে সঙ্গীরা যার যার পথ ধরে কেন ? কেউ হয়তো বলতে পারে—ভয়ের কি আছে বর তো সাথেই। বলব—বাস্তবের সাক্ষী কিন্তু এর বিপরীত। কেননা আজকালের দুলা মিয়াদের যে সাহস, রাস্তায় চোর-ডাকাতের আক্রমণ হলে সবার আগে সে-ই ডুলিতে লুকায়। সময় সময় দেখা যায় মাত্র কয়েকজন সাথীসহ বর-কনে পথে কোন গ্রামে রাত কাটাচ্ছে আর বরযাত্রীরা আগেই চলে আসছে। অথচ তারা

গিয়েছিল হিফাযতের উদ্দেশ্যে। অতএব বর্তমান পরিবেশে বরযাত্রা প্রথা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। —দাওয়াতে আবদিয়ত, ষষ্ঠ খণ্ড, আযলুল জাহেলিয়াত, পৃষ্ঠা ৫৫

**প্রশ্ন ঃ ১৭. স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বিবাহে স্বামীর পরিবারের লোকদের অধিকার স্বীকৃত নয়।**

কোন কোন মুসলিম সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নীকে নিজেদের অধিকারভুক্ত মনে করা হয়। অর্থাৎ মাতা-পিতা কর্তৃক বিধবা কন্যার বিয়ের ব্যবস্থাপনা অস্বীকার করে দেবর-শ্বশুরের মালিকানাভুক্ত মনে করা হয়। এমনকি বিধবার আত্মমালিকানা পর্যন্ত স্বীকার করা হয় না যে, স্বেচ্ছায় সে কোথাও বিয়ে বসবে। যেমন পিতার ইচ্ছা কন্যাকে আমি অন্যত্র বিয়ে দেব কিন্তু শ্বশুর তাতে বাদ সাধে যে—না, বিয়ে আমার ছোট ছেলের সাথেই দেব আর বৌমাকে বাড়িতেই রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতার মতামত স্পষ্টত উপেক্ষা করা হয়। সুতরাং এক স্থানে দেখা গেছে জনৈক মহিলা তার বিধবা পুত্রবধুকে নিজের বাচ্চা ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। এখন পরিতাপের বিষয় হলো—মেয়েদের বিবেক তো গেছেই, সাথে সাথে পুরুষদের জ্ঞানও হারিয়ে গেছে। তারাও এর গুরুত্ব বিবেচনা করতে নারাজ। কাজেই তখন নারী জাতিকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করা অবৈধ ঘোষণাকারী আয়াত আমি তিলাওয়াত করি, যাতে বলা হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا - وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَّعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

—হে মু'মিনগণ! নারীকে বলপূর্বক মীরাসী সম্পদ বানিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, আর তাদেরকে তোমরা নিজেদের প্রদত্ত সম্পদ করায়ত্ত করার উদ্দেশ্যে আটক করো না, অবশ্য তারা যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। (তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা) তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তাদেরকে যদি পছন্দ না হয় তাহলে হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অপ্রিয় কিন্তু আল্লাহ্ তাতে অধিক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

আয়াতের মর্ম লক্ষ করুন। দেখুন কুরআন এ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কি-না ? লক্ষণীয়, আয়াতে বর্ণিত كرها শব্দ দ্বারা সমাজের বাস্তব চিত্রের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে মালিকানাভুক্ত হওয়াটা নারীদের পছন্দনীয় হতে পারে

না। আর যদি ব্যতিক্রমধর্মী কারো কারো এমনটি হয়ও তবু স্বাধীন নারীকে মীরাসে পরিণত করা জায়েয নয়।

এ পর্যায়ে কেউ কেউ বলে—আমরা তো তার স্বীকারোক্তি আদায় করে নিয়েছিলাম। আমি বলব—এটা বাস্তবের চিত্র নয় বরং নিছক লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। কেউ যেন বলতে না পারে যে, সম্মতি ছাড়াই মেয়ের বিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ বিধবার বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য মৌখিক সম্মতি প্রদান অনিবার্য।

বাস্তবে এমনও দেখা যায়, জিজ্ঞাসা ছাড়াই বিয়ে দেয়া হয়েছে। নানুতায় একবার জনৈকা বিধবার সম্মতি ব্যতীতই বিয়ে পড়িয়ে বলপূর্বক তাকে বরযাত্রীদের সাথে দেওবন্দ পাঠিয়ে দেয়া হলো। বলে দেয়া হলো—সেখানে পৌঁছে সম্মত করিয়ে নেবে। আমাদের এখানে ইদ্দতের মধ্যেই এক মেয়ের বিয়ে পড়ানো হলো। আমি যখন বললাম, তোমরা একি দুষ্কর্ম করলে? তারা বলল—আসলে বিয়ে তো নয়, একটা চাপ রাখা হলো মাত্র যাতে অন্যত্র বিয়ে বসতে না পারে। কিন্তু ইদ্দত শেষে হতভাগারা আর বিয়েই পড়াল না। অতঃপর লোকেরা মন্তব্য করতে লাগলো যে, এ পাপের দরুনই বসন্ত, মহামারী দেখা দিয়েছে। ঠিকই বলেছে—হালালের আবরণে এভাবে হারাম কাজ সমাজে চলতে থাকলে মহামারী আসবেই না কেন?

বন্ধুগণ! এ পর্যায়ে কবিতার ছন্দ লক্ষ করুন। কবি বলেছেন—

از زنا افتد وبا اندر جهان

—ব্যভিচারের ফলে সমাজে মহামারী দেখা দেয়ই।

কেউ কেউ নামকাওয়াস্তে মুখে বলিয়ে নেয় বটে কিন্তু সেটাও তো অন্যায়। কেননা নিজেদেরকে হর্তাকর্তা, মালিক মনে করেই তারা বিধবার স্বীকারোক্তি আদায় করে নেয়। তাতে মাতা-পিতার মালিকানা পর্যন্ত স্বীকার করা হয় না। অথচ আল্লাহ্-রাসূলের পর সর্বাগ্রে পিতা-মাতাই আনুগত্যের দাবিদার। (ঐ, পৃষ্ঠা ৫৮)

**প্রশ্ন ঃ ১৮. মেয়েকে কক্ষবন্দী করার প্রথা অবৈধ।**

আমাদের সমাজে আরেকটা নিপীড়নধর্মী প্রথা চালু রয়েছে যে, প্রাক-বিবাহকালে কনেকে এক কোঠায় বন্দী করে দেয়া হয়। চলতি কথায় যাকে বলা হয় "কনের নির্জন কক্ষবন্দী।" অর্থাৎ বিয়ের আগে আলো-বাতাসহীন কক্ষে কনেকে আবদ্ধ রাখা হয়। এমতাবস্থায় কারো সাথে কথা বলা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাওয়া ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ থাকে। প্রস্রাব-পায়খানাতে সে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমনকি পিপাসায় পানি চাওয়া পর্যন্ত সে হতভাগীর জন্য নিষিদ্ধ। বিবাহোত্তর সময়ে নববধু কারো সাথে দু' কথা বলে ফেলল কিংবা মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল অমনি চার দিকে হৈ চৈ পড়ে

গেল—হায়! হায়! কি নির্লজ্জ সময় আসল রে বাবা! একেবারে ঘোর কলিকাল। এসব তো হলো উক্ত প্রথার নির্যাতনী উপহার। কিন্তু শুধু কি তাই ? নিজ মুখে পানি চাওয়াও নতুন বৌ-এর অপরাধ! তাই সে নামায পড়বে ওযূর উপায় থাকলে তো ? পরিবারের মুরুব্বীরা বৌ-এর নামাযের খবর নেবে কি, নিজের নামাযেরই তো খবর নেই। তাই দুনিয়া তো গেলই, আখিরাতও বিনাশ। অথচ মরণকালেও নামায পড়া থেকে অব্যাহতি নেই। সুতরাং কিতাবে আছে নৌকাডুবির ফলে একটি লোক ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু এহেন ডুবন্ত অবস্থায়ও সময় হলে নামাযের নিয়ত বাঁধা তার ওপর ওয়াজিব, পরে সে বাচুক কিংবা ডুবুক। এই তো হলো নামাযের প্রতি তাকীদ ও গুরুত্ব। কিন্তু প্রথার ফেরেচক্রে তাও গেল। মানুষকে পশুর স্তরে নয় বরং জড় বস্তুতে পরিণত করে এহেন অনাচার বিদ্যমান থাকাবস্থায় শরীয়ত কিংবা বিবেক কোন্ যুক্তিতে এ প্রথা বৈধ হতে পারে ? মেয়ের পানাহার বন্ধ রাখা হয় কেবল এ যুক্তিতে যে, অল্প মাত্রায় খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তোলা না হলে শ্বশুরালয়ে পানাহারের দরুন মেয়েকে পায়খানা করতে হবে যা শালীনতার পরিপন্থী। স্থান বিশেষে এমনও দেখা যায় অনাহারের দরুন মেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ। বস্তুত দীনবর্জিত হলে বিবেকও লোপ পেয়ে যায়। বিয়ের প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতার পরিধি ব্যাপক। এর যে কোন অংশ শরীয়তবিরোধী তো বটেই, বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী।

—মুনাযাআতুল হাওয়া, পৃষ্ঠা ৬২, দাওয়াতে আবদিয়ত, সপ্তম খণ্ড

**প্রশ্ন ঃ ১৯. চল্লিশা ইত্যাদির খানা নিছক আত্মীয়দের মনতুষ্টির ফলশ্রুতি।**

দাওয়াতের আয়োজন কার কত বিপুল, শুধু এটা দেখার উদ্দেশেই চল্লিশার অনুষ্ঠান। শোকের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষণ তো এটাই যে, সওয়াবের উদ্দেশেই এ ব্যবস্থাপনা। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে নির্জনে ডেকে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দান করাটাই অধিক সওয়াবের কাজ আর এটাই ইসলামের বিধান অথচ ধনী ব্যক্তিরাই তোমাদের দাওয়াতী মেহমান। কাজেই এ অনুষ্ঠানে বরাদ্দকৃত টাকা তোমরা অমুক মাদরাসায়, অমুক মসজিদে কিংবা অমুক সম্ভ্রান্ত অভাবী লোকটিকে গোপনে দান করে এস এবং এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে বখশিয়ে দাও। তখন লক্ষ করুন তার মনের গতি যে কি হয়। সে এই বলবে—সুবহানাল্লাহ্! টাকাও গেল অথচ কেউ জানতেও পেল না! এখন বলুন! এটা সুস্পষ্ট 'রিয়া' (প্রদর্শনী) কি-না। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মূলত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই এসব আয়োজন-অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় সওয়াবের আশা করা বৃথা।

সুতরাং কর্তাই যেখানে শূন্য হাত, সেক্ষেত্রে মুর্দাকে সে পৌঁছাবে কি ? কারণ সওয়াব পৌঁছানোর অর্থ এটাই যে, সৎকাজের বিনিময়ে তোমার প্রাপ্ত সওয়াব অপরকে তুমি দান করে দিলে। কিন্তু তোমার নিজের খাতাই যেখানে শূন্য সেখানে পরকে বিলাবে কি ? এ ব্যাপারে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। রামপুরের জনৈক ব্যক্তি এক ভণ্ড পীরের মুরীদ হয়। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল—বল পীর সাহেবের সান্নিধ্যে কি ফয়েয হাসিল হলো ? বেচারা ছিল সরল প্রাণের, বলল—ভাণ্ডই যেখানে শূন্য সেখানে লোটায় পানি পড়বে কোত্থেকে ? সওয়াবেরও একই অবস্থা। আমলকারীর নামে সওয়াব প্রথম জমা হবে, তবেই না অপরকে সে বিলাবে। সে নিজেই যখন বঞ্চিত তাহলে অন্যজনকে সে দেবেটা কি ? সুতরাং এসব শুধু প্রথা আর প্রদর্শনীর অনুশীলন এবং আত্মীয়ের তুষ্টি সাধন ছাড়া কিছুই নয়। পরিণামে কেবল অর্থের অপচয়। কেউ কেউ মুখে এ কথা স্বীকার পর্যন্ত করে থাকে।

'কীরানা'তে জনৈক গোয়ালা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পুত্র হাকীমকে গিয়ে ধরেছে, হাকীম জী! এইবার অন্তত কোনমতে আমার পিতাকে সারিয়ে দিন। বুড়ার মরার চিন্তা তো করিনা কিন্তু আজকাল চালের যে দর, বুড়া মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত খাওয়ানোই সমস্যা। সে ছিল সরল-সোজা, সত্য কথা মুখের ওপর বলে দিয়েছে। আমরা মর্যাদাবান কি-না, তাই মুখে তো বলি না কিন্তু অন্তরে সবার একই ভাব। এ তো গেল যারা খাওয়ায় তাদের অবস্থা। কিন্তু এ উপলক্ষে দাওয়াত যারা খায় তারা চরম নির্লজ্জ। এহেন অবস্থায়ও সমবেদনার পরিবর্তে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের ওপর উল্টো বোঝা চাপানো হয়। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি ঘটনা বর্ণনা করে যে, "বুলন্দশহর" জিলায় জনৈক বিত্তশালী ধনী ব্যক্তি মারা যায়। চল্লিশতম দিনে তার সব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হাতী-ঘোড়া চড়ে প্রথা পালনের উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়। ধনীপুত্র যথারীতি সবার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা নেয় এবং অতিথি-অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্টমানের খাবার প্রস্তুত করে। খানা পরিবেশনের পর সবাই দস্তরখানে সমবেত হলে ধনীপুত্র দাঁড়িয়ে এই বলে বক্তব্য রাখল ঃ সমবেত অতিথিবৃন্দ! খানার পূর্বে আমার একটি কথা শুনুন, অতঃপর খাওয়া শুরু করুন। এ মুহূর্তে আপনাদের এখানে একত্রিত হওয়ার কারণ কারো অজানা নয় যে, পিতার ছায়া আমার ওপর থেকে বিদায় হওয়ায় আমি এখন শোকসাগরে নিমজ্জিত। তাই আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই আপনাদের আগমন। তাহলে সমবেদনা কি এরি নাম যে, সন্তাপ-পীড়নে তো আমার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ আর আপনারা হাত গুটিয়ে বসে গেলেন সুস্বাদু-সুপেয় খাদ্য খেতে। লজ্জার কি আপনাদের বালাই নেই ? এখন

খানা শুরু করুন। কিন্তু এ অবস্থায় খাবে কে ? গণ্যমান্য সবাই উঠে গিয়ে একস্থানে পরামর্শের জন্য বসে গেল যে, চল্লিশার এ প্রথা বাস্তবিকই উঠিয়ে দেয়া জরুরী। অবশেষে এ প্রস্তাবে সবাই একমত হয়ে দস্তখত করে এবং সমস্ত খানা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। বস্তুত চিন্তা করলে দেখা যায় আত্মীয়-স্বজনদেরকে নিয়ে এ উপলক্ষে আয়োজিত খানা এমন ঘৃণিত যে, এর আয়োজনকারীর অহেতুক পরিশ্রম আর আমন্ত্রিতদের লজ্জাহীনতা ব্যতীত এর সারবত্তা বলতে কিছুই নেই। অথচ লোকদের অভিযোগ হলো—আলিমরা ইসালে সওয়াব থেকে মানুষকে নিষেধ করে। কিন্তু বন্ধুগণ! ইসালে সওয়াব থেকে তো কেউ নিষেধ করছে না। বরং নিষেধ হলো অনিয়ম ও নীতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপ থেকে। চিন্তা করুন, কেউ কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে নামায পড়লে নিষেধ করা হবে কি হবে না ? আন্তরিকতা, সওয়াবের উদ্দেশে এবং নিষ্ঠা ও শরীয়তসম্মতভাবে কেউ আমল করলে তাকে বাধা দেয় সাধ্য কার ?

—আদ্‌দীনুল খালিস, পৃষ্ঠা ৪৫

**প্রশ্ন ঃ ২০. মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতিসমূহে বর্তমানে সীমালংঘন করা হচ্ছে, ঈমান ব্যতীত এসব কল্যাণকর নয়।**

এক ঃ মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতি সম্পর্কে অন্যান্য বিদআতের ন্যায় বর্তমানে সীমালংঘনজনিত একই আচরণ তথা একে ঈদ উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোক এমনকি কোন কোন তালেবে ইলম পর্যন্ত সন্দিহান। তারা মনে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোর্তা মুবারকের যিয়ারত বরকতের বিষয়। কাজেই তা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা দূষণীয় নয়। জালালাবাদের জনৈক মাদরাসা ছাত্র একবার তার দোকানে বসেই কোর্তা মুবারক যিয়ারতের অনুমতি চাইলে আমি তাকে নিষেধ করলাম। উল্লেখ্য, তার দোকানের পাশেই পুণ্য জামা- রক্ষিত স্থান অবস্থিত। আমার নিষেধের কারণ এই ছিল যে, উরস-উৎসবের ন্যায় এর জন্য মেলা বসানো হতো। এ উদ্দেশে নির্দিষ্ট তারিখে মানুষকে দাওয়াত দেয়া হতো। দূর-দূরান্ত থেকে নারী-পুরুষ একত্রিত হতো। এতে এমন সব লোকও উপস্থিত হতো যারা নামায পর্যন্ত পড়ে না। কোর্তা-মুবারকের মর্যাদা মহানবী (সা)-এর রওযা মুবারকের সমকক্ষ হতে পারে না। অথচ সে রওযা পাক সম্পর্কেই হাদীসে নিষেধ বাণী ঘোষিত হয়েছে ঃ

لا تتخذوا قبرى عيدا

—আমার কবরকে তোমরা ঈদ উৎসবে পরিণত করো না।

অবশ্য মিলাদুন্নবীর ন্যায় এতেও রূপান্তর ঘটেছে কিংবা ঘটেনি কোনটাই নিশ্চিত বলা যায় না। যে কথা অন্তরে নেই তা মুখে উচ্চারণ না করাই উত্তম। রওযা ও কুর্তা

এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যের উপাদান এখানেও বর্তমান রয়েছে। তা হলো—কুর্তা মুবারক পবিত্র শরীর মুবারকের সাথে এ মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু রওযা পাকের সাথে তা এখন রয়েছে। এ কারণেই মহানবী (সা)-এর কুর্তা মুবারককে কেউই কবর অপেক্ষা আফযল বা সম্মানিত বলেননি। সুতরাং কবর শরীফকে ঈদে পরিণত করা যে ক্ষেত্রে হারাম সে ক্ষেত্রে জামা মুবারককে ঈদে পরিণত করা কি করে জায়েয হতে পারে ? কোথাও কোথাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র কেশগুচ্ছ এখনো বর্তমান রয়েছে, সেগুলোকেও ঈদে পরিণত করা জায়েয নয়। কেশ মুবারক দেহের অংশ, এ কারণে দৃশ্যত তার মর্তবা কবর অপেক্ষা অধিক হওয়ার কল্পনা স্বাভাবিক। কিন্তু কবরের সাথে দেহের উপস্থিত সান্নিধ্যের ফযীলত ও প্রাধান্য বিদ্যমান যা পুণ্য কেশের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এ কারণে উভয়টি সমমর্যাদাভুক্ত যে, পুণ্য কেশ দেহের অংশ কিন্তু উপস্থিত সান্নিধ্য নেই আর কবর শরীরের অংশ নয় কিন্তু দেহের স্পর্শ বর্তমান। সুতরাং উভয়টি এখন সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। আর পরস্পর সমপর্যায়ের একটি দ্বারা অপরটির হুকুম জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব لا تتخذوا قبرى عيدا (আমার কবরকে তোমরা ঈদের উৎসবে পরিণত করো না) হাদীসের আলোকে পবিত্র কেশ মুবারককে ঈদ-উৎসবে পরিণত করা হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়। এটা মহানবী (সা)-এর চরম ভাষালংকারপূর্ণ বাক্যের পরিচায়ক যে, তিনি কবর উল্লেখ করেছেন, যদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র, কেশ ইত্যাদির হুকুম স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবগত হওয়া যায়। এ ছাড়া সাহাবা কিরাম এবং সলফে সালিহীনের নিকট মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতিচিহ্ন আমাদের অপেক্ষা পরিমাণে অধিক ছিল। তদুপরি তাঁরা পুণ্য কাজে আমাদের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা এ ব্যাপারে উৎসবের পন্থা অবলম্বন করেননি। তাই এটা কোন কল্যাণধর্মী বৈধ কাজ হলে সলফের মধ্যে এর কোন না কোন সূত্র অবশ্যই বর্তমান থাকার কথা। এখন প্রশ্ন থাকে—সাহাবীগণের মধ্যে ঈদ-উৎসবের ন্যায় গণসমাবেশ ছিল না তাহলে মহানবী (সা)-এর পুণ্যস্মৃতির সাথে তাঁদের আচরণ কিরূপ ছিল ? এ ব্যাপারে হুবহু শব্দ মুখস্থ রাখা কঠিন বিধায় এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস আমি কাগজে নোট করে নিয়েছি। এখন তা-ই বর্ণনা করছি।

হাদীস (১) ঃ

عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال فارسلنى اهلى الى ام سلمة بقدح من ماء وكان اذا اصاب الانسان عين او شئى بعث اليها مخضية لها فاخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تمسكه فى جلجل من فضة فخضخضت له فشرب منه قال فاطلعت فى الجلجل فرأيت شعرات حمراء -

—উসমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক পেয়ালা পানিসহ পরিবারের লোকেরা আমাকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার নিকট প্রেরণ করে। নিয়ম ছিল কারো চোখ ইত্যাদিতে কোনরূপ পীড়া দেখা দিলে হযরত উম্মে সালামার নিকট পানির পেয়ালা পাঠিয়ে দিত। মহানবী (সা)-এর এক গুচ্ছ কেশ তিনি রূপার নলে পুরে নিজের কাছে রেখেছিলেন। উক্ত পানির মধ্যে তিনি কেশ মুবারক চুবিয়ে দিতেন আর তা রোগীকে পান করানো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত নলটি আমি ঝুঁকে দেখলাম তাতে লোহিত বর্ণের কয়েকটি কেশ ছিল। —সহীহ্ বুখারী

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন সাহাবিয়ার নিকট নলের মধ্যে রক্ষিত পুণ্য কেশের সাথে আচরণ এই ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে এর ধোয়া পানি পান করানো হতো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিযাব সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত এই যে, তাঁর চুলে মাত্র পাক ধরেছিল, যাতে খিযাব বলে দর্শকের সন্দেহ হতো। তাছাড়া তিনি চুলে কখনো খিযাব ব্যবহার করেননি। কেননা মহানবী (সা)-এর বিশটি কিংবা এর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি চুল মাত্র শুভ্র বর্ণ ধারণ করেছিল।

হাদীস (২) ঃ

عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها انها اخرجت جبة طيالسية كسروانية لينة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما قبضت قبضتها كان النبى صلى الله عليه وسلم يلبس بها فنحن نغسلها للمرضى نستشفى بها -

—হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুই ফাড়ার মধ্যে রেশম খচিত তাইলিসানী, কেসরাভী একটি জামা বের করে বললেন—এই হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহৃত জামা যা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর আমি তা সংগ্রহ করেছি। মহানবী (সা) এটি পরিধান করতেন। এখন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে এটা ধুয়ে রোগীকে আমরা পানি পান করিয়ে থাকি। —সহীহ্ মুসলিম

হাদীস (৩) ঃ

ثم وعن انس قال النبى صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا

طلحة الانصاری فاعطاه اياه ثم ناول الشق الا يسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس -

—হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে আরাফা থেকে মিনা আগমন করে জামরা আকাবার নিকট পৌছেন এবং 'রমী' করেন। অতঃপর মিনায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অবস্থান স্থলে ফিরে এসে কুরবানীর পশু জবাই করেন আর ক্ষৌরকার ডেকে প্রথমে মাথার ডান দিক এগিয়ে দিলে সে তা মুণ্ডন করে। এরপর তিনি আবূ তালহা আনসারীকে ডেকে মুণ্ডিত কেশ তাকে দান করেন। অতঃপর ক্ষৌরকারকে মাথার বাঁ পাশ এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ মুণ্ডন কর, উক্ত অংশ সে মুড়িয়ে দিলে মুণ্ডিত এ কেশগুলিও তিনি আবূ তালহা আনসারীর হাতে অর্পণ করে বললেন ঃ এগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পবিত্র কেশ সাহাবীগণের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সাহাবীগণ পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কাজেই কোথাও পবিত্র কেশ পাওয়ার সংবাদ শোনামাত্রই তা অস্বীকার করা উচিত নয়। বরং বিশুদ্ধ সনদ সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে তার সম্মান করতে হবে। আর মিথ্যা হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলে নীরবতা অবলম্বন করাই উত্তম। অর্থাৎ স্বীকার-অস্বীকার কোনটাই না করা উচিত। সন্দেহযুক্ত ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে এ শিক্ষাই দান করে।

হাদীস (৪) ঃ

وعن ام عطية فی قصة غسل زينب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم وتكفينها انها قالت فالقی حقوه فقال اشعرنها اياه ـ فقال الشيخ فی اللمعات وهذا الحديث اصل فی البركة باثار الصالحين ولباسهم -

—উম্মে আতিয়া হযরত যায়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোসল ও কাফনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় লুঙ্গি মুবারক আমাদেরকে দিয়ে বললেন ঃ এটি সবার নীচে রেখে মরহুমার দেহের সাথে জড়িয়ে কাফন পরিধান করাও, এর বরকত যেন শরীরের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'লুমআতের' গ্রন্থকার শায়খ আবদুল হক (র) অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উক্ত হাদীস পুণ্যাত্মাগণের নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা বরকত হাসিল করার ভিত্তিস্বরূপ।

এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মৃত্যুর পর কাফনের সাথে স্মৃতিচিহ্ন জড়িয়ে দেয়াটাও পুণ্যস্মৃতি দ্বারা বরকত লাভের একটি উপায়। কিন্তু তাই বলে কুরআন এবং দোয়ার কিতাব কাফনের সাথে জড়িয়ে দেয়া জায়েয নয়। যেহেতু এর দ্বারা এসবের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। কারণ কুরআনের সাথে অপবিত্র নাপাক বস্তুর মিশ্রণ হারাম। আর কয়েকদিনের ব্যবধানেই মৃতের লাশের গলিতাংশ কুরআনের সাথে অবশ্যই জড়িয়ে যাবে। অনুরূপ বিভিন্ন দোয়া এবং স্থানে স্থানে আল্লাহ ও রাসূলের নামসম্বলিত কিতাবাদিও সম্মানযোগ্য। এ সবের শব্দ-বর্ণ অবশ্যই সম্মানের পাত্র। এমনকি জ্ঞান লাভের মাধ্যম হেতু সাদা কাগজও সম্মানের পাত্র। কোন কোন লোক সাদা কাগজে ফেরআউন-হামানের নাম লিখে তাতে জুতাপেটা করে। এটা অত্যন্ত গর্হিত আচরণ। তাদের তো নাগাল পেল না, শব্দের অসম্মান দ্বারাই বীরত্ব দেখানো হলো। মোটকথা, এত সব সত্ত্বেও পুণ্য স্মৃতিকে নির্ধারিত ঈদে পরিণত করা কোন বৈধ কাজ নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো—মহানবী (সা)-এর নিদর্শন বলেই এ সবের মর্যাদা। তাহলে হুকুমও তো তাঁরই নির্দেশ। একেও সম্মান দিতে হবে। এর মধ্যেও যে বরকত রয়েছে, তা অর্জন করা জরুরী। আলোচ্য রেওয়ায়েতসমূহের অন্তরালে "পুণ্যাত্মাগণের স্মৃতিচিহ্নের সাথে আচরণের রূপরেখা কি ধরনের ছিল ?" এ প্রশ্নের সমাধান নিহিত রয়েছে। এতে সীমা অতিক্রম না করে তদনুযায়ী আমাদের আমল করা কর্তব্য। কোন কোন লোক কোর্তা মুবারকের নামে মানত দ্বারা সীমালংঘনে প্রবৃত্ত হয়। অথচ ফকীহ্গণ এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কারণ মানত করা ইবাদত। আর সৃষ্টের অনুকূলে ইবাদত নিষিদ্ধ। ইবাদত একমাত্র আল্লারহ্ই জন্য নিবেদিত হতে হবে। বাহ্রুর রায়েক গ্রন্থে সৃষ্টের নামে মানত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এক জঘন্যতম হারাম, যা কার্যকর করা ওয়াজিব নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে মানতের জিনিস গ্রহণ করা, খাওয়া এবং তাতে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা অবৈধ ও নাজায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

—ওয়ায-আল্-হুবূর, পৃষ্ঠা ২১

দুই ঃ স্মৃতিচিহ্নের ভরসায় কারো পক্ষে আমল ত্যাগ করা আদৌ উচিত নয়। ঈমান ব্যতীত এ সবই অর্থহীন। সুতরাং লক্ষণীয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট বহু নিদর্শন জমা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় কোর্তা মুবারক তার কাফনে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। এটা কার ভাগ্যে জোটে। আজকাল বড়জোর গিলাফে কা'বার টুকরা দেয়া যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্র জামার সাথে এটির কোন তুলনা চলে না। তাঁর শরীর মুবারক আরশ ও কাবা অপেক্ষা আফযল বা সম্মানিত। গিলাফে কা'বাকে

মহানবী (সা)-এর কোর্তার সমতুল্য ধরে নিলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থুথুর পরশ পায় এমন বরাত কয়জনের। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র মুখের থুথু তার মুখে লাগিয়েছিলেন। অথচ এটা ছিল দেহের অংশ যার বরকত পোশাক অপেক্ষা অধিক। অধিকন্তু তিনি তার জানাযার নামায পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন যা ছিল তার অনুকূলে দোয়ার নামান্তর। অতএব আজকাল এহেন ভাগ্য কারই বা জোটে যে, সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে স্বয়ং মহানবী (সা) জানাযা পড়াবেন। কিন্তু এতসব নবুয়তী স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কোন উপকার সাধিত হয়নি। কারণ সে ছিল ঈমান বঞ্চিত, বে-ঈমান। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র স্পষ্ট ঘোষণা হলো–انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون

—এসব মুনাফিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে নিশ্চিত কুফরী করেছে আর ফাসিক অবস্থায়ই এরা মৃত্যুবরণ করেছে। —আর রফউ ওয়াল-ওযউ, পৃষ্ঠা ৩০

**প্রশ্ন ঃ ২১. রমযানের আগমন প্রতীক্ষায় সৎকাজ মুলতবি রাখা বিদ'আত।**

কেউ কেউ রমযানের অপেক্ষায় কোন কোন পুণ্য কাজ মুলতবি রাখে। যেমন শাবান মাসে একজনের যাকাতবর্ষ পূর্ণ হলো কিন্তু রমযানের অপেক্ষায় সে আদায় করবে না। রমযান মাস আসা পর্যন্ত তার টাকা নষ্ট হয়ে যাক, চুরি হোক অথবা পথের ফকীর হয়ে যাক কিন্তু যাকাত দিতে হবে রমযানেই। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখতে হবে—মহানবী (সা) কর্তৃক রমযান মাসে আমল করার উৎসাহদানের অর্থ এই নয় যে, রমযানের অপেক্ষায় অন্যান্য নেক কাজ বন্ধ রাখতে হবে। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—রমযানের পূর্বে কারো কোন কাজ করণীয় ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশত সুযোগের অভাবে সে কাজ সমাধা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, এখন রমযানের ভিতর যেভাবেই হোক তা যেন সমাধা করা হয়। সুতরাং তাঁর মূল বক্তব্য হলো—নেক কাজে বিলম্ব ঘটিয়ে পবিত্র রমযান মাস পার করে দেয়া থেকে বারণ করা, রমযানের পূর্বে করণীয় কাজ সমাধা করা থেকে নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। এ-দুইয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। কিন্তু অল্প বুদ্ধির কারণে উক্ত বক্তব্যের মর্মফল এই হয়েছে যে, রমযান মাসে খরচ করার ফযীলত ও সওয়াবের কথা শুনে এর অপেক্ষায় পূর্ব-করণীয় সৎকাজ বন্ধ রাখা হয়। খুব ভাল করে বুঝুন যে, নেক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করাতে অধিক সওয়াব। আর তা এত অধিক যে, রমযান-পূর্ব কাজের সওয়াব মধ্য-রমযানের তুলনায় পরিমাণে যদিও অল্প কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, মানগত দিক দিয়ে এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে সে পূর্বকাজ অতি উত্তম এবং রমযানের কাজ অপেক্ষা তার সওয়াব উচ্চতর মানসম্পন্ন। প্রশান্ত চিত্তে, দিব্য জ্ঞানে

আমি এ বক্তব্য রাখছি আর কসম অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানকারী এবং জোরালো কোন ভাষা আমার জানা নেই। কে বলতে পারে যে, শাবান মাসে কোন অভাবীর হাতে যাকাতের টাকা তুলে দিলে তার অন্তর থেকে এমন দোয়া হয়তো উচ্চারিত হতো যার সামনে সত্তর রমযান তুচ্ছ। এ রহস্যটাই মানুষের অজ্ঞাত। উল্লেখ্য, যাকাতের বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তা আদায়ে বিলম্বের কারণে গুনাহ্ হবে কি-না এ সম্পর্কে ফকীহ্গণের মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে যাকাত অবিলম্বে আদায়যোগ্য—তাৎক্ষণিক ওয়াজিব। তাঁরা বিলম্বে আদায়ে গুনাহ্ হওয়ার পক্ষপাতী। কেউ কেউ বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব নয়। তাই তাঁদের মতে বিলম্বে আদায় করাতে গুনাহ হবে না। সুতরাং ওয়াজিব হওয়ার পর অবিলম্বে আদায় করাতেই অধিক সতর্কতা। সর্বসম্মতিক্রমে এটাই গুনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। বলা বহুল্য, রমযানের অপেক্ষায় দান-খয়রাত বন্ধ রাখা সওয়াবের বিষয় হলে শরীয়ত অন্তত কোথাও এ কথার ঘোষণা দিত যে, রমযানের এতদিন পূর্ব থেকে সমস্ত দান-খয়রাত বন্ধ রাখতে হবে। কাজেই শরীয়ত যেহেতু এ ধরনের নির্দেশ শোনায়নি সে ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে এরূপ করাটা দীনের ওপর অতিরঞ্জন এবং বিদ'আত। কেননা শরীয়ত যে কাজে সওয়াবের আশ্বাস দেয়নি আপনারা সেটাকে সওয়াবের কাজ মনে করে পালন করছেন। বস্তুত এটা শরীয়তী হুকুমের বিরোধিতারই নামান্তর। কিন্তু এতদিন বিষয়টা জানা ছিল না বলে সম্ভবত গুনাহগার হবে না। কিন্তু স্পষ্ট হওয়ার পর এখন এ ধরনের কাজে গুনাহ্ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

–তাকলীলুল মানাম, পৃষ্ঠা ৩০

**প্রশ্ন ঃ ২২. চার দলীলের ভিত্তিতে মিলাদুন্নবী উৎসবের অসারতা প্রমাণ, এর উদ্ভাবকদের দলীলের জবাব।**

জানা দরকার "ঈদে মিলাদুন্নবী" নামে প্রচলিত প্রথা সম্পর্কে দু'ধরনের কথা রয়েছে। (এক) এটা শরীয়তসম্মত না হওয়া সম্পর্কিত প্রমাণ। (দুই) বিরুদ্ধবাদীদের পেশকৃত দলীলের জবাব। অতঃপর শুনে রাখুন যে, শরীয়তের দলীল চারটি। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। ইনশাআল্লাহ্ পর্যায়ক্রমে এ চারটি সম্পর্কেই এখন আলোচনা করা হবে। প্রথমত কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ প্রশ্নাকারে উল্লেখ করেছেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ -

—তাদের উপাস্যদের কি অধিকার রয়েছে যে, তাদের ধর্মের এমন বিষয় তারা সাব্যস্ত করে দেবে, আল্লাহ্ যার অনুমতি দেননি ?

আলোচ্য আয়াত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র হুকুম তথা-শরীয়তের প্রমাণ ছাড়া দীনি কোন বিষয় নিজের পক্ষ থেকে নিরূপণ করা বা প্রবর্তন করা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। এই হলো বক্তব্যের প্রথম অংশ। দ্বিতীয় কথা হলো—ঈদে মিলাদুন্নবী দীনি কাজ মনে করে বিনা দলীলে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা শরীয়তসম্মত বিষয় নয়। বরং নব উদ্ভাবিত। আংশিকভাবে এর ভিত্তিহীনতা তো সুস্পষ্ট। আর বৈধতার কোন সম্ভাবনা যদি থাকেও তবে এতটুকুই যে, সম্ভবত একে তারা কোন সামষ্টিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করবে যার ব্যাখ্যা পরে বর্ণিত হবে। তবে মোটামুটি এতটুকু জানা দরকার যে, এর উপলক্ষ বা কারণ পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। চাই সেটা আনন্দ প্রকাশ হোক অথবা ইসলামের শক্তি প্রদর্শন। যাই হোক আমাদের কথা হলো—মহানবী এবং সাহাবীগণের স্বর্ণযুগেও এ উপলক্ষ বিদ্যমান ছিল। আর তাঁরা কুরআন-হাদীসের মর্ম উত্তমরূপে অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন, যার কারণে বর্তমানকালে এর ওপর ইজতিহাদ বৈধ রাখা হয়নি। অথচ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আনন্দ প্রকাশ কিংবা ইসলামের শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন তীব্র থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এর ওপর আমল করেননি। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, এটা ভিত্তিহীন, বিদ'আত ও বানোয়াট বিষয় মাত্র। শরীয়তসিদ্ধ নয় এমন বিষয়কে দীনি কাজ মনে করাটাই মূলত বিদ'আত। কাজেই এটাকে বর্জন করা ওয়াজিব। এ তো গেল কুরআনভিত্তিক আলোচনা।

এখন হাদীসের প্রমাণ লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

—যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা বর্জনীয়।

এখানেও উক্ত আয়াতের অনুরূপ একই বক্তব্য। নব আবিষ্কৃত বিষয়ের মর্ম হলো—যার উপলক্ষ প্রাচীন কিন্তু তখন আমল করা হয়নি। পক্ষান্তরে যে বিষয়ের কারণ নতুন এবং শরীয়তের অপরাপর আদিষ্ট বিষয় তার ওপর নির্ভরশীল সেটা দীনের অন্তর্ভুক্ত এবং আমল করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় হাদীস ঃ সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختصوا الليلة الجمعة بقيام من بين الليالى
ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون فى يوم يصومه احدكم -

—মহানবী (সা) বলেছেন—জুমআর রাতকে তোমরা অন্যান্য রাত হতে (নফল ইবাদতের নিমিত্ত) জাগরণের জন্য নির্দিষ্ট করো না আর জুমআর দিনকে তোমরা রোযার জন্য অন্যান্য দিন থেকে নির্দিষ্ট করো না, অবশ্য তোমাদের কারো সেদিন রোযা রাখার অভ্যাস থাকলে ভিন্ন কথা।

এ হাদীসের আলোকে নীতিমালা প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তসিদ্ধ নয় এমন বিষয় নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ। অবশ্য শুক্রবারে রোযা রাখা কিরূপ সেটা ভিন্ন কথা। আলিমগণ অন্য এক দলীলের ভিত্তিতে এর বৈধতার হুকুম আর নিষেধকে সাময়িক আখ্যা দিয়েছেন যে, রোযার কারণে শুক্রবারের অন্যান্য করণীয় আমল সম্পাদনে যেন দুর্বল না হয়ে পড়ে। এ তো গেল প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূলনীতি নির্ধারণ করাই ছিল আমাদের আসল উদ্দেশ্য, যাতে শুক্রবারে রোযা রাখার সমর্থকদেরও উক্ত মূলনীতির বৈধতার ওপর কোন আপত্তি না থাকে। অতএব "শরীয়তসম্মত নয় এমন বিষয় দীনের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করা জায়েয নয়"—এ নীতিমালা সর্বসম্মত ও বৈধ। এখন এ মূলনীতি স্বীকার করার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মদিন পালনের নির্দিষ্ট প্রথার স্বরূপ কি ধরনের লক্ষ করুন। বলা বাহুল্য, নবী দিবস পালন করা শরীয়ত কিংবা স্বভাব কোন বিধিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ দীনি কাজ মনে করেই তা পালন করা হয়। আর এতে সম্মতি নেই এমন লোকদেরকে বেদীন আখ্যা দেয়া হয়। সমাজে তারা নিন্দার পাত্র। অথচ সামাজিক রীতি ও রুচি বিরোধী কোন কাজে কেউ নিন্দা কিংবা সমালোচনার পাত্র চিহ্নিত হয় না। কথাটা স্পষ্ট করে বলি। মনে করুন, এক ব্যক্তি মলমল ব্যবহারে অভ্যস্ত। পরবর্তী সময়ে সে তা বর্জন করলে কেউ তার নিন্দায় নাক গলায় না কিংবা সমাজে সে নিন্দিত ব্যক্তি নয়। কাজেই বোঝা গেল এভাবে মিলাদুন্নবীর তারিখ ও অনুষ্ঠানমালা নির্ধারণ করাটা শরীয়তসম্মত নয়। বরং এক্ষেত্রে চিন্তার গভীরে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়—তুলনীয় শুক্রবার অপেক্ষা প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান অধিকতর অসিদ্ধ। কারণ শুক্রবারের ফযীলত সুস্পষ্ট হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু জন্ম দিবস সম্পর্কে তাও নেই। অবশ্য জন্ম দিবসের বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে সারা মুসলিম জাহান বিশ্বাসী। সুতরাং আল্লামা সুয়ূতী অথবা মোল্লা আলী কারী উক্ত মাসের ফযীলত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

هذا لشهر فى الاسلام فضل

ومنقبة تفوق على الشهور

ربيع فى ربيع فى ربيع

ونور فوق نور فوق نور

—এটা এমন মাস, অন্যান্য মাস অপেক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে যার মর্যাদা সর্বাধিক। যেন বসন্তের ওপর চির বসন্তকাল এবং আলোর ওপর উজ্জ্বল আলো, তার ওপর আলোকমালার তরঙ্গ বিচ্ছুরণ।

এর সাথে আমার সংযোজন ঃ

ظهور فى ظهور فى ظهور
سرور فى سرور فى سرور

—অধিকন্তু এ মাস যেন প্রকাশের ওপর বিকাশ, তারো ওপর উদ্ভাসন এবং আনন্দের মধ্যে অধিক উল্লাস, তার মধ্যে খুশীর প্লাবন।

মোটকথা, জন্ম দিবসের মূল বরকত ও ফযীলত অনস্বীকার্য। কিন্তু কথা হলো—শুক্রবারের ন্যায় যেহেতু এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন হাদীস নেই কাজেই এ নির্ধারণ অবৈধ হবে না কেন ? কেউ কেউ দাবি করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম দিবসের ফযীলত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং বর্ণিত হয়েছে—মহানবী (সা) সোমবার দিন রোযা রাখতেন। কেউ প্রশ্ন করল—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সোমবারে রোযা রাখার কারণ কি ? বললেন ঃ ولدت يوم الاثنين "আমি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছি।" এর জবাব পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় হাদীস শুনুন, যা নাসাই শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم -

—রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার কবরকে তোমরা ঈদ-উৎসবে পরিণত করো না। আর তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠাও। কেননা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছবেই।

আলোচ্য হাদীসে বে-ঈদকে উৎসবে রূপান্তরিত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারো মনে হয়তো সন্দেহ জাগতে পারে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবরে তো সবাই একত্রিত হয় ? এর জবাব হলো—মূলত হাদীসের মর্ম এই যে, আমার কবরে তোমরা ঈদ সমাবেশের ন্যায় নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে একত্রিত হয়ো না। উল্লেখ্য, ঈদ উৎসবে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখে এবং এর জন্য পরস্পর আমন্ত্রণ জানিয়ে জনসমাবেশ ঘটানো হয়। বস্তুত মিলাদুন্নবীর উদ্দেশ্যে এ ধরনের নিমন্ত্রিত সমাবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়া ঘটনাক্রমে একত্রিত হয়ে যাওয়া

নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং দেখা যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রওযা পাকের যিয়ারতে নির্দিষ্ট দিন কিংবা বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নয় বরং প্রত্যেকেই সুবিধামত সময়ে উপস্থিত হয় এবং কাজ সমাধা করে চলে আসে। অতএব রওযা পাকে তথাকথিত গণজমায়েত নাজায়েয উক্ত হাদীস তারই স্পষ্ট প্রমাণবাহী। কাজেই স্থানগত উৎসবের ন্যায় কালগত উৎসবও নিষিদ্ধ হবে। অধিকন্তু صلوا على فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم (তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠাও। যেখানেই তোমরা থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছবেই।) বাক্যাংশ সংযোজন করা হলে সমাবেশের অবৈধতা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। কেননা فان صلوتكم বাক্যটি দৃশ্যত এরি প্রতি ইঙ্গিত দেয় যে, ঘটা করে তোমাদের এতসব আয়োজন-অনুষ্ঠানসর্বস্ব মিলাদের দরকার কি ? তোমাদের কাজ দরূদ পাঠানো, তা যেখান থেকেই পাঠাওনা কেন আমার নিকট তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা আগেই করা আছে, তোমাদের ভাবতে হবে না। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমার মতে বিশুদ্ধতর বিশ্লেষণ এই যে, ইতিপূর্বে উল্লিখিত لا تجعلوا বাক্যের আশ্রয়ে বিদ'আতীরা একটা অজুহাত খাড়া করতে পারত যে, আমরা তো দরূদের উদ্দেশ্যে রওযা পাকে একত্রিত হয়ে থাকি। আর দরূদ শরীয়তের একটি নির্দেশিত বিষয়। কাজেই আমাদের সমাবেশ জায়েয ও বৈধ। সুতরাং মহানবী (সা) নিজেই তাদের এ সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে বলেন ঃ মদীনায় উপস্থিতির ওপর দরূদের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল নয়। বরং বিশ্বের যেকোন অংশে তোমরা পাঠ কর আমার নিকট তা পৌঁছবেই। কাজেই তাদের এ-বাহানা অসার, ভিত্তিহীন। এর দ্বারা অপর একটি বিষয় উদ্ভাবিত হয় যে, দরূদ ফরয, ওয়াজিব ও নফল যে ধরনেরই হোক না কেন এর কোনটির জন্যই উৎসবের ন্যায় একত্রিত হওয়া জায়েয নয়, সেক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া কিরূপে জায়েয হবে? কিন্তু এর দ্বারা কারো সন্দেহ হওয়া উচিত নয় যে, রওযা পাকের যিয়ারতে যাওয়াও বোধ হয় বৈধ নয়। কেননা শুধু দরূদ পাঠের জন্য সেখানে কেউ হাযির হয় না, বরং রওযা পাকের যিয়ারত করাই মুখ্য বিষয়। আর কবর ছাড়া অন্য কোথাও যিয়ারত সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কিত চতুর্থ হাদীস হলো—কোন এক ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতিতেই কয়েকটি বালিকা খেলায় মগ্ন ছিল। হযরত উমর (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ধমক দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا

—"হে উমর! এদের নিষেধ করো না, প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট ঈদ বা উৎসব রয়েছে আর এটা হলো আমাদের ঈদ।" আলোচ্য হাদীসে ঈদকে খেলার বৈধতার কারণ নির্ধারণ করার ভিত্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তা কেবল উক্ত দিনের সাথে সম্পৃক্ত। তাহলে এখন প্রত্যেকের জন্যই যদি উৎসব করা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়, তবে প্রতিদিন এ জাতীয় খেলা জায়েয হয়ে যায় এবং তাতে হাদীসের নির্দিষ্টতা বাতিল সাব্যস্ত হয়ে উদ্ভাবিত বিষয় প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু আমাদের এ দাবি ইজমা দ্বারাও প্রমাণিত। এর ব্যাখ্যা হলো—কোন বিষয় বর্জন করার ওপর গোটা উম্মত একমত হয়ে গেলে উক্ত বিষয় নাজায়েয হওয়ার পক্ষে সেটাই ইজমা। তাই ফকীহ্গণ স্থানে স্থানে দলীল পেশ করেছেন যে, সাহাবীগণ মহানবী (সা)-এর কোন কাজ সর্বদা বর্জন করাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। যেমন তিনি বিনা আযানে সর্বদা ঈদের নামায পড়েছেন। তদ্রূপ সকল উম্মত কর্তৃক বর্জিত কোন কাজ বর্জন করা ওয়াজিব। এ মূলনীতি স্বীকৃত না হলে আজ থেকে ঈদের নামাযে আযান-ইকামত সংযোজন করে দেয়া উচিত। আর স্বীকৃত হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, সমস্ত উম্মত কর্তৃক ঈদে মিলাদুন্নবী বর্জিত হয়নি, যেহেতু আমরাও উম্মত আর আমরা তা পালন করি। তাই ইজমা হলো কোথায় ? এর উত্তরে বলা যায়—ফিকাহ শাস্ত্রের স্বীকৃত নীতি এই যে, পরবর্তিগণের মতভেদ পূর্ববর্তিগণের ঐকমত্য বিনষ্টকারী নয়। স্পষ্ট কথায়–যে বিষয়টি পূর্ববর্তী সময়ের ঐকমত্য সমৃদ্ধ, পরবর্তীকালের মতবিরোধ তা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। সুতরাং আপনাদের সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত উম্মত কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মোৎসব পালন-প্রথা বর্জিত ছিল। এখন সে ঐকমত্য ক্ষুণ্ন হতে পারে না। হানাফী আলিমগণ কর্তৃক জানাযা নামাযের পুনরাবৃত্তি নাজায়েয ফতোয়া দান এ মূলনীতিরই নিঃসৃত ফল। দলীল একই যে, এটা সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রমাণিত নয়। মোটকথা, সমস্ত উম্মতের বিবর্জন কোন বিষয় নাজায়েয হওয়ার দলীল। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, উক্ত জন্মোৎসব নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। সুতরাং অবশ্য বর্জনীয়।

এখন বাকি রইল কিয়াস। বস্তুত কিয়াস দুই প্রকার। (১) মুজতাহিদ হতে বর্ণিত এবং (২) বর্ণিত নয়। এক্ষেত্রে নীতি হলো—মুজতাহিদের সমসাময়িক কোন বিষয়ে গায়র মুজতাহিদের কিয়াস গ্রহণীয় নয়। অবশ্য পরবর্তীকালের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে গায়ের মুজতাহিদের কিয়াস গ্রহণযোগ্য বটে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পদ্ধতি এবং আধুনিক যুগের উদ্ভাবিত সমস্যার সমাধান কিয়াসের ভিত্তিতেই প্রমাণিত হবে।

অতএব আলোচ্য মিলাদের ব্যাপারে আমরা নিজেরা কিয়াসকামী নই। কেননা পূর্ববর্তিগণের রায়ের সাথে বিরোধ না হওয়া অবস্থায়ই কেবল আমাদের কিয়াসের যথার্থতা থাকতে পারে, বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নয়। সুতরাং 'তাবঈদুশ্ শাইতান' ও 'সিরাতে মুসতাকীম' নামক পুস্তকদ্বয়ে এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোন 'সময়' বা 'স্থানকে' উৎসবে পরিণত করা নিষিদ্ধ। সুতরাং কিয়াস দ্বারাও উক্ত উৎসব না-জায়েয প্রমাণিত হয়। এসব তো হলো আমাদের পক্ষের দলীল। এখন উৎসবপন্থীদের দলীলের তফসীল এবং তার জবাব শুনুন। উল্লেখ্য, সম্ভবত নিজেদের সপক্ষে তারা এসব দলীল পেশ করতে পারে। অবশ্য তাদের সাথে সম্পৃক্ত এসব প্রমাণ কোথাও আমার নযরে পড়েনি এবং বছরের পর বছর চেষ্টা করলে এর একটি প্রমাণ তাদের পক্ষে দাঁড় করানো সম্ভবও নয়। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের সপক্ষ দলীল আমিই ব্যক্ত করছি, যেন এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে কারো কিছু বলার অবকাশ খতম হয়ে যায়।

প্রথমত, قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا (অর্থাৎ বল, আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ এটা, এরি জন্য তাদের আনন্দ প্রকাশ বাঞ্ছনীয়) আয়াতকে ভিত্তি করে তারা বলতে পারে যে, এর আলোকে আনন্দ প্রকাশ করা কুরআন-নির্দেশিত বিষয়। আর জন্মোৎসবও মূলত তাই, কাজেই এটা জায়েয। জবাব পরিষ্কার যে, আয়াত দ্বারা কেবল আনন্দ প্রকাশের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনা ছিল মূলত উদ্ভাবিত সে প্রথাকেন্দ্রিক মিলাদানুষ্ঠান যার সাথে আয়াতের কোন ছোঁয়া নেই। তদুপরি এ প্রথাকে সে মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করার বৈধতা সাপেক্ষে ফিকাহ্শাস্ত্রবিদগণ ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে যেসব বিদ'আত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেগুলোও এ জাতীয়। কোন না কোন মূলনীতির অধীনেই এসব অনুষ্ঠান জায়েয হওয়া উচিত। অথচ উভয় পক্ষের স্বীকৃত ফিকাহ্ গ্রন্থে এসবের স্পষ্ট নিষেধ বর্ণিত রয়েছে। বক্রপথের অনুসারীরা সর্বদা এহেন প্রতারণা কিংবা অজ্ঞতার শিকার হয়ে আছে যে, আমাদের এবং হকপন্থীদের ঝগড়া ও বিরোধের বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা হকপন্থীদের বিপক্ষে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আপত্তি উত্থাপন করে। এখানেও তাই হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত একটি বিশেষ প্রথা বা পন্থাকেই আমরা নাজায়েয বলে থাকি। আর فليفرحوا আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণিত আনন্দ শর্তহীন। তাই তারা মনে করে আমরা শর্তহীন আনন্দমাত্রই নিষেধ করে থাকি। অথচ এ ধারণা ভুল। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তার আলোকে দেখা যাবে আমরাই বরং উক্ত আনন্দ অধিক পরিমাণে প্রকাশ করে থাকি। কেননা উক্ত আবিষ্কারক মহল বছরে মাত্র একবারই এ

উৎসবের আয়োজনে মেতে ওঠে আর অবশিষ্ট সারা বছর তারা নীরব। পক্ষান্তরে আমাদের খুশি অব্যাহত ধারায় সারাক্ষণ চলতেই থাকে ( কেননা নিসবতপন্থী তথা আল্লাহ্‌র সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তারা ঈমানের দীপ্তি ও স্বাদে প্রতি মুহূর্তে আনন্দে বিভোর থাকেন)। তাদেরই অনেকে এ সম্পদে সমৃদ্ধ।

وذالك فضل الله يوتيه من يشاء وهذا هو الفرح انما موربه كما مر فى تفسير الاية

—এটা আল্লাহ্‌রই অপার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। এটাই সে নির্দেশিত আনন্দ যা আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। (সংকলক)

অতএব যারা সারা বছর মুলতবি করে দেয় বাস্তবে তারাই আয়াতের ওপর কর্মবিমুখ। আমরা এতে বিরতি না দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আয়াতের ওপরও আমল করি, অপরদিকে নিষিদ্ধ বিদ'আত থেকেও বেঁচে থাকি। বিদ'আতীরা উভয় কূল হারায়।

সার কথা—নির্দেশিত আনন্দ তিন ধরনের। (১) ইফরাত, (২) তাফরীত ও (৩) ই'তিদাল। তাফরীত হলো—কেবল নির্দিষ্ট সময়ে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা সংকীর্ণমনাদের কাজ। আর ইফরাত বলা হয়–শরীয়তের সীমা অতিক্রম করে দ্রুত আনন্দে মেতে ওঠা যা তথাকথিত প্রগতিবাদীদের চরিত্রের লক্ষণ। অতঃপর ই'তিদাল অর্থাৎ মধ্যপন্থা যা সংকীর্ণ বা অতিক্রম উভয়টির মাঝপথে অবস্থিত। আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমরা এরি অনুসরণ করে থাকি।

বিপক্ষীয়দের দ্বিতীয় দলীল হতে পারে এ হাদীস, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে উল্লসিত আবূ লাহাব নিজের বাঁদীকে আজাদ ঘোষণা করে দেয়। ফলে তার আযাবের মাত্রা হ্রাস করা হয়। সুতরাং বোঝা গেল মহানবী (সা)-এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা জায়েয এবং বরকতময় বিষয়। এরও একই জবাব যে, আমরা শর্তহীন আনন্দের পক্ষপাতী এবং সর্বদা এরি ওপর আমল করে থাকি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল নির্দিষ্ট প্রথা ও পন্থাকেন্দ্রিক আলোচনা। তৃতীয়ত তাদের দলীল আরো হতে পারে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে—

وَ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ الى قوله رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ –

—(অর্থাৎ স্মরণযোগ্য সে সময়টি যখন হাওয়ারীরা বলল—হে মরিয়ম-পুত্র

ঈসা! আপনার রবের পক্ষে কি সম্ভব যে, আসমান থেকে তিনি আমাদের জন্য খাদ্য পাঠাবেন ?) হতে হযরত ঈসা (আ)-এর দোয়া (হে আল্লাহ! আমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের খুশি এবং আপনার শক্তির নিদর্শনস্বরূপ আকাশ থেকে আমাদের খাবার পাঠিয়ে দিন।) পর্যন্ত আয়াতের আলোকে বোঝা যায় যে, অনুগ্রহপ্রাপ্তির দিনটিতে উৎসব পালন করা জায়েয। আর আমাদের নীতিমালা নির্দিষ্ট রয়েছে যে, বিগত উম্মতগণের শরীয়তে বর্ণিত হওয়ার পর আল্লাহ্ কর্তৃক তা বর্জনের হুকুম ব্যক্ত না হলে সেটা আমাদের অনুকূলে প্রমাণরূপে গণ্য হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কোন নিষেধবাক্য উক্ত না হওয়ায় বোঝা যায় যে, অনুগ্রহ লাভের তারিখে আনন্দ উৎসব করা জায়েয। আর রাসূলুল্লাহ্র জন্ম নিঃসন্দেহে বৃহত্তর অনুগ্রহ। কাজেই তাঁর জন্ম দিবসে আনন্দ উৎসব বৈধ হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এর জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত ঘটনাস্থলেই এর অস্বীকৃতি অনিবার্য নয়। লক্ষ করুন وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ (অর্থাৎ স্মরণযোগ্য সে সময় যখন ফেরেশতাগণকে আমি নির্দেশ দিলাম আদমকে সিজদা করার।) আয়াতে তা'যীমী তথা সম্মানসূচক সিজদার উল্লেখ রয়েছে। অথচ আমাদের শরীয়তে তা নিষিদ্ধ। তার অস্বীকৃতি এখানে বর্ণিত নেই, কিন্তু অন্যত্র এর দলীল রয়েছে। তদ্রূপ এখানেও লক্ষ করুন, উৎসবের পরিপন্থী আমাদের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস এর অবৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রণিধানযোগ্য, দলীলদাতা কর্তৃক আয়াতের মর্মার্থ স্বীকার করা সাপেক্ষে এ উত্তর। নতুবা আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণ হয় না যে, খাদ্য নাযিলের দিনটিকে উৎসব দিবসে পরিণত করাই ঈসা (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল। কেননা تكون বাক্যের ضمير তথা সর্বনাম مائده -এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। তাই এর দ্বারা "খাদ্য নাযিল হওয়ার দিবস" অর্থ করা রূপক অর্থ। আর নিয়ম হলো—শব্দের বা বাক্যের মূল অর্থ যে পর্যন্ত প্রয়োগ করা সম্ভব সে ক্ষেত্রে রূপক অর্থের আশ্রয় নেয়া সমীচীন নয়। সুতরাং অর্থ হবে تكون المائدة سرورا لنا অর্থাৎ, "সে 'খাদ্য' যেন আমাদের আনন্দের কারণ হয়।" বস্তুত 'ঈদ' শব্দের প্রয়োগ এখানে প্রচলিত অর্থে করা হয়েছে, এটা স্বীকৃত নয় বরং 'ঈদ' শব্দ শর্তহীন আনন্দ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কোথাও ঈদ শব্দের প্রয়োগ হলেই তার অর্থ "ঈদে মিলাদুন্নবীই" হবে এমন কোন কথা তো নেই। শী'আরা যেরূপ কোথাও م - ت - ع এর প্রয়োগ দেখামাত্রই متعه (সাময়িক বিয়ে) প্রমাণে তৎপর হয়ে ওঠে। তাই শেখ সা'দীর ছন্দ

ربنا استمتع بعضنا تمتع زهر گوشه یافتم (সবদিক থেকে আমি সফল হয়েছি) এবং ربنا استمتع بعضنا ببعض (হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের সহায়তা লাভ করেছি) আয়াতের অন্তরালে তারা কেবল মুত'আর অর্থই দেখতে পায়। অনুরূপ মিলাদপন্থীদের নিকট কোন স্থানে ی ـ ع د ـ উল্লিখিত হলেই তার অর্থ ঈদে মিলাদুন্নবীর বৈধতা প্রমাণ হয়ে যায়। অপর একটি ঘটনা দ্বারা তাদের চতুর্থ দলীল হতে পারে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

اليوم اكملت لكم دينكم

—(আজ তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণতা দান করলাম) আয়াত নাযিলের পর জনৈক ইহুদী হযরত উমর (রা)-কে লক্ষ করে বলল ঃ এ আয়াত আমাদের ওপর নাযিল হলে অবতরণের সে দিনটিকে আমরা 'ঈদ' তথা উৎসব দিবসে পরিণত করতাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ উক্ত আয়াত নাযিল ঈদের দিনই হয়েছে। অর্থাৎ জুম'আ ও আরাফার দিন। উক্ত আয়াতের তাফসীর তিরমিযীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ জুম'আ এবং আরাফার দিন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের আলোকে তাদের বক্তব্য এই যে, হযরত উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) উৎসব অস্বীকার করেননি। তাই বোঝা গেল অনুগ্রহ লাভের তারিখকে উৎসবে পরিণত করা জায়েয। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পক্ষে এ দলীল সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আমি শুধু অনুগ্রহবশে তাদের হয়ে এ দলীল পেশ করেছি যে, এর ভিত্তিতে তাদেরও কিছু বলার অবকাশ ছিল। দু-ধরনের জবাব হতে পারে এর। প্রথমত জবাব এই যে, তাঁদের অস্বীকার এখানেই বর্ণিত থাকবে এটা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং ফকীহগণ হাজীদের অনুকরণে আরাফার দিনে অন্য কোথাও একত্রিত হওয়া অবৈধ ঘোষণা করেছেন। অথচ তাঁদের এ রায় অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে। এখানে বর্ণিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তদুপরি ইবনে আব্বাস (রা) তাহ্সীব (تحصیب) তথা কাঁকর বিছানোকে لیس بشئ অর্থাৎ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ এটা বর্ণিতও রয়েছে। তা সত্ত্বেও নিছক আদত-অভ্যাসকে ইবাদতে রূপ দেয়ার কারণেই তাঁর এ অস্বীকৃতি। এমতাবস্থায় গায়র মানকুল তথা বর্ণিত নয় এমন বিষয়কে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় কল্পনা করা তো তাঁর পক্ষ থেকে অস্বীকার করাই হবে। উপরন্তু উমর (রা) কর্তৃক হুদাইবিয়ার বৃক্ষতলে জমায়েত হওয়ার অস্বীকৃতি সুপ্রসিদ্ধ। যথাস্থানে অস্বীকৃতি বর্ণিত না থাকা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর ওপর তাঁদের উভয়ের অস্বীকৃতি প্রমাণিত রয়েছে। দ্বিতীয় জবাব এই যে, সে ব্যক্তি মুসলমান

ছিল না, ছিল ইহুদী। তার উক্তির পাল্টা জবাবে হযরত উমর (রা) বলেছেন যে, নতুন ঈদের প্রয়োজন কি, আমাদের ঈদ বা আনন্দ উৎসবের বন্দোবস্ত তো পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। বস্তুত তাঁর জবাবের ভঙ্গিতেই প্রতীয়মান হয় যে, এ দিনটিকে উৎসবে পরিণত করা জায়েয নয়। হযরত উমর (রা)-এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমাদের শরীয়ত যেহেতু এ উৎসবের বৈধতা সমর্থন করেনি, তাই আমরা নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং অন্যভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই আমাদের আনন্দের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

অপর একটি হাদীসকে তারা পঞ্চম দলীল হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। হাদীসটি হলো—মহানবী (সা) সোমবার রোযা রাখলে কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তিনি বললেন ঃ ذالك اليوم ولدت فيه অর্থাৎ এটা আমার জন্মদিন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ দিনের ইবাদত শরীয়তসম্মত, বৈধ এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়। কাজেই এ উপলক্ষে এ দিনে আনন্দ প্রকাশ করা শরীয়তসম্মত না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এর দু-ধরনের জবাব দেয়া চলে। (১) মহানবী (সা) জন্মদিনের সম্মানেই যে রোযা রেখেছেন আমাদের নিকট এ তথ্য স্বীকৃত নয়। যেহেতু অন্যত্র এর কারণ ব্যক্ত করে বলেছেন—সোমবার-শুক্রবার আমলনামা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হয়। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বস্তুত আমলই ছিল এ দিনে রোযার মূল উদ্দেশ্য। তাহলে এক্ষেত্রে জন্মদিবসের উল্লেখ অবশ্যই ভিন্ন কোন রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। অথচ হুকুমের ভিত্তি হলো কারণ, রহস্য নয়। এমতাবস্থায় অন্যান্য নৈকট্যশীল বিষয়কে এর সাথে আপনাদের কিয়াস বা তুলনা করাটা রহস্যকে ভিত্তি সাব্যস্ত করার নামান্তর অথচ এটা স্বীকৃত ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়ত, তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করাও হয় যে, মহানবী (সা)-এর রোযা রাখার কারণ এটাই ছিল, তা সত্ত্বেও এর দ্বারা আপনাদের দাবি প্রমাণ হয় না। কেননা কারণ দু-ধরনের হতে পারে। এক ধরনের কারণ যা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সাথেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় প্রকার কারণ ব্যাপকধর্মী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। অতএব, এ কারণ যদি ব্যাপকধর্মী হয়, তবে উক্ত দিবসে কুরআন তিলাওয়াত, গরীবদের খানা খাওয়ানো ইত্যাদি সৎকাজ আপনাদের নিকট গ্রহণীয় নয় কেন ? আর এমতাবস্থায় জন্মদিবস সোমবারের মতো ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেও রোযা রাখা উচিত ছিল। উপরন্তু হিজরত, মক্কা বিজয়, মি'রাজ ইত্যাদির মতো আল্লাহ্র অনুগ্রহ আরো বহু রয়েছে। সে সব কারণের ভিত্তিতে আপনারা অন্য কোন ইবাদতের আশ্রয় না নেয়ার হেতু কি ? এর দ্বারা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, রোযার কারণ এ ক্ষেত্রে ব্যাপক নয়, বরং এরি মধ্যে

সীমাবদ্ধ। সুতরাং অহীই এর মূল ভিত্তি, জন্মদিবসের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক মাত্র। অন্যথায় অন্যান্য অনুগ্রহের দিনও উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে রোযা ও উৎসব বাঞ্ছনীয় ছিল। যদি বলা হয়—যাবতীয় নি'আমত বা অনুগ্রহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মদিবস থেকেই উৎসারিত আর এটাই এসবের মূল ভিত্তি। কাজেই জন্ম ও হিজরতের মধ্যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধানের কারণে আনন্দ প্রকাশের সময় ও দিনকাল হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে জন্মদিনকেই। তাহলে আমরা বলব—জন্মের মূল আরো গভীরে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণের প্রক্ষেপণ তথা মায়ের গর্ভধারণ করা। তাই এ সময়কেই ভিত্তি করা উচিত। অতঃপর পরিতাপের বিষয় হলো—জন্মদিবস সোমবার মিলাদানুষ্ঠান না করে কেবল ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেই আনন্দ প্রকাশের সময় ধার্য করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক সোমবারের ইবাদত বর্ণিতও রয়েছে যা জন্ম তারিখের বেলায় অনুপস্থিত। এ হাদীসের মর্ম অনুযায়ী প্রতি সোমবার মিলাদ অনুষ্ঠান করা উচিত। মোটকথা, উক্ত হাদীসবলেও আবিষ্কারকদের দাবি প্রমাণ হয় না। এই ছিল তাদের নকল তথা হাদীস-কুরআনভিত্তিক প্রমাণ।

এ পর্যায়ে এখন আমরা যুক্তিভিত্তিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। কেননা তাদের কেউ কেউ যুক্তিআশ্রয়ীও রয়েছে আলোচ্য ঈদ উৎসবের সমর্থনে তথাকথিত জাতীয় কল্যাণমুখী যুক্তিতে যারা কথা বলে। কাজেই সে আঙ্গিকেই বিষয়টা আমি তুলে ধরতে চাই। জানা দরকার—রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে যে বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন সাথে সাথে সেগুলোর কারণও উল্লেখ করেছেন। সে হিসেবে তাঁর নির্দেশিত বিষয়সমূহ কয়েক প্রকার। প্রথমত, যেসব কারণ বারবার আবর্তিত হয়। সে জন্য আদিষ্ট বিষয়টিও পর্যায়ক্রমে আসতেই থাকে। যেমন নামাযের বাহ্যিক কারণ হলো ওয়াক্ত বা সময়। তাই সময় আসতেই নামায পড়া ওয়াজিব হয়। অনুরূপ রোযার কারণ হলো রমযান মাসের উপস্থিতি। কাজেই রমযানের আগমনে রোযা ওয়াজিব হয়। ঈদের জন্য ফিতর এবং কুরবানীর জন্য কুরবানীর দিনও একই জাতের কারণ। দ্বিতীয়ত, কারণ ও আদিষ্ট বিষয়টি একক। যেমন কা'বাঘরের দর্শন হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ। এখানে কারণ যেহেতু একক তাই জীবনে একবারই মাত্র হজ্জ করা ফরয। এ দুই প্রকার কারণই যুক্তিগ্রাহ্য এবং বিবেকসম্মত। সুতরাং বিবেকের দাবিও তাই যে, কারণ একক বা একাধিক হওয়া সাপেক্ষে করণীয় হুকুমটিও এক বা অধিক হোক। তৃতীয় প্রকার এই যে, কারণ তো একই কিন্তু নির্দেশিত বিষয়টি বহু। যেমন হজ্জের তওয়াফে 'রমল' তথা বীরত্ব প্রদর্শনের কারণ ছিল ইসলামের শক্তি প্রদর্শন করা। কিন্তু পরবর্তীতে সে কারণ দূরীভূত হয়ে গেলেও রমলের হুকুম এখনও যথারীতি

বহাল রয়েছে। উল্লেখ্য, রমলের পটভূমিকা হলো—হজ্জের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ মদীনা থেকে মক্কা আগমন করলে তাদের উদ্দেশ করে মুশরিকরা মন্তব্য করেছিল—মদীনার জরা-ব্যাধি এদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। এরি প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে রমল করার অর্থাৎ বাহু দুলিয়ে, বুক টান করে তওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা যেন মুসলমানদের শক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে। এখন সে কারণ তো অবশিষ্ট নেই, কিন্তু রমলের নির্দেশ যথারীতি বহাল রয়েছে কিন্তু বিষয়টি বিবেক বহির্ভূত। আর এ জাতীয় বিষয়ের অনুকূলে অহীর সমর্থন অনিবার্য। এখন আমাদের প্রশ্ন—সে নির্দিষ্ট তারিখ কি গত হয়ে গেছে নাকি ঘুরে ঘুরে আসছে ? বলা বাহুল্য, অবশ্যই তা পেরিয়ে গেছে। কারণ বর্তমানে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়ালের আগমন ঘটে, কিন্তু এটা হুবহু জন্মদিবস নয়, বরং আসল জন্মদিনের 'অনুরূপ' মাত্র। সুতরাং 'অনুরূপে'র জন্য 'আসলে'র ন্যায় একই হুকুম প্রমাণের পক্ষে বর্ণনামূলক দলীল বিদ্যমান থাকা অনিবার্য। বিবেকগ্রাহ্য না হওয়ার কারণে কিয়াস এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী দলীল সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আমার জন্মদিন' বলে সোমবার রোযা রাখার কারণ উল্লেখ করেছেন। এতেও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, আসল জন্মদিন তো এখন অতীতের বিষয়, বর্তমানের সোমবার তার 'অনুরূপ' মাত্র। তাহলে এর জন্য আসলের হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার কারণ কি ? এর জবাবে বলা হবে, স্বয়ং অহীর সমর্থনে তিনি এ রোযা রেখেছিলেন, তাই এর ওপর অপরটির তুলনা চলতে পারে না। অতএব, নিছক অনুগ্রহ বশে তাদের সপক্ষে একটি যুক্তিসম্মত প্রমাণ ও তার জবাব ব্যক্ত করার মাধ্যমে আমি বিতর্কিত বিষয়টির আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই। অতএব, এ সম্পর্কে মিলাদপন্থীরা যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে যে, এখানে ব্যাপারটা মূলত কিতাবধারী সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলার বিষয় যে, খৃস্টানরা ঈসা (আ)-এর জন্মদিবসের আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে, তাই এর মুকাবিলায় আমরা মহানবী (সা)-এর জন্মদিনে আনন্দ-উৎসব করে থাকি ইসলামের শক্তি ও সামর্থ্য প্রদর্শনের লক্ষ্যে। এর উত্তরে আমার কথা হলো—ইসলামে শক্তি প্রদর্শনের অন্য ব্যবস্থা না থাকা অবস্থায় এ যুক্তির যথার্থতা স্বীকৃত ছিল। কিন্তু জুম'আ, দুই ঈদ ইত্যাদি ইসলামসম্মত অনুষ্ঠানে সে অভাব পূরণ করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাদের সাথে প্রতিযোগিতাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিধর্মীদের আচার-অনুষ্ঠানে আরো বহু পালা-পার্বণ যথারীতি চালু রয়েছে, তাহলে এর প্রতিটার মুকাবিলায় তোমাদেরও নতুন নতুন উৎসব পালনের ব্যবস্থা করা উচিত। তদ্রূপ আশুরার দিনে তাযিয়া অনুষ্ঠানও পালন করা বাঞ্ছনীয়, যেন শী'আদের সাথে

মুকাবিলা হয়। কোন কোন মূর্খ নেহায়েত মুকাবিলার খাতিরে এরূপ করেও বসে। আর এতেই যদি কল্যাণ বয়ে আনে, তবে হিন্দুদের হোলী-দেওয়ালী উৎসবও তোমরা শুরু করে দাও। একটি ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে আপনাদের ভিত্তিহীন এ নীতির অসারতা তুলে ধরছি। কোন এক স্থানে 'যাতে আনওয়াত' নামক বৃক্ষে নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাফিররা হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখত। তাদের ধারণায় এর ফলে শত্রুর মুকাবিলায় বিজয় সূচিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার সফরকালে উক্ত বৃক্ষের পাশ দিয়ে গমনকালে সাহাবীগণ আবেদন করলেন—হে রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদের জন্যও এমনি একটি গাছ নির্দিষ্ট করে দিন যাতে আমরাও হাতিয়ার-কাপড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে নিতে পারি। লক্ষ করার বিষয় যে, দৃশ্যত বৃক্ষের ডালে হাতিয়ার-কাপড় ইত্যাদি লটকানো দূষণীয় নয়, এতে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যও প্রমাণ হয় না, বৈধ কাজ বলেই ধারণা হয় কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে এ কাজে মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য প্রমাণ হয়ে যায়। সুতরাং মহানবী (সা)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসা (আ)-এর নিকট তাঁর কওম বনী ইসরাঈলের اجعل لنا الها كما لهم الهة (হে মূসা! এদের উপাস্যের ন্যায় আমাদেরও উপাস্য নির্ধারণ করে দিন) আবেদনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তা হলে এতটুকু সাদৃশ্য যে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপছন্দ করে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন সেস্থলে মুশরিকদের পরিপূর্ণ অনুকরণ আরও তীব্রভাবে নাজায়েয ও অবৈধ সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য। এই হলো অত্র অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

যাই হোক, যুক্তি ও কুরআন-হাদীসের বর্ণনাসূত্র উভয় দিক থেকেই প্রমাণিত যে, আলোচ্য আনন্দোৎসব ভিত্তিহীন, নব আবিষ্কৃত, নাজায়েয, বিদ'আত এবং অবশ্যবর্জনীয়। সারকথা—অনির্দিষ্ট আকারে শরীয়তের পক্ষ থেকে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক আনন্দের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন বিশেষ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট না করে উপরোল্লিখিত আয়াতের ওপর আমল করতে আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করি।

—আস্‌সুরুর, পৃষ্ঠা ২৯

**প্রশ্ন ঃ ২৩. কবর পাকা করা শরীয়তবিরোধী ও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অভিরুচির পরিপন্থী।**

ভক্তি ও সম্মানের আতিশয্যে আউলিয়াগণের মাযারে প্রকাণ্ড দালান নির্মাণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য যদিও তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে গর্হিত উপায়ে। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ। বস্তুত কবর পাকা করার মধ্যেই তাঁদের সম্মান সীমিত নয়; বরং কাঁচা কবরেও ওলী-আল্লাহ্‌গণ

একইরূপ মর্যাদায় ভূষিত। বরং সুন্নতের অনুসরণের দরুন কাঁচা কবরে নূরের জ্যোতি অধিক পরিমাণে বিকশিত। শায়খ বখতিয়ার কাকী (র)-এর কাঁচা কবরে এমন দীপ্তির প্রকাশ ঘটে যা রাজা-বাদশাদের মাযারে এর বিন্দু পরিমাণও লক্ষ করা যায় না, অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই তা অনুভব করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে জ্ঞানান্ধ ব্যক্তির কুরআন-হাদীসের দলীলের প্রতি চোখ বুলিয়ে নেয়া উচিত যে, খোদায়ী নূর সর্বতোভাবে সুন্নতের সাথে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত মাযার পাকা করাটা রাজ-রাজড়ার আয়েশী কল্পনার বিলাসী ফসল মাত্র যাতে নূরের ছোঁয়া আশা করা বৃথা। বলা বাহুল্য, মাযার পাকা করার মতো অবসরই তাদের কোথায় যাদের নিজ দেহের পর্যন্ত খবর থাকে না। এসব বিলাসিতা রাজ-রাজড়ার কল্পনা, দীনের সাথে সম্পর্ক যাদের শূন্যের কোঠায় এবং দিবা-নিশি যারা পাপাচারে বিভোর। আউলিয়াগণের অবস্থান এসব রঙিলা স্বপ্নের বহু উর্ধ্বে। জনৈক ধনী ব্যক্তি মূল্যবান একটি 'পুস্তীন' মাওলানা গাংগুহী (র)-এর খিদমতে হাযির করে বলল ঃ হুযূর! এটা ব্যবহার করুন! তিনি এক নবাবকে দান করে বললেন ঃ নবাব সাহেব! এটি আপনি ব্যবহার করুন। আপনার পোশাকের সাথে এটা সুন্দর মানাবে। এ মোটাসোটা পোশাক-আশাকে আমি আর কি সুন্দর দেখাব। পোকা-মাকড় থেকে এর হিফাযতের অবসরই বা আমার কোথায়। অযথা পড়ে পড়ে নষ্ট হবে আমার এখানে। এর চেয়ে ভাল আপনি কাজে লাগিয়ে ফেলুন।

মোটকথা—আউলিয়াগণ নিজ দেহের ব্যাপারে এসব ঝুট-ঝামেলায় থাকতে নারাজ, সে ক্ষেত্রে সমাধি-সৌধ রচনা করা তাঁদের মার্জিত রুচির বাইরের বিষয়। দ্বিতীয়ত, কবরের উদ্দেশ্য হলো—যিয়ারত দ্বারা মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। পার্থিব দুনিয়ার স্থিতিহীনতার রূপরেখা সামনে ভেসে ওঠলে কবর পাকা হোক কি কাঁচা তাতে কি যায় আসে। ভাঙা কবরেও মনে পরিবর্তন আসতে পারে। এতসব শাহী বালাখানায় মৃত্যু কিংবা আখেরাতের কথা চিন্তাই করা যায় না। যদি বলা হয়—এ ধরনের কবর দর্শন করাতে অন্তরে বুযুর্গদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মানের সৃষ্টি হয়, তাহলে আমি বলব ঃ এ ভালবাসা তাযিয়ার ন্যায় যে, তাযিয়া নির্মাণ ও শহীদানের শোকগাঁথা ব্যতীত কান্নাই আসে না। খাঁটি প্রেমের জন্য অত শত আয়োজনের দরকার পড়ে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সাহাবীগণের মহব্বতের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল, এ কথা কি কেউ বলতে পারে? সাহাবীগণ তাঁর ওযূর পানিটুকু পর্যন্ত মাটিতে পড়তে দেননি। হাতে হাতে উঠিয়ে চোখে-মুখে মলার জন্য তাঁদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা লেগে যেত। তা সত্ত্বেও তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর পাকা না করে বরং কাঁচাই রেখেছিলেন। কারণ কবর পাকা করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করে

গেছেন। অথচ তাঁর কবর পাকা করাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সাহাবীগণের ভক্তি ও ভালবাসার নির্মল দাবি। কিন্তু তাঁরা এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে সর্বদা বিরত রয়েছেন। বলা বাহুল্য, আউলিয়াগণের নিজেদের জান ও মাল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তুষ্টির অঙ্গনে ছিল নিবেদিত। তাঁর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের পরম পাওয়া। যদি বলা হয়—মাযার পাকা করাটা আউলিয়াগণের নিদর্শন অম্লান থাকার লক্ষণ। প্রথমত, এর জবাবে আমি বলব ঃ আল্লাহ্ তাঁদের স্থায়িত্বের যিম্মাদার। তাঁদের স্থিতি মানুষের আয়ত্তে নয়। লক্ষ করুন, পাকা কবরের বহু বাসিন্দা এমনও রয়েছে যাদের চিহ্ন পর্যন্ত কারো পরিচিত নয়। তবে কি কবর পাকা করাটাই স্থায়িত্বের উপায় ? আদৌ না। জানা দরকার—আউলিয়াগণ আপনাদের স্থায়ী রাখার মুখাপেক্ষী নন। নিজেদের সাধনা-কৃতিত্ববলেই তাঁরা চির অম্লান, চির ভাস্বর। আপন জ্যোতিতে তাঁরা উজ্জ্বল—জ্যোতির্ময়। আরেফ (র) বলেন—

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

—অমর-অক্ষয় সে ব্যক্তিসত্তা, প্রেমরসে যার অন্তর সজীব-সতেজ, লয় নাই তার ক্ষয় নাই স্মৃতি তার স্থায়িত্বের অঙ্গনে।

মাওলানা নিয়াযের ভাষায়—

طمع فاتحه از خلق نداریم نیاز
عشق از پس من فاتحه خانم باقی ست

—মানুষের ফাতিহা পাঠের বাসনা আমার নাই হে নিয়ায! মৃত্যুর পর আপন প্রেমই পিছনে আমার ফাতিহা পাঠকারী বাকি রইল।

দ্বিতীয় জবাব এই যে, স্মৃতিচিহ্ন বাকি রাখার এটাও একটা উপায় যে, কবর কাঁচা রেখে প্রতি বছর মাটি ফেলে তাতে লেপপোচ দেয়া এবং আবর্জনামুক্ত রাখা। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কেবল সে সকল বুযুর্গের কবরই পাকা করা হয় তাদের নিজের বিশ্বাসমতে যারা সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাদের ধারণায় সুন্নতের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসারী বুযুর্গদের কবর সাধারণত কাঁচাই রাখা হয়। সুতরাং হযরত শায়খ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর মাযার কাঁচাই রাখা হয়েছে—সেখানে নারীদেরও সমাগম হয় না। তাঁর কবরের আশেপাশের লোকদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলল ঃ হুযূর ছিলেন শরীয়তের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তাই এসব তাঁর কবরের পাশে বৈধ রাখা হয়নি। তাহলে এর অর্থ

দাঁড়ায়—অন্য বুযুর্গরা যেন শরীয়তের অনুসারী ছিলেন না। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, এ কথার মর্ম ফলত আপন বুযুর্গদের ওপর শরীয়তের অনুসারী না হওয়ার অপবাদ আরোপের নামান্তর। সুতরাং এ কারণেও এহেন কাজ অবশ্য বর্জনীয়।

শরীয়তে কবর পাকা করা নিষিদ্ধ হওয়ার আরও একটি কল্যাণকর দিক লক্ষণীয় যে, বস্তুত এর দ্বারা শরীয়ত আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ দেখিয়েছে এভাবে যে, মানব বসতির সূচনা থেকেই পাকা কবরের রেওয়াজ চালু থাকলে বর্তমানে আমাদের পক্ষে ক্ষেত-খামারে ফসল করা তো দূরের কথা বাসের জন্য বাড়ি-ভিটা পাওয়াই কঠিন ছিল। কারণ এত অধিক পরিমাণে লোক কবরস্থ হয়েছে যে, বিশ্বের বা মাটির কোন অংশ মুর্দাশূন্য নয়। তাহলে বলুন, সবার জন্য কবর পাকা করা হলে আমাদের ঠিকানা হতো কোথায় ? অগত্যা পাহাড়সম দোতলা, তিনতলা কিংবা ততোধিক সুউচ্চ কবর দেয়ার অনিবার্যতা দেখা দিত। অথচ কবর কাঁচা রাখার মধ্যে বিস্তর সুবিধা। পুরাতন কবরের চিহ্ন মুছে গেলে একই স্থানে পুনরায় কবর খোঁড়া যায়। তদুপরি জমি ওয়াকফকৃত না হলে দীর্ঘদিন পর তাতে ফসলও করা যায় যদি মৃতের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়া নিশ্চিত হয়। বর্তমানকালের জনসংখ্যার দৃষ্টিতে জরিপ করলেই এর প্রমাণ পাওয়া কষ্টকর নয় যে, সকল স্থানেই মুর্দা রয়েছে কেননা একই সময় এত পরিমাণ জীবিত লোকের বিশ্বে ছয়-সাত হাজার বছরের সুদীর্ঘ এ পরিমণ্ডলে কত অসংখ্য পরিমাণ লোক বাস করতে পারে ? জনপ্রতি কবরের জন্য জমির পরিমাণ হিসেব করা হলে পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তনে কুলাবার কথা নয়। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের প্রতি লক্ষ্য করেই সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীদের মন্তব্য ঃ "আজকে সকল মানুষ জীবিত থাকলে মাটিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলা ভার ছিল।" মোটকথা, কবর পাকা করা হলে এ সমস্যার সৃষ্টি হতো। অথচ কবরবাসীদের স্থানেই আজ আমরা বাস করছি, আমাদের দাফন চলছে। তাদের দেহ মিশ্রিত মাটি দ্বারাই আমরা বাড়ি তৈরি করছি। আমাদের ব্যবহারের থালা-বাসন, লোটা-ঘটি-বাটি সবই আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহ গলিত মাটির তৈরি। উপরন্তু অস্তিত্বহীন করার উদ্দেশ্যেই মৃত্যুর আগমন। সুতরাং স্থায়িত্বের এত সব আয়োজন অর্থহীন প্রচেষ্টা মাত্র। কেউ বলতে পারে—কবর থেকে ফয়েয লাভের কারণে একে বাকি রাখা জরুরী। হ্যাঁ, আমিও এটা স্বীকার করি, কিন্তু সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কেননা কবর থেকে প্রাপ্ত ফয়েয দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি কিংবা উন্নতি ঘটে না। তবে লাভ এতটুকু হয় যে, অধ্যাত্ম পথের পথিকের খানিকটা সহায়তা মিলে যার স্থায়িত্ব অতি অল্প সময়ব্যাপী। এর দৃষ্টান্ত যেমন চুলার ধারে বসা ব্যক্তি সামান্য উত্তপ্ত হয় বটে,

কিন্তু উঠে গেলেই পুনরায় ঠাণ্ডা বাতাসে তার শরীর শীতল হয়ে আসে। কিন্তু এ পথের পথিক যে নয় তার ভাগ্যে ফয়েযের ছোঁয়া বিন্দুমাত্র না লাগাই স্বাভাবিক। অবশ্য জীবন্ত বুযুর্গের ফয়েয এরূপ, যেন শক্তিশালী ঔষধ সেবনে সারা শরীরে শক্তি সঞ্চার হয় এবং শরীর সবল-সতেজ হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রথমত সে পথের পথিকের কবর থেকে ফয়েয অর্জনের প্রয়োজনই পড়ে না, জীবিত শায়খ তার পক্ষে কবর অপেক্ষা অধিক উপকারী। দ্বিতীয়ত প্রয়োজন যদিওবা পড়ে কোন অধ্যাত্মবাদীর জন্য কবর পাকা হওয়া অথবা না হওয়াতে কিছুই যায় আসে না। তিনি তো নিদর্শন দ্বারাই বুঝে নেবেন এখানে কোন্ বুযুর্গ শায়িত। সুতরাং এ যুক্তিও কার্যকরী নয়। —আল ফাযুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৫৬

**২৪. রবিউল আউয়ালের নির্দিষ্ট তারিখে মিলাদ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, শরীয়তসম্মত ব্যবস্থাপনা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।**

মন চায় পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কিছু বলি। কেননা এটা মহানবী (সা)-এর বিশ্ব জগতে আগমনের মাস। এ সময়ে তাঁর স্মরণেচ্ছা অন্তরে তীব্র হয়ে ওঠে এবং এর জন্য তাতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ মাসে মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনা তাঁর সাথে ভালবাসারই নিদর্শন যদি তা ইসলাম বিরোধী আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথামুক্ত হয়। কিন্তু আজকের মিলাদ অনুষ্ঠান প্রচলিত রেওয়াজ আশ্রয়ী হওয়ার দরুন মুফতিগণকে দুঃখের সাথে এর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতে হচ্ছে। নতুবা মূলত এটা কোন বিরোধীয় কিংবা বিতর্কের বিষয় ছিল না। কিন্তু "মুনাফা অপেক্ষা ক্ষতি নিবারণ আগে দরকার" এ নীতির আশ্রয়ে বাধ্য হয়ে মুফতিগণ এ পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, জন্মগতভাবেই মুসলিম জাতি রাসূলপ্রেমিক। যার জন্য এর তাবলীগ ও প্রচার ওয়াজিব নয়, মুসতাহাব। কিন্তু ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনা বৈধ ও মুসতাহাব হওয়ার শর্ত হলো শরীয়তবিরোধী আচার-অনুষ্ঠান থেকে তা মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এখন মাসআলার হিসেবে সূফী এবং আলিমগণের মধ্যে মানগত বিরোধ রয়েছে। সূফী সম্প্রদায়ের মতে—মুস্তাহাব কাজ কোন অবস্থাতেই বর্জন করা চলবে না, অবশ্য ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের সংস্কার করতে হবে। পক্ষান্তরে আলিমগণের মতে সময় বিশেষে স্বয়ং মুস্তাহাব কাজটি বর্জন করা ব্যতীত তার সংশোধন সম্ভব নয়। কাজেই সে কাজটিকেই সাময়িকভাবে বর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে আলিমদের মতই গ্রহণীয়। কেননা সূফীগণ মূলত ভাবাবেগে পরিচালিত, পরের ও সমাজের

কল্যাণ চিন্তা এবং সে ব্যবস্থার গুরুত্ব তাঁদের নিকট গৌণ। এ কথা কেবল সেসব সূফীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা নিরেট সাধক, হক্কানী আলিম নন। কিন্তু আলিমরা সমাজের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক যাদের রায় অব্যবস্থাপকদের মতের ওপর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আলিম ও সূফী এ-দুজনের ব্যবধান লক্ষ্য করুন। যেমন মহামারীর সময় সকল চিকিৎসক ঐক্যবদ্ধ রায় দিল—বর্তমান সময়ে আমরূদ খাওয়া ক্ষতিকর। এ সত্ত্বেও কোন চিকিৎসক আমরূদ খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ না করে পরিমিত পরিমাণে খেতে থাকে, কিন্তু অপরজন নিজে আমরূদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। তার ধারণা, আমি হয়তো পরিমাণ বজায় রেখে খেয়ে যাব কিন্তু আমার ন্যায় অন্যদের পক্ষে তো পরিমাণ বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই তারা অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদে পতিত হবে। তার চেয়ে ভাল, নিজেই বর্জন করে দেই। সুতরাং সে নিজেও খায় না অপরকেও ঢালাওভাবে নিষেধ করে। এমনকি ঝুড়িসহ গর্তে নিক্ষেপ করে দেয়। এমতাবস্থায় দর্শকরা মনে করে, আমরূদের প্রতি এই জনের আগ্রহ কম। আর খাচ্ছেন যিনি, তিনি বড় আমরূদপ্রিয় লোক। কিন্তু জ্ঞানী মাত্রই বুঝতে পারে দ্বিতীয়জনের আগ্রহ সবার তুলনায় বেশি কিন্তু জনগণের মঙ্গল চিন্তায় তার এহেন আচরণ। এখন বলুন, অনুসরণীয় কোন্ জন ? দ্বিতীয়জন অবশ্যই। কেননা তার ব্যবস্থাই কল্যাণধর্মী আর সবার নিকট প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং এমনি অবস্থা একজন সূফী ও একজন আলিমের মধ্যে। সূফী-সাধকরা মনের আগ্রহ দমন না করে মুস্‌তাহাবের ওপর আমল করেন, সাথে সাথে অবৈধ কার্যকলাপ সংশোধনেরও ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু আলিমগণ সমাজের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি দাবিয়ে রাখেন এবং দৃশ্যত মুস্‌তাহাব কাজও বর্জন করে বসেন। কারণ তিনি জানেন—এছাড়া অবৈধ কর্মকাণ্ড নির্মূল করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বন্ধুগণ ! চারদিকে মিলাদের আয়োজন দেখে আমাদের কি মন চায় না এতে শরীক হই ? কিন্তু একমাত্র জনকল্যাণ কামনায় আমরা ইচ্ছা শক্তিকে দাবিয়ে রাখি।

—নূরুল আনোয়ার, পৃষ্ঠা ৫

এ পর্যায়ে "মহানবী (সা)-এর জীবনী আলোচনায় আমরা অন্তরায় সৃষ্টি করি" বলে মানুষ আমাদের দুর্নাম রটায়। استغفر الله। আল্লাহ মাফ করুন। রাসূল-(সা)-এর আলোচনা, তাঁর প্রেম-ভালবাসা তো আমাদের ঈমানের অঙ্গ। তাহলে ঈমান-বিষয় থেকে কোন মুসলমান কি নিষেধ দিতে পারে ? আসলে বরং রাসূলের আলোচনার সাথে জড়িত অসিদ্ধ-অনৈসলামী কর্মকাণ্ড সমাজ থেকে উৎখাত করাই আলিমদের মূল উদ্দেশ্য। আর উক্ত আলোচনার চল্‌তি ধারা অব্যাহত থাকা অবস্থায় এ কাজ সম্ভব

নয়। তদুপরি নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক অনুষ্ঠান ওয়াজিব নয় তাই তাঁরা মূল বিষয় তথা শর্তসাপেক্ষ মিলাদ মাহ্ফিলকেই নিষেধ করে দেন।

এসব অবৈধ কাজের মধ্যে কিয়াম করাও একটি। এ ব্যাপারে সর্বসাধারণের আকীদা-বিশ্বাস বর্তমানে শরীয়তের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কিয়ামের ব্যাপারেও মানুষ আলিমদের বদনাম রটায় যে, এটা তো রাসূল (সা)-এর যিক্র অথচ মাওলানারা এটাকেও বাধা দেয়। জনৈক আলিম এর সুন্দর জবাব দিয়েছেন যে, আসলে আমরা রাসূল (সা)-এর সম্মান করাকে নিষেধ করি না বরং সম্মানের নামে তাঁর অসম্মান থেকেই আমাদের নিষেধ। কেননা মিলাদ অনুষ্ঠানে আল্লাহ্র যিক্রের কালে তো তোমরা কিয়াম করা থেকে বিরত থাক। তাই মিলাদ মাহ্ফিলের বক্তা ও শ্রোতা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই দাঁড়ানো অবস্থায় যদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তবে আমাদের কোন নিষেধ নেই। মজার ব্যাপার হলো, এ ধরনের আপত্তি কেবল আলিমদের বিরুদ্ধেই উত্থাপন করা হয়, সূফীদের বিরুদ্ধে নয়। অথচ কোন কোন সময় তাঁরা আলিম সমাজ অপেক্ষা কঠোর নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সুতরাং হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্র দরবারে এক ব্যক্তি জোরে আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করে। তিনি বললেন ঃ বের করে দাও একে দরবার থেকে। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন নকশ্বন্দী তরীকার পীর। আর এ-তরীকায় মনের হাল দমন রাখার নিয়ম, এমন কি আল্লাহ্র যিক্র পর্যন্ত এ তরীকায় নীরবে করতে হয়। উচ্চকণ্ঠে যিক্র করা এ-তরীকার নীতির বাইরে। এরই প্রেক্ষিতে ছিল তাঁর এ কঠোর নির্দেশ। উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণের দায়ে দরবার থেকে বের করে দেয়ার হুকুম দৃশ্যত নির্দয়-নিষ্ঠুরই ছিল। কোন আলিম এ আচরণ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়া পর্যন্ত জারি হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, দেখ, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণে তিনি বারণ করেন। কিন্তু সূফীদের বেলায় এ জাতীয় কোন আপত্তি উঠতে দেখা যায় না। আসল মর্ম এ থেকেই শীঘ্র বুঝে আসে যে, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণের দায়ে নয় বরং তাকে বের করা হয়েছে মনের অবস্থা দমন করতে না পারার অপরাধে। আনুষঙ্গিক অবস্থাদৃষ্টে হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে ব্যক্তির দমন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে অবহেলা করেছে। এ বিশ্বাস না থাকলে তাঁর পক্ষে এধরনের হুকুম না দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এ মর্মে মনীষী শেখ সা'দী বলেছেন ঃ

دمادم شراب الم در کشند

وگر تلخ بینند دم در کشند

به تسلیم سر در گریباں برند

چوں طاقت نماند گریباں درند

—সদা-সর্বদা প্রেমের মদিরা তারা পান করে থাকে, আর যদি অতিশয় তিক্ততা অনুভব করে তখন বিরত থাকে। আনুগত্যের আকারে মস্তক আঁচলে আবৃত রাখে, অক্ষম ও অধৈর্য হয়ে পড়লে আঁচল ছিঁড়ে ফেলে।

আলিমদের অবস্থাও তদ্রূপ, তাযীমার্থে কিয়াম করাকে তারা নিষেধ করেন না, বরং সম্মানের নামে শরীয়তের সীমালংঘন করা থেকেই তাঁদের যত নিষেধ যা ইসলামের নামে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু সমাজে বেচারাদের দুর্নাম। তাঁদের উক্তির মর্ম অনুধাবনের কোনই চেষ্টা করা হয় না, অথচ ইসলামের হিফাযতের উদ্দেশ্যে নিজের নাম-বদনামের তাদের কোনই পরোয়া নেই। যার যা ইচ্ছা বলুক। 'আটাওয়া'তে জনৈক গাজীপুরী মৌলভী আমাকে বলল ঃ দেওবন্দী আলিমদের তাকওয়া-পরহেযগারীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি, সবাই তাদের ভক্ত। কিন্তু একটি মাত্র বিষয়ে তাদের ওপর মানুষের আপত্তি যে, আপনারা কিয়ামের বিরোধী। একে সমর্থন করে নিলে সারা জাহান আপনাদের গোলামে পরিণত হয়ে যেত। আমি বললাম ঃ গোটা দুনিয়ার মানুষ আমাদের ভক্ত হোক কিংবা অভক্ত তাতে কিছুই আসে যায় না। সব আমাদের মনিব হয় হোক, তাই বলে ইচ্ছা করে আমরা অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে পারি না। —ঐ...পৃষ্ঠা-৫২

## ২৫. পাঞ্জেগানা নামায, ফজর কিংবা আসরের পর সমবেতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করা বিদআত।

আজকাল বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেক নামাযের পর অথবা ফজর কিংবা আসরের পর সকল মুসল্লি মিলিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে নিয়মিতভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু যিক্রে প্রবৃত্ত হয়। অথচ বুযুর্গরা সাধারণভাবে সবার জন্য নয়, বরং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে এ নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা এটাকে সবার জন্য নিয়মিত প্রথা বানিয়ে নিয়েছে। এ জন্যই আলিম সমাজ এটাকে বিদ'আতরূপে চিহ্নিত করেছেন। এখন তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়—শোন ভাই সকল! আলিমরা বলে ঃ আল্লাহর যিক্র করাও নাকি বিদ'আত। হায়রে আলিমদের বিপদ! কোন দলই তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু সুবিজ্ঞ সূফীকুল সন্তুষ্ট এবং আলিমদের যথার্থ মর্যাদাও তাঁরা দিয়ে থাকেন। সুতরাং বিজ্ঞ সূফী আল্লামা শা'রানী বলেন ঃ সূফীদের পথ অতি সূক্ষ্ম, যা সাধারণ লোকের জ্ঞানের ঊর্ধ্বের বিষয়। তাই সাধারণ মানুষ সূফীদের অনুসরণ না

করে বরং আলিম সমাজের অনুসরণ করা উচিত। কেননা আলিমগণ সমাজ পরিচালক। শরীয়তের বিধি-বিধান এবং জাগতিক শান্তি-শৃংখলা একমাত্র আলিম সমাজের পদাংক অনুসরণেই বজায় থাকা সম্ভব। আমার শ্রদ্ধেয় মামা বলতেন—আলিম সমাজের অস্তিত্ব বর্তমান না থাকলে মানুষকে আমরা কাফির বানিয়ে ছাড়তাম। কেননা আমাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের জ্ঞানের বাইরে, ভুল বোঝাবুঝির দ্বন্দ্বে পড়ে তারা ঈমানই হারিয়ে ফেলত। আলিমদের বিশেষ অনুগ্রহ যে, তাঁরা মানুষের ঈমান রক্ষার উপায় নির্দেশ করেছেন। কাজেই আলিমদের প্রতি অসন্তুষ্ট আর তাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী হে সূফীকুল! তাদের অনুগ্রহ স্বীকার কর, যেহেতু আলিম সমাজের কল্যাণেই নিরাপদ আশ্রয়ে এবং শান্তিতে বসে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিক্র করা সম্ভব হচ্ছে। শান্তি রক্ষাকারী পুলিশের মূল্য বুঝে আসে গভীর রাতে যখন শান্তির বিছানায় গা এলানো হয়। সুতরাং আলিমরা পুলিশের ন্যায় পাহারার আড়ালে মানুষের ঈমান রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। এ দায়িত্ব তারা ত্যাগ করে বসে গেলে সূফী সাহেবকে খানকার বাইরে এসে এ কাজে অগ্রণী হতে হবে। নতুবা তার আত্মিক সাধনা আর আধ্যাত্মিক উন্নতি সবই উচ্ছন্নে যাওয়ার যোগাড় হবে। মানুষের চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব সম্পাদন করা "ফরযে কিফায়া", আলিমরা এ কাজ ত্যাগ করলে সূফীদের মোল্লা হওয়া ফরয হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এই শান্তিরক্ষা বাহিনী বর্তমান থাকা পর্যন্তই তোমার গাঠুরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত। রাতের বেলা তোমরা নিশ্চিন্তে বেঘোর নিদ্রায় অচেতন, চোখ খুলতেই নামায-যিক্রে বসে পড়। আর আলিমদের অবস্থা তো এই যে, ইসমাঈল শহীদ (র) রাতের আঁধারে সাইয়্যেদ সাহেবের মেহমানদের পা-টিপে দিতেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন—সাইয়্যেদ সাহেবের ভৃত্য আমি। জবাব শুনে তারা চুপ করে যেতেন। বহুদিন পর রহস্য জানা গেল যে, মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের কাজ এটা। এটা ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গদের বৈশিষ্ট্য। এর চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা শুনেছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান সম্পর্কে। শুনলে শরীর শিউরে ওঠে—কি প্রকারে যে নিজের অস্তিত্বকে তাঁরা বিলিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটা হলো—একবার তাঁর বাড়িতে জনৈক মেহমান আসে, তার সাথে একজন কাফিরও ছিল। দুপুরের গরমে তারা শুয়ে পড়লে চুপে চুপে তিনি ঘরে ঢুকে সে হিন্দু অতিথির পা-টেপা শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ঘটনাক্রমে আমি তখন জেগেছিলাম, অবস্থা দেখে আমি অবাক ও ভীত হয়ে আরয করলাম—হুযূর! একি করছেন ? বললেন ঃ বেচারা ক্লান্ত, ওর অবসাদ দূর করছি। আমি বললাম ঃ হুযূর! আল্লাহ্র ওয়াস্তে মেহেরবানী করে

আপনি সরে যান। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেই তো ক্লান্ত, তদুপরি মেহমান, তাই আরাম কর। জানি না কতক্ষণ তিনি এ কাজে লিপ্ত ছিলেন, আর সে তো নিদ্রায় বিভোর। হবেই না বা কেন, কাফিরের চোখ তো খোলে মরার পর, আযাবের ফেরেশতা হাজির হলে। আসলে এরা জেগেই ঘুমায় কিনা। যাহোক মাওলানা বস্তুত খোদাই প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন বলেই এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। আজকালের কোন সূফী-সাধক এ ধরনের নযির স্থাপন করেছেন বলে তো শোনা যায় না। তাহলে আলিমদের বিরুদ্ধে জাবর কাটে তারা কোন্ মুখে ? —আর্ রাগবাতুল মারগূবাহ্, পৃষ্ঠা ৩০

**২৬. গদীনশীনী মীরাসী সম্পত্তি নয়, নিছক প্রথা বিশেষ।**

সাম্প্রতিককালের গদীনশীনী মীরাসী সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, গদীতে চাই গাধাই চড়ে বসুক। এক সময় তো পীর সাহেব মুরীদের মাথায় খিলাফতের পাগড়ি পরাতেন, আর পীরের ইনতিকালে বর্তমানে মুরীদরা পীরের মাথায় খিলাফতের পাগড়ি বেঁধে পীরযাদাকে গদীতে বসায়। আর কি এক মুহূর্তে সে সবার পীর হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড, আজীব সব কারবার। আমাদের হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব স্থানকেন্দ্রিক এ গদীপ্রথা সমূলে উচ্ছেদ করে নিজের গদীকে তিনি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে গেছেন। তাই দেখা যায় এক গদী তাঁর গংগূহ্‌তে অপরটি দেওবন্দে [অর্থাৎ, মাওঃ কাসেম নানুতুবী (র)]। এমনিতর আরো বিভিন্ন স্থানে বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা কেন্দ্রীভূত গদীকে তিনি বিচ্ছিন্ন আকারে ছড়িয়ে দেন। আমি তো বলি—কেন্দ্রীভূত না হয়ে বরং গদী নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়াতেই অধিক মর্যাদা। পীরের গদী একই কেন্দ্রে অনড় থাকাতে তেমন বিশেষত্ব নেই। সুতরাং উত্তমরূপে বুঝে নিন—খিলাফত মীরাসী সম্পদ নয়। আমার নিজের ঘটনাই বলি ঃ জুমআর নামাযের স্থায়ী ইমামতির জন্য মহল্লাবাসীরা একবার আমাকে খুব করে ধরল। কয়েকটি শর্ত আরোপ করে আমি সম্মত হই। ১. ইমামতি আমার মীরাসী সম্পত্তি গণ্য হবে না। ২. আমার ওপর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা চলবে না, যেকোন সময় দায়িত্ব ত্যাগ করার আমার অধিকার থাকবে। অতঃপর আমি ঘোষণা দিলাম—জনগণের প্রবল আগ্রহে আমাকে এ-দায়িত্ব নিতে হচ্ছে, স্পষ্ট ভাষায় বলছি, এতে আমার কোন অধিকার থাকবে না, অধিকন্তু আমার মীরাস এতে জারি হবে না। আমার ইমামতি কারো মনঃপূত না হলে চাই সে যে কেউ হোক—জোলা কিংবা কসাই হোক কাগজের টুকরায় "আপনার ইমামতি আমার পসন্দ নয়" মন্তব্য লিখে আমার নামে ডাক বাক্‌সে ফেলে দিলেই হলো। কসম খেয়ে বলছি, কোন জোলাও যদি না-পসন্দ করে সেদিন থেকেই আমি

ইমামতি ত্যাগ করব। এ ধরনের পাকাপাকি বন্দোবস্তের মাধ্যমে মীরাসের ছিদ্র বন্ধ করে তখন আমি ইমামতি করেছি। কিছুদিন পর নিজেই আমি ছেড়ে দিয়েছি। মোটকথা, ইমামতির ন্যায় গদীনশীনীও আজকাল মীরাসী সম্পত্তির রূপ ধরেছে আর মানুষও এটাকে তাযীম-তোয়ায দেখায়। তারা মনে করে এরই মধ্যে সবকিছু আয়-বরকত নিহিত। কিছুই না, সব প্রথার পূজা! বর্তমান পীর সাহেবদের মধ্যে আরো একটা রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায় যে, গদীতে বসার পর খানকার বাইরে আর তাদের দেখা যায় না। ভাগলপুর সফরে গিয়ে একবার শুনলাম সেখানকার জনৈক পীর সাহেব গদীতে আসীন হওয়ার পর আজ চল্লিশ বছর যাবৎ একনাগাড়ে খানকার বাইরে পা রাখেন না। তার মুরীদরা একথা গর্ব করে প্রচার করে বেড়ায়। আমি বললাম ঃ তিনি কি নারী না পর্দানশীন মহিলা ? পুরুষতো সে-ই, খোলা তরবারি হাতে যে ব্যক্তি ঘুরাফিরা করতে সাহসী। একই স্থানে অনড় থাকা পুরুষত্বের লক্ষণ নয়। অবশ্য অক্ষমতা কিংবা বিশেষ কোন অসুবিধা থাকে তো স্বতন্ত্র কথা। অত শত ব্যবস্থার পর বিশেষ কারণে কোন গদীনশীন পীরকে আদালতে তলব করা হলে তাকে হাজিরা থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। কেননা আজকালের পীরগণ আদালতে হাজির হওয়াকে আত্মমর্যাদাহানিকর মনে করে। কিন্তু আমার এটা বোধগম্য নয় এতে অপমানের কি আছে। কানপুরের এক মোকদ্দমা, কোন অবস্থাতেই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছিল না। অবশেষে হাকিম বললেন, আপনাদের কাউকে সালিস নিযুক্ত করে ফয়সালা করুন, অতঃপর আদালতের পক্ষ থেকে এটাকেই জারি করে দেয়া হবে কোর্টের রায় হিসেবে। উভয়পক্ষ এতে সম্মত হয়। পরে আদালতের পক্ষ থেকে কয়েকজন আলিমের নাম প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু দুইপক্ষ একমত হতে পারেনি। অবশেষে আমার নাম প্রস্তাব করা হলে উভয়পক্ষ সম্মত হয়। যাহোক, সাক্ষী হিসেবে আমার নামে সমন আসে। এতে আমার কোন কোন বন্ধু আমার আদালতের হাজিরা অপমানকর মনে করে। আমি বললাম ঃ এতে অপমানের কি আছে, এটা তো বরং সম্মানের বিষয় যে, আমার কথায় মামলার ফয়সালা চূড়ান্ত হবে। যাহোক, আদালতে উপস্থিত হয়ে আমি বক্তব্য রাখি, যাতে আঠারো বছরের পুরানো মোকদ্দমা ফয়সালা হয়ে যায়। একবার বেরেলী গেলাম। সেখানকার সরকারী প্রধান কর্মকর্তা জ্ঞানী-গুণীজনদের সাক্ষাতপ্রয়াসী ছিলেন। আমার সাথেও সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখনো আমার কোন কোন সুহৃদের মত ছিল জেন্ট সাহেব স্বয়ং এখানে আসুন, এতেই সম্মান। আর হুযূর যাওয়াতে আমাদের অপমান। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম—তিনি এখানে আগমন করলে আমাকেই তাঁর সাদর-সম্ভাষণ জানাতে হবে।

আর আমি গেলে আমার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা, সাদর-সম্ভাষণের বন্দোবস্ত করতে হবে তাকে। যাহোক, আমি নিজেই গেলাম। তিনি আমার যথেষ্ট আদর-সমাদর করলেন। এটা তো ছিল আমার বন্ধু-বান্ধবের রুচিভিত্তিক জবাব। নতুবা আসল কথা হলো আল্লাহ্ তাদেরকে রাজত্বের অধিকারী বানিয়েছেন, শাসককে শাসিতের স্তরে নামিয়ে আনতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আল্লাহ্ সে জাতিকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছেন। কাজেই শিষ্টাচারের দাবি অনুসারে সে ধরনের আচরণই তার প্রাপ্য। এর জন্য কোন সরকারী কর্মকর্তা আমার সাক্ষাত চাইলে আমি নিজে তার কাছে যাওয়াটা পসন্দ করি। কিন্তু লোকাচার ও প্রথাকেন্দ্রিক সমাজে আজকাল এটাকে আত্মমর্যাদাহানিকর এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী মনে করা হয়।

যাহোক, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—"গদীনশীনীকে মীরাসী সম্পত্তিভুক্তকরণ" সংক্রান্ত দুষ্টপ্রথা। এর কুফল আরো লক্ষণীয়। কোন এক হিন্দু জমিদারীতে জনৈক কাজী সাহেব একজন বেনিয়ার নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সে কোর্টে নালিশ করাতে কাজী সাহেবের বিষয়-আশয় মায় ইমামতির আমদানি পর্যন্ত নিলামে ক্রোক হয়ে যায়। উল্লেখ্য, কাজী সাহেব এক ঈদগার ইমামও ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রণিধানযোগ্য। তার উপস্থিতিতে একবারের ঈদের ঘটনা ছিল এরূপ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ ঈদের জামাত পড়ার উদ্দেশ্যে ঘটনাক্রমে আমিও সে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। লক্ষ্য করি, জামা-কাপড় পাল্টে স্থানীয় লোকজন ঈদগাহে পৌছে ইমাম সাহেবের অপেক্ষায় বসে আছে। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল ধুতি-পরা লালাজী এগিয়ে আসছে। লালা সাহেব পৌছতেই লোকদের মধ্যে শোর পড়ে গেল—ইমাম সাহেব এসে গেছেন। আমি তো একেবারে থ, ইয়া আল্লাহ্! এ-আবার কেমন ইমাম। হিন্দু বেনিয়া কি পড়াবে তাহলে ঈদের নামায ? অতঃপর প্রথমত সালাম দিয়ে সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলল, ভাইগণ, ঠিক আছে ? সবাই বলল, জী হ্যাঁ, সব ঠিক। এরপর সে কাপড় বিছিয়ে দেয়, আর সবাই এতে টাকা-পয়সা ফেলতে থাকে। সবার দেয়া সারা হলে সব টাকা হিসেব করে খাতায় জমা দিল যে, এ বছর ঈদের আমদানি এত টাকা! পোট্লা বেঁধে কাঁধে ফেলে ফের বলল, ভাইসব! এবার আসতে পারি ? সবাই বলল, জী-আসতে পারেন। এরপর সালাম করে সে বাড়ির পথে রওয়ানা দিল। আর লোকজনও নামায, খোত্বা ছাড়াই বাড়ির পথে পা বাড়াল। বর্ণনাকারী অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, ভাই সাহেব! ঈদের নামায কি হবে না ? এতক্ষণে লোকেরা আসল ঘটনা রহস্যমুক্ত করল। যার সারমর্ম এই ঃ ইমাম সাহেব উক্ত বেনিয়ার নিকট ঋণগ্রস্ত, তাই কোর্টে নালিশ করে আদালতের ডিক্রিবলে সে কাজী সাহেবের ঈদগার আমদানি পর্যন্ত

ক্রোক করিয়ে নেয়। কাজেই কয়েক বছর যাবত তার ঈদগায় আগমন ও ইমামতি বন্ধ। কিন্তু আমাদের আসা-যাওয়া ঠিকই আছে। আমরা যথারীতি আসি, টাকা দেই আর বেনিয়া সেগুলো পোটলা বাঁধে। বিগত কয়েক বছর যাবত অবস্থা এই চলছে যে, নামায-কালাম তো বন্ধ, আমরা কেবল চাঁদা গণি। এই হলো—ইমামতি আর কাজীগিরি মীরাসী সম্পত্তি হওয়ার কুফল যে, হিন্দু বেনিয়া পর্যন্ত যার আয়-আমদানি নিলাম ডেকে ক্রোক করিয়ে নিতে পারে। গদীনশীনী মীরাস হওয়ার অপর কুফল হলো এই—বুযুর্গদের নামে প্রদত্ত টাকা-পয়সা, আয়-আমদানি অসৎ পথে এমনকি পতিতালয়ে পর্যন্ত উড়ানো হচ্ছে। যার ফলে হাজার হাজার ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিনাশ হয়ে গেছে। বুযুর্গদের খানকার নামে ওয়াকফ করা সম্পত্তি মীরাসী স্বত্বের কারণে তাদের উত্তরাধিকারগণই এর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে যোগ্যতার কোন বাছবিচার নেই। বর্তমানে এতে মালিকানাস্বত্ব দাবির কারণে বহু ওয়াকফ সম্পত্তি বিলীন হয়ে গেছে। —ইসলাহু-যাতিল বাইন, পৃষ্ঠা ৪২

**২৭. শিশুদের ঈদগাহে আনা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি সন্দেহের জবাব ঃ**

ঈদগাতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এতে জমায়েত হওয়া বর্জন করা সমর্থনযোগ্য নয়। আর ছোট শিশুদের সাথে আনার প্রবণতা আমাদের দূর করা উচিত। এ ব্যাপারে নতুন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—

جنبوا مساجدكم صبيانكم

—"শিশু-বাচ্চাদেরকে তোমরা মসজিদ থেকে দূরে রাখ।" ঈদগাহ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয় মনে করে সম্ভবত কেউ দলীল হিসেবে উক্ত হাদীস যথেষ্ট মনে না-ও করতে পারে। তাই এর জবাবে আমরা বলব مساجدكم শব্দের অন্তরালে দু'টি অর্থের অবকাশ রয়েছে ১. হয়তো এর ব্যাপকার্থটি মেনে নিতে হবে, যার অর্থ অনির্দিষ্ট নামাযের স্থান। এমতাবস্থায় উক্ত হুকুমে ঈদগাহের অন্তর্ভুক্তি সুস্পষ্ট, ২. নতুবা সে অর্থে স্বীকার না করা। এমতাবস্থায় দৃশ্যত যদিও ঈদগাহ মসজিদের শামিল নয় কিন্তু উক্ত হুকুমের কারণ আমাদের খুঁজতে হবে। সুতরাং পবিত্রতা রক্ষা করাই এর মূলীভূত কারণ। শিশুরা মূলত পাক-পবিত্রতা রক্ষা করতে অক্ষম। এদের যাতায়াতে নামাযের স্থান অপবিত্র এবং নামাযীদের মনের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা প্রবল। আর উক্ত কারণ মসজিদের ন্যায় ঈদগাহেও সমভাবে বিদ্যমান। তাই সে হুকুম ঈদগার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ঈদগাহ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন

ولیعتزلن الحیض المصلی ঃ (অর্থাৎ ঋতুমতী মহিলারা নামাযের স্থান তথা ঈদগাহ থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়)। উক্ত উপমা থেকে স্পষ্ট হয় যে, কোন বিষয়ের বাস্তবায়ন কাম্য না হওয়ার বেলায়ই কেবল এ বিধি প্রযোজ্য হবে। নতুবা বিষয়টির ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরসন করে আমরা সে হুকুম বর্জন না করে পালন করাই উচিত।

—ইকমালুস-সাওম ওয়াল ঈদ, পৃষ্ঠা ৬

## ২৮. মহানবী (সা)-এর এমন প্রশংসা করা জায়েয নহে যদ্দ্বারা পূর্ববর্তী নবীগণের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, কোন কোন নির্ভরহীন পুস্তিকার অসারতা প্রমাণ ঃ

একবার মহানবী (সা) জনৈক সাহাবীর উদরে অঙ্গুলি চেপে ধরলে সাহাবী বললেন ঃ আমি এর শোধ নেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) "ঠিক আছে নিয়ে নাও" বলে সাথে সাথে তার সামনে নিজের উদর বাড়িয়ে দিলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পেট ছিল উন্মুক্ত, আর আপনার তো কাপড়ে ঢাকা। শোনা মাত্র তিনি জামা উঠিয়ে দিলেন। উক্ত সাহাবী তাঁর উদর মুবারক জড়িয়ে ধরে ভক্তির চুমায় চুমায় সিক্ত করে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। 'ওফাতনামা' পুস্তিকায় লোকেরা হযরত উক্কাসের মনগড়া অলীক কাহিনী রটিয়েছে যা বাস্তবতা বিবর্জিত। বাস্তব ও সত্য ঘটনা তা-ই যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। আমাদের এতদঞ্চলে মেয়ে মহলে প্রচলিত ও বহুল পঠিত পুস্তিকাদি সবই মনগড়া অবাস্তব কাহিনীর অবাঞ্ছিত সমাহার। এগুলো বর্জন করা উচিত। যেমন—স্বপননামা, মু'জিযা আলেনবী, ওফাতনামা, নূরনামা, মি'রাজনামা, আলী মুহাম্মদ ইত্যাদি। অবশ্য 'মু'জিযা হরিণী' সত্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তিকা। অপর একটি ষষ্ঠপদী কাব্যের চমকপ্রদ ও রঙ্গীলা ছন্দ নিম্নরূপ ঃ

مری بار کیوں دیر اتنی کری

—আমার বেলায় তোমার এত বিলম্ব কেন?

আলোচ্য কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ, কোনখানে নবীগণের নবুয়তপ্রাপ্তির প্রতি হিংসা প্রকাশ আর কোথাও রাজা-বাদশাহের রাজত্ব লাভের প্রতি লোভ আর না পাওয়ার ক্ষোভ প্রকাশের পর লেখক ক্ষোভানলে দগ্ধ পরাণে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে কাব্য গড়ায় যে, এসব দয়া-অনুগ্রহ, দান-খয়রাত থেকে আমায় কেন বঞ্চিত রাখা হলো? এ জাতীয় বই-পুস্তক নিজের কাছে রাখা এবং পাঠ করা তো দূরের কথা বিনা দ্বিধায় এগুলো অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

করার যোগ্য। 'মু'জিযা আলেনবী' পুস্তকে বর্ণিত হযরত আলী (রা)-এর ঘটনা যে, "আপন পুত্রকে তিনি ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং ভিক্ষুক পরে তাকে বিক্রি করে দেয়" সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মনগড়া অলীক কাহিনী। তেমনি হযরত উক্কাসের নামে রটানো রসালো বিবরণও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। —মুযাররুল-মাসিয়ত, পৃষ্ঠা ৬

কোন কোন লেখক ও ওয়ায়েয কর্তৃক মহানবী (সা)-এর আংশিক ফযীলত এমন ঢংয়ে এবং বিচিত্র রংয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, যদ্দ্বারা অন্যান্য নবীর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, যা তাঁদের সাথে বে-আদবীপূর্ণ আচরণের শামিল।

মাওলানা থানভী (র) বিষয়টিকে পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

ক. কোন কোন গ্রন্থকার অন্যান্য নবী (আ)-এর ওপর মহানবী (সা)-এর সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সযত্ন প্রয়াস চালায়। তাদের চেষ্টা-গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি অঙ্গনে সকল অংশে সমভাবে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত প্রমাণ করা। এর অনুকূলে কুরআন-হাদীসের কোন সূত্র থাকুক বা না-ই থাকুক। অথবা 'নস্' তথা কুরআন ও হাদীসের দলীল তাদের দাবির বিরোধী হোক কিংবা এর ফলে অন্যান্য নবী (আ)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যাক, তাতে তাদের কোন পরোয়া নেই। নিজের দাবি তো প্রতিষ্ঠিত হলো! এ জাতীয় প্রয়াস অবাঞ্ছিত—অনভিপ্রেত। কেননা মহানবী (সা)-এর সার্বিক ও সামগ্রিক ফযীলত এবং শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত, কিন্তু আংশিক বা আনুষঙ্গিক কিংবা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য অপর কারো পক্ষে প্রমাণিত হওয়াটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী নয়, অথবা তাঁর মর্যাদায় কোন ত্রুটি আসারও কথা নয়। যেমন কারো দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া হযরত ইয়াকুব (আ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ নয়। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ)-এর রূপ-লাবণ্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস وهو قد اعطى شطر الحسن (অর্থাৎ রূপের অর্ধেক তাঁকে দান করা হয়েছে) দ্বারা প্রমাণিত। এখন এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সৌন্দর্য হযরত ইউসুফ (আ) অপেক্ষা অধিক প্রমাণের চেষ্টা করা স্বয়ং তাঁর হাদীসের বিরোধিতা এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর অনিন্দ্য রূপে খুঁত বের করার নামান্তর। যা একজন মহামান্য নবীর শানে চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। অবশ্য কথাটা এভাবে গুছিয়ে বললে উভয়কূল রক্ষা পায় যে, সৌন্দর্য দুই প্রকার ১. যা দেখামাত্রই দর্শককে বিস্মিত করে দেয়, কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে তা সীমিত আকার বিশিষ্ট। ২. যা প্রথম দৃষ্টিতে দর্শকের চোখে তাক লাগায় না বটে, কিন্তু তা নিম্নোক্ত ছন্দের প্রয়োগক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হতে পারে। যেমন—

يزيدك وجهه حسنا – اذا ما زدته نظرا

—"তাঁর প্রতি যতই তুমি দৃষ্টিপাত করবে তার চেহারার রূপের ছটা তত বেশি তোমাকে মুগ্ধ-বিমোহিত করে তুলবে।" প্রথমটিকে 'ঊষার কিরণ' আর দ্বিতীয়টিকে 'পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো' আখ্যায়িত করা যায়। সুতরাং প্রথমটির হিসেবে হযরত ইউসুফ (আ) সৃষ্টিকুলের সেরা সুন্দর আর দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টিতে আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা)।

—মাকালাতে হিকমত, পৃষ্ঠা ১১, দাওয়াতে আবদিয়ত, ১ম খণ্ড

খ. সম্প্রতি কেউ কেউ মহানবী (সা)-এর জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। (যেমন মাওলানা শিবলী রচিত 'সীরাতুন্নবী') তাতে মহানবী (সা)-কে সকল বৈশিষ্ট্যের আধার এবং পূর্ণাঙ্গ মানব প্রমাণের অন্তরালে বিগত নবীগণের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে অন্যান্য নবী (আ)-এর মর্যাদায় আঘাত হেনে এবং সমালোচনার ভঙ্গিতে 'সীরাতুন্নবীর' গ্রন্থকার লিখেন ঃ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, রাজ্যশাসনের অপরিসীম যোগ্যতা, সীমাহীন দয়া ইত্যাদি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিত্বের সহজাত বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে অন্যান্য নবী (আ)-এর কারো মধ্যে ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব, কারো মধ্যে দয়ার দীনতা, কারও চরিত্রে এ-গুণ ছিল না, কারও চরিত্রে অমুক বৈশিষ্ট্যের স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এর দ্বারা একদিকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসাই করেছেন কিন্তু প্রকারান্তরে এতে অন্যান্য নবীর সমালোচনাও করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে এই হলো তার আচরণ। এর একটি দৃষ্টান্ত এভাবে চিত্রিত করা যায়, যেমন আপন পিতার প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করলাম, তাকে সন্তুষ্ট করলাম কিন্তু তার ভাইকে করলাম অপমান। এ ধরনের প্রশংসা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুশি হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? অতঃপর গ্রন্থকার তার দাবির সমর্থনে প্রমাণ পেশ করে বলেছেন ঃ দেখুন নূহ (আ)-এর মধ্যে দয়ার মাত্রা অল্প ছিল, মায়ার উপাদান ছিল না। ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্বে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার উপাদান স্বল্প মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়, তিনি ছিলেন দরবেশী জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মূল্যবান কাগজ ও সুশ্রী টাইপে মুদ্রিত আলোচ্য গ্রন্থ আমার সামনে পেশ করা হয়। গ্রন্থখানার বাহ্যিক অবয়ব অতি চমৎকার, কিন্তু এর অন্তর্ভাগ—"নূহ (আ) ছিলেন দয়াশূন্য, ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্বে রাজনৈতিক চিন্তাধারা অবর্তমান" ইত্যাদি কুৎসিত ও কদাকার বক্তব্যে ভরপুর। এ-যে হযরত আম্বিয়াগণের শানে কত বড় ধৃষ্টতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বন্ধুগণ! এটা কি করে জানা গেল যে, নবীগণের ব্যক্তি সত্তায় এসব উপাদান ছিল না। উপাদানের অস্তিত্বের জন্য তা প্রকাশ পাওয়াও কি অনিবার্য ? এক ব্যক্তি সম্পর্কে

শ্রুতি রয়েছে—লোকটি বড় দাতা, আপনি তার কাছে গেলেন এমন এক সময় যখন সে কাউকে কিছুই দান করছে না। তাই আপনি মন্তব্য করলেন—লোকটির দানশীলতার শ্রুতি ও খ্যাতি মিথ্যা—বানোয়াট। এমতাবস্থায় আপনার সম্পর্কে মন্তব্য হবে—ভাই সাহেব! আপনার গমন অসময়ে, দানের সময় গিয়ে দেখুন বুঝতে পারবেন তিনি কত বড় দানবীর। অনুরূপ আম্বিয়াগণের ব্যক্তিসত্তায় সকল বৈশিষ্ট্যের যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যখন যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয় তখন তা প্রকাশ পাবে। বস্তুত হযরত নূহ (আ)-এর দয়ার আন্দাজ করা যায় যদি তাঁর সাড়ে নয় শ বছর ব্যাপী আপন কওমের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করার প্রতি তাকানো হয়। কেননা এতসব সত্ত্বেও জাতির বিরুদ্ধে তাঁর মুখ থেকে অভিসম্পাত বাক্য উচ্চারিত হয়নি। এর চাইতে মহানুভবতা আর কি কল্পনা করা যেতে পারে ? পারবে কি ইতিহাস এর কোন নজীর উপস্থিত করতে ? অতঃপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন নির্দেশ এল انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن অর্থাৎ "ইতিমধ্যেই যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া এখন নতুন করে তোমার কওমের আর কেউ ঈমান গ্রহণ করবে না।" এরপরই কেবল তাঁর মুখে বদ্‌দোয়া উচ্চারিত হয়েছিল। বোঝা গেল তাঁর দু-ধরনের অস্ত্র ছিল। একটি দোয়া, অপরটি বদ্‌ দোয়া। সাড়ে নয় শ বছর ব্যাপী তিনি দোয়ার হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো—দ্বিতীয় অস্ত্রটি নিক্ষেপ কর। এখন যেদিকে আল্লাহ্‌ সেদিকে তিনি। সুতরাং লক্ষ্য করুন—দয়া ও ধৈর্যের কি চরম পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন যে, সাড়ে নয় শ বছর অবধি কওমের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করেছেন অথচ তাঁর মুখ থেকে বদ্‌দোয়ার বাণ নিক্ষিপ্ত হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থকারের সমালোচনার অপর পাত্র হলেন হযরত ঈসা (আ)। তার মতে "তিনি ছিলেন ফকীর-দরবেশ। সভ্যতা ও রাষ্ট্র পরিচালন-নীতি তাঁর শিক্ষায় ছিলই বা কবে? তাঁর শিক্ষা তো ছিল এই যে, "কেউ তোমার একগালে চড় দিল তো অপরটা তুমি এগিয়ে দাও।" গ্রন্থকার কর্তৃক ঈসা (আ)-এর হক আদায় করার এই হলো নমুনা। আমার কথা হলো—"হযরত ঈসা (আ) রাজনৈতিক চেতনাহীন ছিলেন", গ্রন্থকারের এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব তারই ওপর। কেননা কোন কিছু অদৃশ্য বা লুপ্ত থাকাটা সেটির অস্তিত্বহীনতার পরিচায়ক নয়। দ্বিতীয়ত, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ) রাজত্ব করবেন, তাঁর শাসনামলে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রশক্তি বিলীন হয়ে যাবে এবং সারা জাহানের শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতের মুঠোয় ঠাঁই নেবে। সুতরাং তাঁর সত্তায় রাজনৈতিক চেতনা যদি বিদ্যমান

না-ই থাকল তাহলে তাঁর দ্বারা এত বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করা কি করে সম্ভব ? এটা এক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। গ্রন্থকারের ভাষায় কি তাহলে মেনে নিতে হবে যে, হযরত ঈসা (আ) ছিলেন রাজনৈতিক চেতনাহীন অসার ব্যক্তিত্ব ? এই হলো অবস্থা। যার কল্পনায় যা আসে তাই সে লিখে দেয়। খুব ভাল করে শুনে রাখুন আম্বিয়া (আ)-গণের ব্যক্তি-সত্তায় সৃষ্টিগতভাবেই যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের উপাদান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় আল্লাহর তরফ থেকে যখন যেটা ব্যবহারের হুকুম আসে। —আল-হায়াত, পৃষ্ঠা ২১

গ. পরিতাপের বিষয়, দর্শনবাদী কোন কোন লেখকও এ রোগে আক্রান্ত। আমার তো প্রাণ কেঁপে ওঠে এ ধরনের কল্পনায়। সুতরাং জনৈক লেখক হযরত মূসা (আ)-এর ওপর মহানবীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় বলেছে ঃ "হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) সাওর গুহায় কাফেরদের আগমন আশংকায় ভীত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বললেন ঃ لا تحزن ان الله معنا (চিন্তিত হয়ো না আমাদের সাথে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্)। প্রথমত لا تحزن (চিন্তা করো না) বাক্য দ্বারা আবূ বকর (রা)-এর চিন্তা লাঘব করেছেন। অতঃপর ان الله প্রথমে বলে "তাঁর সাথে আল্লাহ্ রয়েছেন" একথা বলার সময় معنا বহুবচন দ্বারা আবূ বকর (রা)-কেও নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ)-এর সাথীরা সৈন্যসহ ফেরাউনের আগমনাশংকায় ভীত হয়ে পড়লে তিনি বললেন ঃ كلا ان معى ربى سيهدين (কখনো নয়, আমার রব নিশ্চয়ই আমার সাথে রয়েছেন, যিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন)। এতে প্রথমে كلا সতর্কমূলক শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। আরবী বাকধারায় كلا শব্দটি সতর্ক ও হুঁশিয়ারমূলক অর্থে প্রয়োগের রীতি প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে كلا দ্বারা গালে চড় লাগিয়ে তাদেরকে যেন সাবধান করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর ربى (আমার রব) এর পূর্বে معى (আমার সাথে) কথাটি উল্লেখ করেছেন। লক্ষ করুন—ভাষার কি চমৎকার ভঙ্গিমা! গ্রন্থকার হযরত মূসা (আ)-কে যেন বাকরীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যে, হুযূর! নিজের আগে আল্লাহ্কে উল্লেখ করা আপনার উচিত ছিল। তিনি যেন কথা বলার ধরন সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। অধিকন্তু গ্রন্থকার মহানবীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ মূসা (আ) معى শব্দটি একবচনে প্রকাশ করে আল্লাহ্র সাহচর্যকে আপন সত্তায় খাস করেছেন, নিজের কওমকে এতে শরীক করেন নি। উক্ত গ্রন্থকারের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে আমার অবাক লাগে—তার কলমে এ ধরনের লেখা আসল কিভাবে! আমি তো বলব ঃ سخن شناس نئی دلبر اخطا اینجاست (অর্থাৎ বন্ধু তুমি মর্ম বোঝ নাই, ভুলটি তোমার এইখানে)।

প্রথমত, আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি বিষয়ে তার আলোচনার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মহানবীর সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতই যথেষ্ট। এর জন্য সূত্রবিহীন খণ্ডিত ফযীলত প্রমাণের প্রয়াস অর্থহীন এবং পণ্ডশ্রম মাত্র। তা সত্ত্বেও কথা বলার এতই যার শখ—বলার আগে তার ভাবা উচিত যে, হযরত মূসা (আ)-এর শ্রোতা কারা আর মহানবীর সম্বোধন কার প্রতি। কেননা ভাষালংকার শাস্ত্রের নীতি হলো—স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বাক্য প্রয়োগ করা। সকল ক্ষেত্রে কথার ধরন অভিন্ন নয়। কবির ভাষায় ঃ هر سخن نکته و هر نکته مقامے دارد (অর্থাৎ স্থান ভেদে প্রত্যেক বাক্যের মর্ম ও রূপান্তর ভিন্ন জাতের হয়ে থাকে)।

প্রমাণকারীর যুক্তির বিপক্ষে সম্ভাবনার অস্তিত্ব তার দলীল বাতিলের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং সে সম্ভাবনার দৃষ্টিতে আমি বলব হযরত মূসা (আ)-এর সামনে হযরত সিদ্দিক (রা)-এর ন্যায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তিনিও সে একই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করতেন যা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)। তদ্রূপ হযরত মূসার কওম মহানবীর শ্রোতা হলে তিনিও তাঁর ন্যায় একই বাক্যে সম্বোধন করতেন। ঘটনা হলো—আবূ বকর (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা হিজরতের উদ্দেশ্যে সাওর গুহায় আত্মগোপন করেন। আবূ বকর (রা)-এর আশংকা হয় গুহার গর্ত থেকে সাপ-বিচ্ছু বের হয়ে হয় তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দিতে পারে। তাই তিনি লুঙ্গি কিংবা চাদর টুকরা করে গর্তের সকল ছিদ্র বন্ধ করে দেন। কিন্তু টুকরা শেষ হয়ে যাওয়ায় একটি মাত্র ছিদ্র বাকি থেকে যায়। সেটি বন্ধ করার কিছু না পেয়ে নিরুপায় আবূ বকর (রা) নিজের পা চেপে ছিদ্রের মুখ আলগে রাখেন। যেন মহানবীকে বিষাক্ত কোন প্রাণী দংশন করতে না পারে। ছোবল যদি মেরেই বসে তা যেন তাঁর নিজের পায়েই লাগে। অবশেষে এক পর্যায়ে সাপ তাঁর পায়ে দংশন করেই বসল। নীরবে তিনি সাপের কামড় সহ্য করেন। এই ছিল তাঁর আত্মনিবেদনের অবস্থা। এমতাবস্থায় তাঁদের খোঁজে অনুসন্ধানকারী কাফেরদের আগমনে নিজের জীবনের নয়, বরং মহানবীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর এ আশংকার মূলে ছিল—কবির ভাষায় ঃ عشق است و هزار بد گمانی (অর্থাৎ কুৎসিত শত ধারণার বিপরীতে চির অম্লান সে নির্মল প্রেম)।

বস্তুত হযরত আবূ বকর (রা)-এর অন্তর আল্লাহ্র প্রতি অটল ভরসায় সমৃদ্ধ ছিল। এহেন ভক্তের দুর্ভাবনা লাঘবের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনা হিসেবে মহানবীর উক্তি প্রথমত لا تحزن অতপর আল্লাহ্র সান্নিধ্যে তাকেও শামিল করে নেয়াটাই ছিল যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়ত এক্ষেত্রে সীমিতকরণ উদ্দেশ্য ছিল না, তাই বাক্যগঠন প্রণালীর

আওতায় আল্লাহ্‌র যিক্‌রকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিয়ে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ ان الله معنا। (আল্লাহ্ স্বয়ং আমাদের সাথে রয়েছেন।) পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ)-এর সাথীরা হযরত সিদ্দীকের ন্যায় আল্লাহ্ নির্ভরশীল কিংবা এমন নিবেদিতপ্রাণ ছিল না যে, নিজেদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থেকে তারা বেপরোয়া হয়ে কেবল মূসা (আ)-এর জীবন নিয়েই শংকিত থাকবে। বরং আপন প্রাণের মায়ায়ই তারা বিভোর ছিল এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তা প্রকাশও করেছে। কুরআনের বাণীই তার প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ قال اصحاب موسى انا لمدركون (অর্থাৎ মূসার সাথীরা বলল—আমরা তো পাকড়াও হয়ে যাচ্ছি)। আয়াতে, 'ইন্না', 'জুমলা ইসমিয়া' এবং 'লাম তাকীদ' এ তিনটি তাকীদ বর্ণিত হয়েছে যার অর্থ দাঁড়ায়—অবশ্যই আমরা ধৃত হবই। অথচ ফেরাউনের মুকাবিলায় মূসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র দেয়া সাহায্য একাধিকবার তারা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ্‌রই হুকুমে এবং মূসা (আ)-এর প্রতি সাহায্যের আশ্বাসবাণী শুনেই তারা প্রথমে মিসর থেকে রওয়ানা হয়েছিল। এতসব সত্ত্বেও তারা ছিল ধরা পড়ার দৃঢ় বিশ্বাসে কম্পিতপ্রাণ। এটা তাদের অপক্ক ঈমান এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরহীনতারই প্রমাণবাহী। কাজেই মূসা (আ) ধমকের সুরে তাদের গালে كلا (হতেই পারে না) শব্দের চড় বসিয়ে দিলেন যে, খবরদার এমনটি কখনো হতে পারে না। তাদের ধরা পড়ার আশংকা প্রকাশের উত্তরে এখানে كلا এর ন্যায় জোরালো ভাষায় তাকীদপূর্ণ শব্দ প্রয়োগই ছিল যথার্থ। অতঃপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে তারা আল্লাহ্‌রই সাহচার্য থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই "পরের শব্দ পূর্বপদে উল্লেখ করা সীমিত অর্থবোধক" ব্যাকরণের নিয়মের প্রেক্ষিতে হযরত মূসা (আ) বহুবচনের স্থলে معى (আমার সাথে) একবচন ব্যবহার করেছেন। উদ্দেশ্য—আমার পালনকর্তা আমারই সাথে রয়েছেন, দুর্বল ঈমানের দরুন তোমরা তাঁর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত। এখন বলুন—মহানবী (সা) হযরত মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাইলেও কি لا تحزن ان الله معنا বাক্যই প্রয়োগ করতেন ? অলংকারশাস্ত্রে সামান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্র আদৌ এটা সমর্থন করতে পারেন না। তিনি বাধ্য হবেন একথা বলতে যে, এ ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে মহানবী (সা)-কেও মূসা (আ)-এর ন্যায় একই বাকরীতিতে কথা বলতে হতো। এখন দেখুন, আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পরিণাম এমনি হয় যে, একজন নগণ্য শিক্ষার্থীও বিপরীত সম্ভাবনার যুক্তিতে বক্তার বক্তব্য বাতিল করে দিতে সক্ষম। এ জন্য মহানবীর ফযীলত বর্ণনায় বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করত সর্বদা নীতিগত আলোচনায় সীমিত থাকাই কর্তব্য। —আররাফ'উ ওয়াল-ওয'উ, পৃষ্ঠা ৪৬

২৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রচলিত অর্থে আল্লাহ্র প্রেমাস্পদ আখ্যা দেয়া চরম বেআদবী।

কেউ কেউ মহানবী (সা)-কে আল্লাহর প্রেমাস্পদ আখ্যা দেয়। কবিরা তো না'তে রাসূলের উপর বিভিন্ন ছন্দ রচনা করে। বস্তুত প্রেমিককে অস্থির করে তোলাই হলো ভালবাসার প্রতিক্রিয়া। অথচ আল্লাহ্ অস্থিরতা থেকে পবিত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন দুঃসাহসী এ অস্থিরতা আল্লাহ্র ব্যাপারেও প্রমাণের প্রয়াসী। এখানে জনৈক কবির ছন্দ লক্ষণীয়। তিনি বলেন ঃ

پے تسکین خاطر صورت پیرا هن یوسف

محمد کو جو بهیجا حق نے سایه رکه لیاقد کا

"মহান আল্লাহ তাঁর প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলেন মহানবীর। সুতরাং প্রেমাস্পদের এ বিরহ জ্বালায় তিনি ছিলেন অস্থির-বেকারার, তাই সান্ত্বনার জন্য প্রেমাস্পদ মুহাম্মদের ছায়া তিনি আপনার কাছে রেখে দেন। হযরত ইয়াকুব যেমন ইউসুফের জামা রেখেছিলেন একই উদ্দেশ্যে।"

এটা মূলত না'ত তথা প্রশংসামূলক রচনা নয়, বরং আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে চরম বেআদবী। যা শুনাও গুনাহ আর এ ধরনের কথা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কোন কোন দীনদার ব্যক্তিও না'তে রাসূল বলতে আত্মহারা, এর বিষয়বস্তু শরীয়ত অনুযায়ী হোক বা নাই হোক। কোন কোন না'তে অন্যান্য নবীর প্রতিও এ ধরনের বেআদবীমূলক রচনা-ছন্দ লক্ষ করা যায়। মোটকথা, মহানবী (সা)-কে আল্লাহ্র মাশুক তথা ভালবাসার পাত্র সাব্যস্ত করাটা চরম ধৃষ্টতামূলক উক্তি। কারণ প্রেম একটা মানবীয় বৈশিষ্ট্য যদ্দ্বারা প্রেমিকের অন্তরে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ্ এ থেকে পবিত্র। অবশ্য এটা বলা যায়, তিনি আল্লাহ্র মকবুল ও প্রিয় বান্দা। উপরন্তু প্রেম-ভালবাসাকে আল্লাহ্র সাথে রূপক অর্থে সম্পৃক্ত করাও বৈধ নয়, যেহেতু এটা শরীয়তের অনুমোদিত বিষয় নয়। অবশ্য কোন প্রেমাসক্ত ও মত্ত ব্যক্তির উক্তি হলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিবেকবানের বেলায় এটা অনুমোদনযোগ্য নয়। মোটকথা, সৃষ্টিকুলের পারস্পরিক রূপক প্রেম-ভালবাসাকে নৈকট্যকামী বান্দাদের সাথে জড়িয়ে মহান আল্লাহ্র সাথে তুলনা করা বৈধ নয়।

—তারজীহুল মুফসীদা, পৃষ্ঠা ১৮০, দাওয়াতে আবদিয়ত, ষষ্ঠ খণ্ড

## ৩০. মৃতদের রূহ্ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে না।

সাধারণের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির রূহ্ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে কারো ওপর ভর করা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা প্রমাণসিদ্ধ নয়। যদিও কোন কোন বর্ণনায় এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কুরআনে কাফেরদের মরণোত্তর উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সে বলে থাকে ঃ

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَـرَكْتُ كَلاَّ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

—কাফের বলবে—হে রব! পার্থিব জীবনে আমায় ফিরিয়ে দাও, ফেলে আসা সৎকর্মগুলি আমি সম্পাদন করি, (জবাব আসবে) হতেই পারে না, এটা একটা কথার কথা যা সে আওড়াবে শুধু আর তাদের পেছনে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত বরযখের অন্তরায়।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে বোঝা যায় যে, মরণোত্তর জীবনে কাফেররা দুনিয়ায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করবে বটে, কিন্তু বরযখের ফলে তাদের সে আশা পূর্ণ হবার নয়। অধিকন্তু বিবেকের সাক্ষীও তাই। কেননা মৃত ব্যক্তি সেখানে সুখে থাকলে দুনিয়ার পংকিল আবর্তে সে মরতে আসবে কোন্ দুঃখে। আর আযাবে আবদ্ধ থাকলে পার্থিব সমাজে উপদ্রব আর বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ফেরেশতারাই বা ছাড়বেন কেন ? হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান নিযুক্ত রয়েছে। মৃত্যুর পর অবসরপ্রাপ্ত সে শয়তানই সম্ভবত কারো ওপর ভর করে মৃত ব্যক্তির নাম ভাঙ্গায়। অথবা ভিন্ন কোন শয়তানও হতে পারে। শয়তান সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يجرى من الانسان مجرى الدم او كما قال

—শয়তান মানুষের রক্তকণিকায় পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম।

মোটকথা, এসব কর্মকাণ্ড দুষ্টমতি জিন ও শয়তানের অপকর্ম। মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতিক্রিয়া বলে প্রচলিত ধারণা শুদ্ধ নয়। অবশ্য বলা যেতে পারে—প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য রূহের এখানে আসা জরুরী নয়, দূর থেকেও সম্ভব। জবাবে বলা হয়—এর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কেবল সম্ভাবনার ভিত্তিতে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সমর্থনে বিশুদ্ধ কোন দলীল উপস্থিত করা হয়।

—মুজাদালাতে মাদিলাত, পৃষ্ঠা ১৮, দাওয়াতে আবদিয়াত, সপ্তম খণ্ড

## গায়রে মুকাল্লিদীনদের প্রশ্নের উত্তর

### ৩১. কিয়াস ও ইজতিহাদ বাতিল সন্দেহের অবসান।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্যতম মৌল ভিত্তি কিয়াস বাতিল হওয়ার সন্দেহ কারো মনে না আসাই উচিত। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করে যে, কিয়াসের নামে মূলত অনুমান ভিত্তিক বিষয়ের অনুসরণ করা হয় যা প্রমাণসিদ্ধ নয়। কেননা ইজতিহাদযোগ্য বিষয়টি স্বভাবতই 'যন্নী' যা অকাট্য দলীলে প্রমাণিত নয়। বিশেষত কুরআন শরীফেও যে ক্ষেত্রে 'ইত্তিবা যন্ন' তথা অনুমানভিত্তিক বিষয় অনুসরণের নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الله شيئا –

—তারা কেবল অনুমান-নির্ভর বিষয়েরই অনুসরণ করে অথচ অনুমানসিদ্ধ বিষয় আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বিন্দুমাত্র রক্ষা করবে না।

আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—কিয়াসের বৈধতা শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং এটা শরীয়তসম্মত বিষয়, যার ওপর আমল করা ওয়াজিব। কাজেই এটা ما ليس لك به علم (যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই)-এর পর্যায়ভুক্ত নয়, বরং ما لك به علم (যে বিষয়ে তুমি অবহিত)-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা শরীয়তের প্রতিষ্ঠিত দলীল হিসেবে কিয়াসও ইলমের আওতাভুক্ত। অবশ্য কিয়াস সম্পর্কিত 'ইলম' প্রমাণসিদ্ধ না হওয়া সাপেক্ষে তার অনুসরণ অবশ্যই ما ليس لك به علم -এর আমলের পর্যায়ভুক্ত ছিল। কিন্তু বিষয়টা তদ্রূপ নয়। কিয়াসের ওপর আমল করা মূলত ما لك به علم - এরই অনুসরণরূপে গণ্য হবে। উত্তমরূপে জেনে নিন যে, ' কুরআন শরীফের নিন্দিত যন্ন এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় পারিভাষিক 'যন্' এক বিষয় নয়, কুরআনের পরিভাষায় বরং 'যন' একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। নিশ্চিত বাতিল এবং বিশুদ্ধ প্রমাণ বিরোধী বিষয়, উভয় ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সুতরাং পুনরুত্থান দিবসের অস্বীকারকারীদের বর্ণনায় ان نظن الا ظنا ব্যক্ত হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না, প্রাধান্য তো দূরের কথা বরং নিজেদের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে পুনরুত্থানকে তারা সত্যের পরিপন্থী মনে করত। তা সত্ত্বেও একে 'যন' তথা অনুমানই বলা হয়েছে। তাই বোঝা গেল কুরআনের পরিভাষায় 'যন' একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। যা মিথ্যা ও বাতিলের উপরও প্রযোজ্য। অতএব যনের নিন্দাপূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে—

ان يتبعون الا ما خلف الدليل القطعي وكل ما خلف الدليل القطعي لا يغنى من الحق شيئا بل هو باطل قطعا –

—তারা কেবল অকাট্য প্রমাণ বিরোধী বিষয়েরই অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় অকাট্য দলীল বিরোধী বিষয়ের কোন মূল্য নেই বরং তা স্পষ্টত মিথ্যা ও বাতিল। সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারা সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। —তাত্‌হীরুল আ'যা, পৃষ্ঠা ১০

**৩২. ইজতিহাদ রুদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব।**

গায়রে মুকাল্লিদ মহলের মন্তব্য—"ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেছে"–এ মর্মে হানাফীদের প্রতি ওহীর আগমন ঘটেছে কি ? জবাবে বলবো—প্রত্যেক জিনিস প্রয়োজন অনুপাতে হওয়াটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। যে ফসলের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন অধিক তাতেই বৃষ্টিপাতের চিরাচরিত বিধান। তদ্রূপ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই বায়ুর প্রবাহ আর শীতপ্রধান অঞ্চলে পশুর গায়ে পশমের আধিক্য লক্ষ করা যায়। এ জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে। তদ্রূপ হাদীস সংকলনের প্রয়োজন ছিল বলেই প্রাথমিক যুগে বিশ্ব বিশ্রুত প্রজ্ঞাবান মেধা ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম এবং বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু যুগ বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যময় ধারায়ই বর্তমানে তেমনটি হয় না। অন্যরা তো দূরের কথা স্বয়ং মুহাদ্দিসগণের মধ্যেও ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ন্যায় সনদসহ হাদীস মুখস্থ রাখার মত স্মরণশক্তির অধিকারী ব্যক্তিত্ব বর্তমানকালে বিরল। একইভাবে ইসলামী বিষয়সমূহ সংকলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই ইমামগণের মধ্যে ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনী শক্তি বর্তমান ছিল। এখন যেহেতু দীনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সংকলিত এবং নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত, কাজেই এখন ইজতিহাদের প্রয়োজন তখনকার তুলনায় নেই বললেই চলে। অবশ্যই প্রয়োজন অনুপাতে ইজতিহাদ করার যোগ্য ব্যক্তিত্ব বর্তমানেও বিরল নয়। (অর্থাৎ পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে নতুন নতুন প্রশাখাগত মাসআলা উদ্ভাবন করা।) —মুজদালাতে মা'দিলাত, পৃষ্ঠা ২৩, সপ্তম খণ্ড

**৩৩. বর্তমান পরিবেশে দীনের হিফাযতের লক্ষ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণ (تقليد شخصى) অপরিহার্য।**

একাধিক ব্যক্তির অনুসরণও মূলত জায়েয। যেমন কোন পীর সাহেবের নিকট থেকে কোন ওযীফা শিখে নেয়া, অপরজনের কাছ থেকে আরেকটি শিখা। এমনিভাবে একাধিক ব্যক্তিত্বের অনুসরণ মূলত জায়েয। পূর্ববর্তীগণের অবস্থা এই ছিল যে,

কখনো তারা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করে নিতেন আবার কখনো ইমাম আওযাঈর নিকট সমাধান চাইতেন। তাদের এ অবস্থার অনুকরণে বর্তমানেও কারো কারো মনে এভাবে সমাধান লাভের অভিলাষ জাগে। কিন্তু মূলত এটা জায়েয হওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিশেষ অন্তরায়ের দরুন তা নিষিদ্ধ। বিষয়টা পরিষ্কার বোঝার জন্য কিঞ্চিৎ ভূমিকার প্রয়োজন। তা হলো এই যে, সাধারণত বিজয়কালীন অবস্থাই বিচার্য হয়। সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা এবং তৎকালীন পরিবেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তখনকার মানুষের মধ্যে দীনদারী প্রবল ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ঘটনাক্রমে তারা মাসআলা জিজ্ঞেস করত, যার রায়ে অধিকতর সতর্কতা রয়েছে বলে বিবেচিত হতো তার রায় অনুসারে আমল করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং যদি সে একই অবস্থা, একই মূল্যবোধ আজ বর্তমান থাকে, তবে ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ এখনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অবস্থা তো এখন সে হালে স্থির থাকেনি। আর থাকবেই বা কিরূপে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ثم يفشو الكذب। অর্থাৎ উত্তম যুগের পর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষের অবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেবে। তাই ইসলামের সর্বোত্তম যুগ থেকে দূরত্ব যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের অবস্থা ততই খারাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখনকার স্বাভাবিক অবস্থা হলো—মতলব আর স্বার্থ উদ্ধার করা। আজকাল বিভিন্ন জনের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এই—যার মতে মতলব পুরা হয় তার ওপরই আমল করব। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক লোকের বিয়ে হলে পর জানা গেল স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শিশু অবস্থায় জনৈকা মহিলার দুধ পান করেছিল। এদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে আমার নিকট জানতে চাইল—এখন কি করা যায় ? আমি বললাম ঃ তাদের বিয়ে জায়েয নয়, বিচ্ছিন্ন করে দেয়া জরুরী। সে বলতে লাগল, এটা তো খুবই দুর্নামের কথা, বৈধতার কোন উপায় বের করেই দিন। আমি বললাম ঃ প্রথমত বিচ্ছেদের মধ্যে দুর্নাম নয়, বিচ্ছেদ না করাতেই বরং কলংক। কেননা মানুষ বলবে, দেখ, ভাই-বোনের দম্পতি বানিয়ে রেখেছে। দ্বিতীয়ত বদনাম যদি হয়ই তো হোক। শরীয়তের যখন এই হুকুম, তখন দুর্নামের কোন পরোয়া থাকতে পারে না। সে বলতে লাগল, সে তো পান করার পর বমিও করে ফেলেছিল। আমি বললাম ঃ বমি করুক বা না করুক হারাম হওয়ার ব্যাপারে একই কথা। আমার তরফ থেকে এরূপ পরিষ্কার জবাবের পর লোকটি দিল্লী পৌঁছে। সেখানে জনৈক আহলে হাদীসের সাথে তার সাক্ষাত হয়। কারো প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং তার মতলব সিদ্ধি করার অবস্থা ব্যক্ত করাই আমার লক্ষ্য। মোটকথা, মতলবের গরযে সে আহলে হাদীসের নিকট উপস্থিত হয় যে, সম্ভবত এখানে কোন উপায় করা যাবে। তথাকথিত

হাদীসপন্থী লোকটি তাকে বলল, পাঁচ চুমুকের চাইতে কম পান করে থাকলে হারাম সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তিনি এ মর্মে এক ফতোয়া জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিলেন যে, একটি ছেলে শিশুকালে জনৈকা মহিলার দুই চুমুক দুধ পান করেছিল, অতএব উক্ত মহিলার মেয়ের সাথে ছেলেটির বিয়ে জায়েয হবে কি-না ? সুতরাং তিনি জবাব লিখে দিলেন— لا تحرم المصة ولا المصتان অর্থাৎ এক চুমুক বা দুই চুমুক দুধ পান করা দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় না। লোকটি বড়ই খুশি হয়ে উক্ত ফতোয়া স্বামী-স্ত্রীর সামনে এনে উপস্থিত করল। ভাবখানা এই—এটাও তো আলিমেরই দেয়া ফতোয়া, এ ফতোয়ার ওপর আমল করাতে দোষের কি আছে ? যাহোক, আমি বলেছিলাম যে, আজকাল মানুষের মধ্যে এ ধরনের স্বার্থবাদী মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত, মিঞা! শিশু কয় চুমুক পান করছে তুমি কি বসে বসে গণছিলে? যদি ধরে নেয়া হয় চুমুকের সংখ্যা তার জানা ছিল, তাহলে এর ভিত্তিতে যারা বলছে হালাল তাদের ফতোয়া তো মেনে নেয়া হলো কিন্তু হারাম ফতোয়াদানকারীদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করা হলো। অথচ হালাল ফতোয়াদানকারী ব্যক্তি তার মাযহাবভুক্ত লোকও ছিল না। তবে হ্যাঁ, প্রথম থেকে সেও যদি এ মাযহাবেরই অনুসারী থাকত, তবে কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সে তো তাদের মাযহাবভুক্ত ছিল না। ভিন্ন মাযহাবে স্বার্থের আলামত লক্ষ করেই তাতে সে ভিড়ে গেছে। অতএব দীনের ওপর পার্থিব স্বার্থকেই সে প্রাধান্য দিল। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো—কোন কোন আলিমও এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত যে, ইজতিহাদযোগ্য ও বিরোধপূর্ণ মাসআলায় অন্য ইমামের রায়ের ওপর আমল করাতে দোষের কি আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) انما الاعمال بالنيات বাণী দ্বারা এর মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, নিয়তের ওপরই আমলের ফলাফল নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল অন্য ইমামের মাযহাবের ওপর দীন হিসেবে আমল করা হয় না বরং পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে এরূপ করা হয়। আল্লামা শামী বর্ণনা করেছেন—জনৈক ফকীহ্ একজন মুহাদ্দিসের নিকট তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কন্যার পিতা উক্ত ফকীহ্কে জবাব দিলেন, বিয়ে দিতে রাযী, কিন্তু শর্ত হলো, রাফএ ইয়াদাইন ও আমীন বিল-জিহ্র করতে হবে।[১] যাহোক শর্ত মোতাবিক প্রস্তাবিত মুহাদ্দিস-কন্যার সাথে উক্ত ফকীহর বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কোনও বুযুর্গের সামনে ঘটনা বর্ণনা করা হলে শোনার পর কিছুক্ষণ অধোমুখে মৌন থাকার পর তিনি বললেন ঃ লোকটির ঈমান চলে গেছে বলে আমার আশংকা হয়। কেননা ইতিপূর্বে যে

১. নামাযের মধ্যে দুই হাত ওঠানো এবং সূরা ফাতিহা শেষে জোরে আমীন বলাকে যথাক্রমে রাফ'-এ ইয়াদাইন ও আমীন বিল-জিহ্র বলা হয়।

আমলটি সে সুন্নত মনে করে পালন করত, শরীয়তের কোন দলিল ছাড়াই কেবল দুনিয়াবী গরজে স্বীয় মাযহাব বর্জন করছে। এই হলো মানুষের স্বার্থবাদী চিন্তার বাস্তব চিত্র। এমতাবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণকে (تقليد شخصى) যদি অপরিহার্যতার মর্যাদা দেয়া না হয়, তবে অবস্থা এই দাঁড়াবে, প্রত্যেক মাযহাব থেকে সবাই যার যার সুবিধাজনক মাসআলাই গ্রহণ করবে। যথা—ওযূ করার পর রক্ত বের হলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুসারে ওযূ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব অনুসারে নষ্ট হয় না। অতএব এখানে সে শাফিঈ মাযহাব গ্রহণ করবে। কিন্তু ওযূ অবস্থায় সে যদি স্ত্রীর গায়েও হাত লাগায়, তবে শাফিঈ মাযহাব মতে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুসারে নষ্ট হবে না। তাই এক্ষেত্রে সে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করবে। অথচ অবস্থা এই যে, এমতাবস্থায় কোন ইমামের মতেই ওযূ বহাল থাকবে না। ইমাম আবূ হানীফার মতে তো রক্ত প্রবাহের দরুন আর ইমাম শাফিঈর মতে স্ত্রীকে ছোঁয়ার কারণে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু স্বার্থের মোহে কোন পরোয়াই তার থাকবে না, নির্ভয়ে সে প্রত্যেক ইমাম থেকে মতলবের অনুকূল মতটাই গ্রহণ করবে আর স্বার্থবিরোধী রায় পরিত্যাগ করবে। অতএব দীন তো নয়, থাকবে কেবল মতলবের ধান্ধা। এই হলো আমাদের এবং পূর্ববর্তীগণের মধ্যকার ব্যবধান। তাদের মধ্যে ছিল তাক্ওয়া ও দীনদারীর প্রাধান্য, তাদের আচার-আচরণে স্বার্থ ও মতলবের বালাই ছিল না। পক্ষান্তরে আমাদের মন-মস্তিষ্ক স্বার্থবাদী চিন্তায় আচ্ছন্ন, আমরা ব্যক্তিস্বার্থে নিমগ্ন এবং মতলবের গোলাম। কাজেই আমাদের জন্য "তাক্লীদে শাখ্সী" তথা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুসরণের প্রয়োজন অধিক। অবশ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাক্লীদকে মৌলিকভাবে ফরয-ওয়াজিব বলি না বটে, কিন্তু এর দ্বারা দীনের সংরক্ষণ সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হয়। আর তাক্লীদ বর্জন করাতে দীনের সংরক্ষণ নস্যাৎ হয়ে যায়। উপরন্তু তাক্লীদ বর্জিত অবস্থায় সকল মাযহাবের মধ্য হতে অধিকতর সতর্কপূর্ণ বিষয়টি সন্ধান করে আমল করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এতে বিপদের মাত্রা শুধু বাড়িয়ে তোলাই সার। আর অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়ের অনুসন্ধান করাটা স্বার্থপরতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। অতএব তাক্লীদ করার মধ্যেই শান্তি, তদুপরি নফসের পূর্ণ হিফাযতের নিশ্চয়তা বিদ্যমান। মুজতাহিদগণের মধ্য হতে ব্যক্তি বিশেষের তাক্লীদের ন্যায় নিজের অনুসৃত মাযহাবের নির্ভরযোগ্য আলিমগণের মধ্য হতে কোনও একজনকে অনুসরণীয় সাব্যস্ত করার মধ্যেও একই হিকমত ও উপকারিতা নিহিত। কেননা যুগের পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। বর্তমানে চলছে মতলব আর স্বার্থের দৌরাত্ম্য। দ্বিতীয়ত একই মাযহাবভুক্ত আলিমগণের মধ্যেও

বিভিন্ন মাসআলায় মতবিরোধ বিদ্যমান। তাই অনুসরণের ক্ষেত্রে কোনও একজনকে নির্দিষ্ট না করার মধ্যে স্বার্থের বেড়াজালে আট্‌কে পড়ার সমূহ আশংকা থেকেই যায়। অধিকন্তু "নিজের পছন্দমত আলিমের রায় মেনে নিল আর অন্যদের অভিমত পরিত্যাগ করা হলো" এ-অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকে না।
—ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ৩৪

**৩৪. "মুকাল্লিদগণ হাদীসের পরিবর্তে ইমামগণের রায়ের ওপর আমল করে"—এ অভিযোগের জবাব।**

ইমামগণের তাকলীদের ব্যাপারে কোন কোন মুকাল্লিদ এত গোঁড়ামিতে লিপ্ত যে, ইমামের উক্তির বিপরীত সহীহ্ হাদীসকে সে নির্ভয়ে রদ করে দেয়।

এ কথা চিন্তা করলে আমার তো শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। এ ধরনের এক ব্যক্তির মন্তব্য হলো ঃ

قال قال بسیار است
مرا قال ابو حنیفه درکار ست

অর্থাৎ কালা কালা তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস তো কতই আছে, কিন্তু আমার প্রয়োজন কেবল আবূ হানীফার উক্তি। এ বাক্যের অন্তরালে রাসূল (সা)-এর হাদীসের প্রতি চরম ধৃষ্টতা ও বে-আদবী প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ্ এ জাতীয় গোঁড়ামি থেকে রক্ষা করুন। এদের ভাব-ভঙ্গি দ্বারা প্রমাণ হয় ইমাম আবূ হানীফাই যেন তাদের মূল অনুসরণীয়। তাহলে এ তাকলীদকে কেউ যদি "নবুয়তের শরীক" বলে আখ্যায়িত করে তাতে তার অন্যায়টা কি হবে? কিন্তু দু-চারজন মূর্খের অবস্থা ভিত্তি করে সমস্ত মুকাল্লিদকে "নবুয়তের শিরকে লিপ্ত" বলে অভিযুক্ত করাটাও ভুল কথা। আল্লাহ্ না করুন সমস্ত মুকাল্লিদ এরূপ কেন হবেন। আমার অন্তরে তাকলীদের অর্থ হলো—আমরা ইমাম আবূ হানীফার ব্যাখ্যা অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের ওপর আমল করে থাকি। কেননা আমাদের মতে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ আসনে আসীন, এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা। তাঁর ফকীহুল উম্মত হওয়াটা গোটা উম্মত কর্তৃক স্বীকৃত, তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞানই এর প্রমাণ। এখন বলুন—এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তাকলীদের মধ্যে "নবুয়তের শিরকের" অর্থ কোত্থেকে ঢুকল? বস্তুত তাকলীদের এ অর্থে বিশ্বাসী ব্যক্তির মূল উদ্দেশ্য হাদীসের ওপর আমল করা আর ইমাম আবূ হানীফা হাদীসের সঠিক মর্ম বোঝার উসীলা বা মাধ্যম মাত্র। যে ব্যক্তি কোন মাধ্যম ছাড়াই হাদীসের ওপর আমল করার দাবিদার আসলে সে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে হাদীসের আনুগত্য করার অনুশীলন করে। এটা নিশ্চিত

যে, "সালফে সালেহীন" তথা আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের জ্ঞান-বুদ্ধি, তাকওয়া-পরহেযগারী, খোদাভীতি, আমানতদারী ও সতর্কতা ছিল আমাদের এবং আপনাদের অপেক্ষা অনেক গভীর, তীব্র সংবেদনশীল। তাহলে বলুন, হাদীসের ওপর পূর্ণাঙ্গ আমল কার হচ্ছে, নিজ জ্ঞানে হাদীসের ওপর আমলকারী আপনার, না-কি 'সলফের' (পূর্ববর্তীগণের) মাধ্যমে হাদীসের অনুসারী মুকাল্লিদের ? এর ফয়সালার ভার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের বিবেকের ওপর ন্যস্ত রইল।

যাহোক, তাকলীদের যে ব্যাখ্যা আমি ব্যক্ত করেছি সে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান যা স্মরণ রাখার মত। আহলে হাদীসগণ আমাদের প্রতি অপর এক প্রশ্নের অবতারণা করে যে, আপনাদের সামনে কোন হাদীস পেশ করা হলে সে অনুপাতে আমল করতে আপনারা কেবল এ কারণে অস্বীকার করে থাকেন যে, আপনাদের ইমামের রায় এর বিপরীত। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাদীসের অনুসরণ আপনাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং ইমামের তাকলীদ করাটাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়।

এর জবাব হলো—বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মূলে একাধিক হাদীস বর্ণিত থাকে। আপনাদের উদ্ধৃত হাদীসের ওপর যদিও আমাদের আমল নেই, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের আমল অন্য হাদীসের ওপর যা আপনাদের নিকট স্বীকৃত নয়। তাহলে অভিযোগ কেবল আমাদের একার ওপর নয় আপনাদের ওপরও বর্তায়। বাকি রইল আপনাদের অপর দাবি যে, আমাদের পক্ষের হাদীস প্রাধান্যের অধিকারী (راجح) আর আপনাদের হাদীসের প্রাধান্য স্বীকৃত নয় (مرجوح)। জবাবে বলবো—প্রাধান্য দেয়ার পদ্ধতি মূলত রুচিনির্ভর বিষয়। আপনাদের অভিরুচি অনুযায়ী একটি হাদীস হয় তো প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার অনুসন্ধান মতে হয় তো প্রাধান্য রয়েছে অপর হাদীসের। আর আমাদের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেবের অনুসন্ধান ও প্রজ্ঞা আপনাদের রুচি ও প্রজ্ঞা অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর পরও নিজেদেরকে তোমরা হাদীসের ওপর আমলকারী বলে দাবি করা আর তাকলীদপন্থীদের হাদীসের ওপর আমলকারী স্বীকার না করাটা নিতান্ত গোঁড়ামি। এ কথাটাকেই ভিন্নতর ভঙ্গিতে আমি ব্যক্ত করতে চাই যে, "আমল বিল-হাদীস" তথা হাদীসের ওপর আমল করার অর্থ কি ? এর দ্বারা কি সমস্ত হাদীসের ওপর আমল বোঝায়, না কি কোন কোন হাদীসের উপর ? যদি বল—এর অর্থ সমস্ত হাদীস, তাহলে এটা তোমাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। কেননা বিপরীত অর্থবোধক হাদীসের সবগুলির ওপর আমল করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই কোন একটি হাদীসের ওপর আমল করে অপরগুলিকে বর্জন করতেই হবে। আর যদি এর অর্থ হয়—কোন কোন হাদীসের ওপর আমল করা, তাহলে এ অর্থে আমরাও আহলে হাদীস বা হাদীসের ওপর আমলকারী। সুতরাং এ

যুক্তি বলে তোমরাই কেবল আহলে হাদীস হওয়ার দাবি করা অসার ও ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়ত, মানসূস (সরাসরি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত) মাসআলা সংখ্যায় অতি নগণ্য, অধিকাংশ মাসআলাই ইজতিহাদী। সেগুলোতে আহলে হাদীসগণও হানাফী কিতাব থেকে ফতোয়া দেয়, আমল করে অথবা অন্য কোন ইমামের রায়ের ভিত্তিতে আমল করে। অতএব বেশির ভাগ মাসআলায় তোমরাও মুকাল্লিদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে বলতে হয়—তাকলীদ করাতো হারাম নয় তাকলীদের নাম নেয়াটাই কেবল নাজায়েয ও শিরক। কথাটা কেমন যেন হাস্যকর শোনায়। কেউ যদি দাবি করে যে, সকল মাসআলাতেই সে মানসূস হাদীসের ওপরই আমল করে ও ফতোয়া দেয়, তবে পরস্পর লেনদেন, মুআমালা, বেচা-কেনা, চুক্তি করা, বাতিল করা, শোফআ, রেহন ইত্যাদি বিষয়ে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন রাখার অনুমতি দেয়া হোক আর সে সহীহ্ হাদীস দ্বারা এর জবাব দেবে। কিয়ামত পর্যন্ত হাদীস দ্বারা জবাব দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এখন সে হয় কোন ইমামের কওল বা উক্তি দ্বারা জবাব দিবে, তবে তো সে তাকলীদই হলো। অথবা বলবে—শরীয়তে এ মাসআলার কোন হুকুম বর্ণিত নেই, তাহলে এটা হবে– اليوم اكملت لكم دينكم (আজ তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণতা দান করলাম) আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। বস্তুত এর দ্বারাই কিয়াস বা উদ্ভাবন-শাস্ত্রের বৈধতা প্রমাণ হয়। কেননা "দীনকে আমি পূর্ণতা দান করেছি" খোদায়ী বাণীর প্রেক্ষিতে শরীয়তে হুকুম বর্ণিত হয়নি এমন কোন মাসআলার অস্তিত্ব না থাকা অনিবার্য। বলা বাহুল্য, মানসূস হুকুমের সংখ্যা অতি নগণ্য। অতএব এমতাবস্থায় দীনের পূর্ণতার একমাত্র উপায় এই যে, কিয়াস ও ইস্তিম্বাতের (উদ্ভাবন) বৈধতা স্বীকার করে নেয়া। অর্থাৎ "গায়রে মানসূস" মাসআলাসমূহ মানসূস মাসআলার সাথে তুলনা করে হুকুমের পরিচয় লাভ করা। এর দ্বারা কিয়াস ও ইস্তিম্বাতের বৈধতা পুরোপুরি অস্বীকার করে কেবল হাদীসের ওপর আমলের দাবিদারদের ভ্রান্তিও স্পষ্টত প্রমাণ হয়। অবশ্য কোন কোন হাদীসে কিয়াসের নিন্দাও করা হয়েছে, কিন্তু সেটা শরীয়তের নীতিমালা ভিত্তিক কিয়াস নয় বরং এ হুকুম ইসলামী নীতি পাশ কাটিয়ে বানোয়াট নীতিকেন্দ্রিক কিয়াসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নতুবা দীনের মধ্যে ত্রুটি আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে। —ইরযাউল হক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২

**৩৫. আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে বুযুর্গানে দীনের বুযুর্গীর ওসীলা গ্রহণের কার্যকারিতা কতটুকু ? এ প্রশ্নের উত্তর।**

এ পর্যায়ে বুযুর্গানে দীনের ওসীলা গ্রহণের প্রচলিত ধরন অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! অমুক বুযুর্গের ওসীলায় আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন"-এর আসল মর্ম এই যে, হে

আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিতে অমুক আপনার মকবুল বান্দা আর আপনার প্রিয়জনকে ভালবাসা দ্বারা আপনার রহমত পাওয়ার ওয়াদা রয়েছে। সুতরাং তাঁর ওসীলায় আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। অতএব দেখা যায় সে ব্যক্তি ওয়ালীআল্লাহগণের প্রতি নিজের ভালবাসার ওসীলা উদ্ধৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত ও সওয়াব কামনা করছে। আর আল্লাহওয়ালাগণের সম্পর্কে অন্তরে ভালবাসার ভাব পোষণ করা যে আল্লাহ্র রহমত লাভ এবং সওয়াবের কারণ হয় একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহব্বতকারীদের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। কাজেই বুযুর্গানে দীনের বুযুর্গী ও বরকত আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে কতটুকু কার্যকর এ প্রশ্ন এখন অবান্তর। বস্তুত এর কার্যকারিতা এতটুকুই যে, কোন বুযুর্গের প্রতি ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা মূলত আল্লাহকে ভালবাসার অংশবিশেষ যার ওপর সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। এ ব্যাখ্যার পর اما بنعمة ربك فحدث (তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা তুমি জানিয়ে দাও) আয়াতের মর্মানুযায়ী মহান আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি বলতে চাই যে, এ বক্তব্য ইমাম ইবনে তাইমিয়া যদি শুনতেন, তবে তাঁর পক্ষে ওসীলা গ্রহণের বৈধতা অস্বীকার করার আদৌ কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। যেহেতু এর ভূমিকা সবই সহীহ ও শুদ্ধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সাহায্য-সহায়তার ফরিয়াদ জানিয়ে সমকালীন জাহিলদের শরীয়তবিরোধী ওসীলা গ্রহণ থেকে লোকদের বারণ করাই ছিল আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার আসল উদ্দেশ্য।

—আকবারুল আমাল, পৃষ্ঠা ৭

### ৩৬. "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ব্যতীত সকল প্রকার যিক্র বিদ'আত"—এ সন্দেহের অবসান।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ছাড়া সমস্ত যিক্র বিদ'আত ও ভিত্তিহীন। কেননা এগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তখন আমি উপস্থিত থাকলে আদবের সাথে আলিমদের নিকট এই মর্মে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতাম যে, এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে اذا السماء انفطرت -এর শব্দগুলি বিচ্ছিন্নভাবে প্রথমে اذا السماء ن - اذا السماء ن অতঃপর فطرت - فطرت কণ্ঠস্থ করার পর পুনরায় اذا السماء انفطرت যুক্তভাবে পাঠ করে। এমতাবস্থায় তার এ নিয়মে মুখস্থ করা জায়েয কি-না? সন্দেহের কারণ এই যে, اذا السماء এবং فطرت বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উভয়টি অর্থহীন শব্দ। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি ইমাম ইবনে তাইমিয়া একে অবশ্যই জায়েয বলতেন। আর এর কারণ এই ব্যাখ্যা দিতেন যে, মূলত এটা তিলাওয়াত নয় এবং তিলাওয়াত করা সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যও নয়; বরং তার উদ্দেশ্য

হলো মুখস্থ করা। আমি বলব—তাহলে الا الله - لا اله الا الله ও الله - الله বলাটা বিদ'আত হবে কোন্ কারণে? এখানেও তো আল্লাহ্‌র যিক্‌রকে অন্তরে বদ্ধমূল করাই উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি দাবি করে বলতে পারি যে, যিক্‌রকে বদ্ধমূল করার জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ যা কারো পক্ষে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। সন্দেহ থাকলে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এখন যদি কেউ বলে যে, সে কুরআন মুখস্থকারী যেরূপ তিলাওয়াতকারী নয় বরং তিলাওয়াতের প্রস্তুতি গ্রহণকারী মাত্র, অনুরূপ এমতাবস্থায় সেও যিক্‌রকারী নয়, যিক্‌রের প্রস্তুতি গ্রহণকারী মাত্র। তাহলে আমি বলব—নামাযের অপেক্ষায় থাকা যেমন নামাযেরই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত সেও তদ্রূপ যিক্‌রকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ইবনে তাইমিয়ার নিকট কথাটা এভাবে ভূমিকা দিয়ে কেউ ব্যাখ্যা করেনি। যার ফলে তিনি এটাকে বিদ'আত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। অধিকন্তু তাঁর নিকট জাহেল সূফীদের ভ্রান্তিপূর্ণ ভূমিকাই তুলে ধরা হয়েছিল। কেউ তাঁর সামনে قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون (বল, আল্লাহ্‌ই, অতঃপর তাঁদেরকে নিজেদের অর্থহীন আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও) দ্বারা এর দলীল পেশ করেছিল, যার দরুন তিনি সূফীদের সমালোচনায় কড়া মন্তব্য করেছিলেন। বস্তুত এর দ্বারা দলীল হয়ও না। কেননা এ আয়াতে الله শব্দটি قل -এর 'মাকূলা' (বক্তব্য) নহে। কারণ আরবী বাকধারা অনুসারে 'কওল' (قول) ধাতু নিঃসৃত পদের 'মাকূলা' বা বক্তব্য একক পদ নহে বরং বাক্য হয়ে থাকে। বস্তুত আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহ্' (الله) পদটি انزل অদৃশ্য ক্রিয়ার কর্তা বিশেষ। আয়াতের প্রথমাংশে এর নিদর্শন বিদ্যমান। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاءُكُمْ قُلِ اللّٰهُ اَىْ قُلْ اَنْزَلَ اللّٰهُ -

—বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল তা তোমরা কিছু কাগজে লিখ কিছু প্রকাশ কর আর অধিকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা জানতে না তা-ও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা কে নাযিল করেছিল? বল, আল্লাহ্‌ই অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই নাযিল করেছেন।

—সূরা আনআম, ৯১ আয়াত

কোন অজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো এর দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকবে, যার ফলে ইবনে তাইমিয়া তীব্র সমালোচনার সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু হাতুড়ে চিকিৎসকের ভুলের

দরুন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা জায়েয হবে না। আর উভয়কে একই কাতারে শামিল করা বিবেকসম্মতও হতে পারে না। মুহাককিক আলিমগণের দলীল শোনার সুযোগ হলে ইবনে তাইমিয়ার পক্ষে সূফীগণের ধ্যান-ধারণা অস্বীকারের দুঃসাহসই হতো না। মোটকথা, যিক্‌রের এক স্তর হলো আল্লাহ্‌র নাম আবৃত্তি করা, দ্বিতীয় স্তর হলো নামের মাধ্যমে তাঁর সত্তাকে আবৃত্তি করা, আর তৃতীয় পর্যায়ে এই যে, নামের মাধ্যম ছাড়াই খোদায়ী সত্তার আবৃত্তিতে যোগ্যতার পর্যায়ে উপনীত হওয়া। —আকবারুল আমাল, পৃষ্ঠা ২৭

**৩৭. হানাফী বলাটা আপত্তিকর হওয়ার জবাব।**

এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্‌ই আনুগত্যের মূল আধার। রাসূল, সাহাবী এবং মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্যের অর্থ এই যে, এদের দিক-নির্দেশনার আলোকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করা। কাজেই এ অর্থে 'হানাফী' আর 'মুহাম্মদী' বলা বৈধ-অবৈধ হওয়াতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা এই সম্পৃক্তির উদ্দেশ্য মৌলিক আনুগত্য নেয়া হলে উভয় ক্ষেত্রে এটা না-জায়েয হবে। কারণ এ জাতীয় আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু এ সম্পৃক্ততার অর্থ যদি হয় এদের পথ-প্রদর্শনের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য প্রদর্শন করা তাহলে এ অর্থের প্রেক্ষিতে উভয় স্থানে এর প্রয়োগ বিশুদ্ধ। তাহলে একটি জায়েয আর অপরটি না-জায়েয হওয়ার কারণ কি ? সুতরাং বোঝা গেল 'হানাফী' বলাতে দোষের কিছু নেই। 'হানাফী' সম্পৃক্তিকে কুফর ও শিরক আখ্যা দেয়া একটা ভ্রান্তিমূলক কথা। যেহেতু এ সম্পৃক্ততা দ্বারা মৌলিক ইত্তেবা কিংবা আনুগত্য উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্য হলো—আমরা এদের তাহকীক বা গবেষণা-অনুসন্ধান মূলে আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য প্রকাশ করি। ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক উদ্ভাবিত শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা এই যে, তিনি আমাদের অপেক্ষা বিশুদ্ধ মাত্রায় দীন ও ইসলামকে অনুধাবন করেছেন। তাই আমরা তাঁর সমাধানের আনুগত্যের আশ্রয় নিয়ে থাকি। কিন্তু মৌলিকভাবে তাঁর আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। ইমাম আবূ হানীফার প্রতি আমাদের সম্পৃক্ততার অনুরূপ আল্লাহ্‌র কালামেও অন্যের প্রতি অভিন্ন প্রকৃতির নিসবত বা সম্পৃক্তকরণের বিদ্যমানতা লক্ষ করা যায়। সুতরাং কুরআনের ভাষায় ঃ واتبع سبيل من اناب الى (অর্থাৎ এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর) এবং قل هذه سبيلى ادعوا الى الله (অর্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ। আর আমি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহবান করি...)।

আলোচ্য আয়াতে 'সাবীল' শব্দের সম্পৃক্ততা রাসূল ও আল্লাহ্‌র অনুসারী বান্দার প্রতি করা হয়েছে। আর يصدون عن سبيل الله (তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে

রাখে) আয়াতে 'সাবীল' শব্দের সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে দেখানো হয়েছে। এটা কবির ভাষায় যেন– عباراتنا شتى و حسنك واحد (আমাদের ভাষা বিভিন্ন কিন্তু রূপ তোমার অভিন্ন) এবং

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش

من بهر انداز قدرت می شناسم

—"পরিচ্ছদ তোমার যাই থাকুক আকৃতির আন্দাজেই তোমার পরিচয় আমি পেয়ে যাই" ছন্দের অনুরূপ।

আসল কথা হলো—যার অন্তরে ভালবাসা বর্তমান যে কোন অবস্থায় প্রেমাস্পদের পরিচয় সে জেনেই নেয়। তদ্রূপ দীনকে যারা সঠিক অর্থে বুঝেছে তাদের সামনে দীন কুরআনের আকারে আসুক কিংবা হাদীসের আবরণে তারা উপরোক্ত ছন্দই আবৃত্তি করতে থাকে। কেবল শিরোনাম পরিবর্তনের দরুন কেউ কেউ হাদীসকে আবার কেউ ফিকাহ্কে কুরআনের সংজ্ঞা থেকে খারিজের প্রয়াস চালিয়েছে অথচ মূলত এসব একই জিনিস। উদাহরণ এরূপ যেমন—একটা লক্ষ্ণৌর চিকিৎসালয়; আরেকটা দিল্লীর চিকিৎসা কেন্দ্র বলা হয়, কিন্তু মূলে উভয়টি ইউনানী দাওয়াখানা বলে পরিচিত। তদ্রূপ কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ ইত্যাদিতে যদিও আনুষঙ্গিক ও শাখা-প্রশাখায় বিভিন্নতা বিদ্যমান, কিন্তু মূলে সব একই দীনে ইসলাম। শাখা-প্রশাখায় যদি অল্প বিস্তর মতবিরোধ হয়েই যায়, তবে কি তা দীনে ইসলামের অন্তর্ভুক্তই থাকবে না? যেমন দিল্লী-লক্ষ্ণৌর চিকিৎসা কেন্দ্রের মধ্যে আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্যের দরুন সেগুলি ইউনানী দাওয়াখানার অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত; কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ ইত্যাদির বেলায়ও একই নীতি প্রযোজ্য। সার কথা, আল্লাহ্ যাকে 'সাবীলী' (আমার পথ) আখ্যা দিয়েছেন সেটিকেই এখানে সাবীলা মান আনাবা ইলাইয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রয়োগ হিসেবে 'সাবীলী' এবং "সাবীলা মান আনাবা ইলাইয়া" অভিন্ন প্রকৃতির। একইভাবে এক স্থানে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها

—আমি তোমাকে দীনের বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি তুমি তার অনুসরণ কর। অন্যত্র বলেছেন ঃ

اتبع ملة ابراهيم حنيفا [অর্থাৎ তুমি মিল্লাতে ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ কর।] তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়ায়? বলা বাহুল্য, মিল্লাতে ইবরাহীম (আ) শরীয়তে

মুহাম্মদীরই অপর নাম। আসলে এটা কেবল শিরোনামের বাহ্যিক বিভিন্নতা। নতুবা মূল আনুগত্য তো আল্লাহ্‌র হুকুমেরই। তাহলে আলিমদের অনুসরণের নাম শুনে আঁতকে ওঠার কি আছে।

মহানবী (সা) পূর্ণাঙ্গ নবী হওয়া সত্ত্বেও বলা হয়েছে—

واتبع ملة ابراهيم

"মিল্লাতে ইবরাহীমের ইত্তেবা কর।" এ কথার অর্থ যদি তাঁর তরীকার অনুসরণ করা হয় তাহলে তো বড় সাংঘাতিক কথা। কেননা অপরের তরীকার অনুসরণ করা উম্মতের কাজ তা নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বোঝা গেল মিল্লাতে ইবরাহীমী মূলত মিল্লাতে ইলাহীরই অপর নাম। কেননা মিল্লাতে ইলাহী বস্তুত বিভিন্ন উপাধিতে বিভূষিত। তন্মধ্যে মিল্লাতে ইবরাহীমও একটি। উক্ত শরীয়তদ্বয় শাখা-প্রশাখা বা খুঁটিনাটি বিষয়ে বহু ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতির ধারক। তাই এ প্রেক্ষিতে মুহাম্মদী শরীয়তকে মিল্লাতে ইবরাহীমী নামে অভিহিত করা হয়। অতএব বাস্তবে এটা মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণ নয় বরং মিল্লাতে ইলাহিয়ারই অনুকরণ। অবশ্য অন্য এক কারণে একে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এখানে মিল্লাতে ইলাহিয়াকে মিল্লাতে ইবরাহীম বলা হয়েছে। অনুরূপ একই দীনকে যদি শাফিঈ মাযহাব, হানাফী মাযহাব অথবা কাযী খানের অভিমত বলা হয়, তবে ক্ষতির কি আছে। লোকেরা বলে—এতো মাওলানাদের ফতোয়া, আল্লাহ-রাসূলের হুকুম থোড়াই। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা আলিমদের ফতোয়া নয় বরং খোদার পক্ষ থেকে বর্ণিত মাসআলা। মাওলানা সাহেব তার মর্ম জেনে দিক-নির্দেশ করেছেন মাত্র। এর দ্বারা আরো বোঝা গেল যে, কিয়াস অন্তর্নিহিত বিষয়টিকে প্রকাশ করে মাত্র, নতুনভাবে প্রমাণ করে না। সুতরাং এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মহানবী (সা)-এর পর আলিমদের অনু-করণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কবির ভাষায় ঃ

چونکه شه خورشید ومارا کرد داغ
چاره نبود در مقا مش جزچراغ

অর্থাৎ সূর্য ডুবে গেলে প্রদীপ ছাড়া আলো পাওয়ার দ্বিতীয় উপায় অকল্পনীয়। তদ্রূপ সাহেবে ওহী তথা নবী করীম (সা) দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া অবস্থায় আলিমগণের অনুসরণ ছাড়া আমাদের বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে? যেমন কবি বলেছেন ঃ

چونکه گل رفت گلستان شد خراب
بوئے گل را از که جویم از گلاب

—ফুল ঝরে গেছে, ফুল বাগিচা বিরাণ পড়ে রয়েছে, তাই গোলাপের সুগন্ধি আমি কোথায় তালাশ করব।

আলোচ্য ছন্দটি অবশ্য এক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। কেননা শরীয়তের ফুলবাগিচার সজীবতা চির অম্লান, চির অক্ষুণ্ন। কিন্তু এখন যেহেতু নবী আমাদের সামনে অনুপস্থিত, কাজেই দীন ঐ সব ব্যক্তি থেকেই হাসিল করা বাঞ্ছনীয় যারা নবীর ফয়েয-বরকতে ধন্য। কেননা এখন পর্যন্ত মুজতাহিদ ও আলিমগণের মধ্যে যা কিছু ফয়েয-বরকতের চিহ্ন লক্ষ করা যায় তা একমাত্র মহানবী (সা)-এর অবদানে অর্জিত হয়ে তাঁদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই আলিমগণের অনুসরণ ছাড়া উপায় নেই। তাহলে মূলত এটা তাঁদের অনুসরণ নয় বরং আল্লাহ ও রাসূলেরই আনুগত্য। নিয়মটুকুই কেবল আলিমদের আমল-আখলাক, আচার-আচরণ থেকে শিখে নিতে হয়। অবশ্য একে যদিও 'সাবীলা মান আনাবা' তথা আনুগত্যশীলদের পন্থা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে তা আল্লাহ্ ও রাসূলেরই পথ। উলামারা কেবল ব্যাখ্যা দেন, এ অর্থে তাঁরা মাধ্যম। শুধু এ সম্পর্কটুকুর দরুন তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করত 'সাবীলা মান আনাবা' অর্থাৎ আনুগত্যশীলদের পন্থারূপে অভিহিত করা হয়। —ওয়াজ-—ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ২৪

## ৩৮. মহানবী (সা)-এর রওযা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব, তদুপরি যিয়ারত করা নবীর প্রতি ভালবাসার হক।

এ সম্পর্কে তিনি [মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)] বলেন ঃ (ক) একবার হাজী ইমদাদুল্লাহ (র)-এর সাথে জনৈক গোঁড়া গায়ের মুকাল্লিদের বাহাস হয়। উক্ত গায়ের মুকাল্লিদ মদীনা মুনাওয়ারা গমন করা থেকে লোকদের নিষেধ করত। তার দলীল ছিল ولا تشد الرحال الا ثلثة مساجد (কেবল তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা বৈধ নয়) হাদীসটি। হাজী সাহেব বললেন ঃ পিতা-মাতার যিয়ারত, ইলমে দীন শিক্ষা করা ইত্যাদি কারণেও কি সফর করা জায়েয হবে না ? এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলতে থাকে—জায়েয হলেও ফরয-ওয়াজিব নয় যে, যেতেই হবে। হাজী সাহেব বললেন ঃ হ্যাঁ শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয নয় ঠিকই, কিন্তু মহব্বতের কারণে তো জরুরী। স্মরণ করুন, সুলায়মান (আ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ যদি কিবলা হতে পারে, ইবরাহীম (আ)-এর তৈরি মসজিদ যদি কিবলায় রূপান্তরিত হতে পারে

আর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্মিত মসজিদ কি এতটুকু যোগ্যতাও রাখে না যে, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মানুষ তথায় উপস্থিত হবে ? মহানবী (সা)-এর শান ও মান যেহেতু ছিল উবূদিয়্যাত তথা দাসত্বের এবং সুনাম-সুখ্যাতি তাঁর আদৌ পসন্দ ছিল না এ কারণে তাঁর মসজিদ কিবলায় পরিণত হয়নি। সে বলল ঃ মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে সফর তো জায়েয কিন্তু রওযার উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নয়। হাজী সাহেব বললেন ঃ মসজিদে নববীর ফযীলত আসল কোত্থেকে ? সে তো হুযূর (সা)-এর কারণেই। তাহলে মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয আর যার কারণে মসজিদে নববীর ফযীলত সে মহান ব্যক্তির রওযা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা না-জায়েয এটাতো দারুণ বিস্ময়ের কথা। এর পর লোকটি নিরুত্তর হয়ে যায়। যদি কেউ বলে–যিয়ারত হুযূর (সা)-এর কোথায়, সেটা তো হয় কেবল কবরের। তাহলে তার জবাব হলো—একটি হাদীসে উভয়টিকে তিনি সমমানের উল্লেখ করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی (অর্থাৎ ইন্তিকালের পর যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করল সে যেন জীবিতকালেই আমার সাক্ষাত লাভ করল।) তারপর তাকে তিনি বললেন ঃ اهدنا الصراط المستقيم (আমাদের সরল-সোজা পথের হিদায়েত দান করুন) পাঠ করার সময় অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে পড় এবং হিদায়েতের জন্য দোয়া কর। লোকটি বলল ঃ এ ব্যাপারে আমার হিদায়েতের দোয়া করা নিষ্প্রয়োজন। হাজী সাহেব বললেন ঃ দোয়া করাতে ক্ষতির কি আছে, আমরাও তো দোয়া করি। সত্যের ওপর না থাকলে আমাদেরকে আল্লাহ হিদায়েত করুন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই মাগরিবের নামাযের সময় সে গায়রে মুকাল্লিদ হওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হয়। অতঃপর সে বলল ঃ আমি মদীনা শরীফ যাব, তখন সে মুক্তি লাভ করে এবং মদীনা শরীফ রওযানা হয়ে যায়। —মুজাদালাতে মাদিলাত, পৃষ্ঠা ২৪

(খ) রওযা পাকের যিয়ারতে ধন্য হওয়াটা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ভালবাসার অন্যতম হক। বিশেষত জীবিতকালে সাক্ষাত লাভে বঞ্চিতরা রওযা পাকের যিয়ারত দ্বারা কমপক্ষে বরকত লাভ করতে সক্ষম হয়। অবশ্য এটা যদিও হুবহু প্রথমটির সমমানের নয় কিন্তু তার প্রায় কাছাকাছি অবশ্যই। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی

—(ইন্তিকালের পর আমার যিয়ারতকারী ব্যক্তি যেন জীবিতকালেই আমার যিয়ারত করল।) এর দ্বারা বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্তা স্বয়ং আকর্ষণযোগ্য বিষয়। কেবলমাত্র মুবাল্লিগ হওয়াটাই তাঁর সাথে সম্পর্কের ভিত্তি হলে রওযাপাকের যিয়ারত সুন্নত হবার কারণ ছিল না। কেননা এখন তো তাঁর তাবলীগের পর্যায় শেষ

হয়ে গেছে। পরিতাপের বিষয় হলো—কেউ কেউ এমনি হতভাগা যে, রওযাপাকের যিয়ারতের ফযীলত স্বীকার তো করেই না উপরন্তু এটাকে অবৈধ কাজ মনে করে। কানপুরে একবার চল্লিশ হাদীসের অনুবাদ বিষয়ে ছাত্রদের পরীক্ষা ছিল। রওযাপাক যিয়ারতের বৈধতা স্বীকার করে না এমন্ এক ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত ছিল। জনৈক ছাত্রের পরীক্ষা শুরু হলে ঘটনাক্রমে সে এ হাদীস পাঠ করল ঃ من حج ولم يزرانى فقد جفانى (যে ব্যক্তি হজ্জ করল কিন্তু আমার যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি জুলুম করল।) সে ব্যক্তি আপত্তি করে বলে উঠল ঃ মহানবী (সা)-এর لم يزرنى (আমার যিয়ারত করল না) বাক্য তাঁর হায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ কথার দ্বারা ইন্তিকালের পর যিয়ারত প্রমাণ হয় না। ছাত্র অল্প বয়স্ক ছিল প্রশ্ন বুঝতে পারেনি। এর উত্তরও তার জানা ছিল না। সরল মনে সে অগ্রসর হতে থাকে। আল্লাহর মেহেরবানী—পরবর্তী হাদীসেই সে উত্তর পেয়ে যায়। من زارنى بعد مماتى فكانما زارنى فى حياتى (অর্থাৎ ইন্তিকালের পর যে আমার যিয়ারত করল সে যেন জীবিতকালেই আমার যিয়ারত করল।) উপস্থিত আলিমগণ বললেন—নিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার সমাধান হয়ে গেছে। এরপর সে নির্বাক হয়ে গেল। কেউ কেউ রওযাপাকের যিয়ারত সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে—বাস্তবে এখন তো কবরেরও যিয়ারত হয় না। কেননা পাথরের প্রাচীরবেষ্টিত হওয়ার দরুন রওযা শরীফ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। উপরন্তু দরজা পর্যন্ত রাখা হয়নি। এটা একটা সারবত্তাহীন প্রশ্ন। আমি বলব—যিয়ারতের জন্য রওযা শরীফের দৃষ্টিগোচর হওয়াটাই যদি অনিবার্য হয়, তাহলে মহানবী (সা)-এর যিয়ারতের জন্য তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাও অনিবার্য শর্ত হওয়া উচিত। অথচ কোন কোন সাহাবী অন্ধ ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) সাহাবী ছিলেন কিনা? অধিকন্তু মহিলাদের ব্যাপারে কি বলা হবে ? তাই সাহাবী হওয়ার জন্য যেরূপ হুকমী যিয়ারত তথা পরোক্ষ দর্শনকেই যথেষ্ট বলে স্বীকার করা হয়, অনুরূপ কবর শরীফ যিয়ারতের ক্ষেত্রেও পরোক্ষ যিয়ারতই যথেষ্ট বলে কেন স্বীকার করা হবে না ? অর্থাৎ এমন স্থানে উপস্থিত হওয়া কোন প্রকার আড়াল না থাকলে যেখানে দাঁড়িয়ে কবর শরীফ দেখে নেয়া সম্ভব হয়, এটাও কবর শরীফ যিয়ারতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিক (র)-এর উক্তি দ্বারা এ ব্যাপারে তৃতীয় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। তিনি বলেছেন ঃ يكره قول الرجل زرت قبر النبى صلى الله عليه و سلم অর্থাৎ ইমাম মালিক (র) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির একথা বলা মাকরূহ যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর শরীফ যিয়ারত করেছি। কাজেই প্রশ্ন হলো—কবর যিয়ারতের কথাটা মুখে উচ্চারণ করা পর্যন্ত যেক্ষেত্রে মাকরূহ সেক্ষেত্রে যিয়ারতের বাস্তব কর্মটা মাকরূহ কেন

হবে না? জবাব হলো—প্রথমত, ইমাম মালিক (র)-এর এ উক্তি প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর এ মন্তব্য যদি প্রমাণিত হয়ও তবু এর অর্থ তা নয়, যা তোমরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। নতুবা তাঁর এত হেঁয়ালির কি প্রয়োজন ছিল। সরাসরি পরিষ্কার ভাষায়ই তিনি ব্যক্ত করতেন ঃ يكره زيارة قبر النبى ص (মহানবী (সা)-এর কবর যিয়ারত করা মাকরূহ।) অভিব্যক্তির মাকরূহ দ্বারা যিয়ারত মাকরূহ হওয়ার রূপক অর্থের আশ্রয় নেয়ার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? বস্তুত এখানে তাঁর উক্তির অর্থ হবে—মহানবী (সা) রওযাপাকে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন হেতু যিয়ারতকারীর এ উক্তি সমীচীন নয় যে, আমি কবর শরীফের যিয়ারত করেছি। কেননা যেহেতু তিনি জীবিত [কাজেই মূলত যিয়ারত সে মহানবী (সা)-এরই সমাপন করেছে]।

মোটকথা, দুনিয়াতে এমন নিরস ব্যক্তিরও অস্তিত্ব রয়েছে যার অন্তরে মহানবী (সা)-এর রওযাপাকের যিয়ারতের আগ্রহ তো দূরের কথা বরং একে হারাম সাব্যস্ত করে অপর লোকদের পর্যন্ত বিরত রাখার প্রয়াস চালায়। কিন্তু যিয়ারতের ভাগ্য যাদের হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করুন কি পরিমাণ বরকত যে হাসিল হয়। যাহোক, একটা ঘটনার উল্লেখ দ্বারা আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। যদ্দ্বারা কবর শরীফ যিয়ারতের বরকত এবং মহানবী (সা)-এর তাতে জীবিত থাকা জ্ঞাত হওয়া যায়। সাইয়্যেদ আহমাদ রিফাঈ (র)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে, তিনি রওযাপাকে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ السلام عليك يا جدى (হে পিতামহ! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।) জবাব আসল— وعليك السلام يا ولدى (হে সন্তান! তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক।) পরক্ষণেই তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর কণ্ঠে কবিতা ছন্দ উচ্চারিত হতে থাকে ঃ

فى حالة البعد روحى كنت ارسلها
تقبل الارض عنى وهى نائبتى
فهذه دولة الا شباح قد حضرت
فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى

—দূরত্বে অবস্থানকালে আমার রূহকে আমি পাঠিয়ে দিতাম প্রতিনিধি হিসেবে আমার পক্ষ থেকে এ পুণ্যভূমি চুম্বনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখন আপনার আস্তানায় আমি নিজেই উপস্থিত, কাজেই আপনার দস্ত মুবারক প্রসারিত করুন তাতে চুমো খেয়ে আমার ওষ্ঠযুগল ধন্য হোক।

সাথে সাথে সূর্য অপেক্ষা উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় দস্ত মুবারক রওযাপাক থেকে বের হয়ে আসে। মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে তিনি তাতে চুমো খান এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে একজন প্রশ্ন করে আপনার মনে কি তখন ঈর্ষা জেগেছিল ? তিনি বললেন ঃ শুধু কি আমি, ফেরেশতাকুল পর্যন্ত তখন ঈর্ষান্বিত হয়েছিল।

—শুকরুন নি'মাতে বিযিকরির রাহমাহ, পৃষ্ঠা ৪৪

### ৩৯. বিশ রাকাত তারাবীহও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

আজই আমি একটি চিঠির উত্তর লিখলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এরা হলো শিক্ষিত জিন। কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝানো সহজ। কিন্তু শিক্ষিত জিনরা বুঝে বড় কষ্টে। উক্ত চিঠিতে প্রশ্নকারী লিখেছিল—আজকাল মানুষের অলসতা প্রবল, তাই আট কিংবা বার রাকাতোক্ত হাদীসের ওপর আমল করাতে ক্ষতি কি ? আমিও চিন্তিত হয়ে পড়ি যে, এর জবাব কি লিখব! অতঃপর মহান আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ! এ মৌলভীর প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হলো। উত্তরে লিখলাম– বিশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ হওয়ার ব্যাপারে 'ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর ইজমার বিরোধিতা জায়েয নয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠিত 'ইজমা'ই এ সম্পর্কিত অন্যান্য হাদীস 'মানসূখ' (রহিত) হওয়ার প্রমাণ। অবশ্য মাত্র আট রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ লেখা দ্বারা কোন কোন আলিমের ইজমার ওপর সৃষ্ট সন্দেহের জবাব এই যে, 'ইজমা' বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই 'ইজমা'র বিপরীত বিরল (شاذ) উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই তাকীদ যেহেতু প্রমাণ হয়েছে কাজেই তা বর্জন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পত্র লেখক আরো একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, "ফাত্হুল কাদীর" গ্রন্থের গ্রন্থকারের মতে তারাবী আট রাকাআত পড়া চাই। আমি লিখেছি—জামহুরের মোকাবিলায় কেবল ফতহুল কাদীর গ্রন্থকারের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের অভিমত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষত যে ক্ষেত্রে স্বয়ং গ্রন্থকারের আমল নিজস্ব রায়ের বিপরীত হয়। কেননা এটা তাঁর গবেষণালব্ধ অভিমত। নতুবা বাস্তবে পড়েছেন তিনি সর্বদা বিশ রাকাআতই। কাজেই তাঁর গবেষণামূলক উক্তি আমলযোগ্য হতে পারে না। দিল্লীর নতুন মুজতাহিদদের নিকট আট রাকাআত তারাবীর কথা শুনে জনৈক ব্যক্তির মনে সংখ্যা সম্পর্কে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যে, তারাবীর নামায কত রাকাআত—আট না বিশ ? বিষয়টা জানবার উদ্দেশ্যে সে মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদের নিকট উপস্থিত হয়। এ সকল নতুন মুজতাহিদ নিজেদেরকে আবার হাদীসের ওপর আমলকারী বলে দাবি করে। তাদের

প্রতি প্রশ্ন জাগে—ভাই সাহেব! আট যেমন হাদীসের কথা বিশও তো হাদীসেরই নির্দিষ্ট সংখ্যা, তাহলে বিশের ওপর আমল করলে না কেন ? এর মাধ্যমে আটের ওপরও আমল হয়ে যেত।

মূলকথা হলো, নফসের আরাম আটের মাধ্যমেই নিহিত। তাই সে বিশ কেন পড়বে ? মন যা চায় তাই এরা করে, প্রয়োজনে তার জন্য দুর্বল হাদীসের আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করে না। এ ধরনের আলিমদের সম্পর্কে কারী আবদুর রহমান সাহেব (র) বলতেন ঃ এরা আমিল বিল হাদীস ঠিকই, (হাদীসের ওপর আমলকারী) কিন্তু আল হাদীসের (الحديث) আলীফ-লাম (الف - لام) মুযাফ ইলাইহের স্থলাভিষিক্ত (عوض)। আর সে মুযাফ ইলাই হলো- নিজের নফস (نفس) বা প্রবৃত্তি। অর্থাৎ আমিল বিহাদীসিন্ নফ্স (عامل بحديث النفسى) অর্থাৎ আসলে তারা ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির গোলাম, হাদীসে রাসূলের ওপর আমলকারী নয়। তারা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুপাতে হাদীস তালাশ করে। যেমন এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এরূপ যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "কুরআনের কোন্ হুকুমটা তোমার অধিক পসন্দনীয় ?" সে উত্তর দিল— ربنا انزل علينا مائدة من السماء (অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাও।) তারাও তদ্রূপ তারাবী সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কেবল আট রাকআতবিশিষ্ট হাদীসটি বাছাই করে নিয়েছে। অথচ হাদীসে বার রাকাআতের উল্লেখও স্পষ্ট রয়েছে। একইভাবে তারা বিত্‌র সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কেবল এক রাকআত বিশিষ্ট হাদীসটিই গ্রহণ করে। অথচ হাদীসে বিতরের তিন রাকাআত, পাঁচ রাকাআত এমন কি সাত রাকাআতের উল্লেখও দেখা যায়।

যাইহোক, সে বেচারা তাদের ধোঁকায় পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মাওলানার নিকট জানতে চায়। জবাবে মাওলানা বললেন ঃ ভাই, শোন! মনে কর তহ্শীল অফিস থেকে তোমার নামে নোটিশ আসল—"খাজনা আদায় কর।" কিন্তু টাকার অংক তোমার জানা নেই। একজন নম্বরীকে তুমি জিজ্ঞেস করলে আমার খাজনা কত টাকা? সে বলল ঃ আঠার টাকা। অতঃপর তুমি দ্বিতীয় নম্বরীকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাতে সে বলল ঃ বিশ টাকা। তাহলে এখন বল, এমতাবস্থায় কত টাকা সাথে নিয়ে তোমার কাচারিতে যাওয়া উচিত ? সে বলল ঃ বিশ টাকা নিয়ে যাওয়াই সঙ্গত। যদি এত টাকাই হয়, তবে কারো কাছে হাত পাতা লাগবে না। আর যদি কম হয়, তবে টাকা অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু টাকা যদি কম নিয়ে যাই আর তার চেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়, তাহলে কার কাছে চাইতে যাব। মাওলানা বললেন ঃ তাহলে বোঝ, যদি সেখানে

দাবি হয় বিশ রাকআতের অথচ আছে তোমার আট রাকআত তাহলে কোত্থেকে এনে দেবে ? পক্ষান্তরে যদি থাকে তোমার বিশ আর দাবি হয় কমের তাহলে বাকিটা বেঁচে যাবে, সময়ে কাজে আসবে। সে বলল—ঠিক আছে, বুঝতে পারলাম। এখন থেকে সব সময় বিশ রাকআতই আমি পড়তে থাকব। তার মনে পূর্ণ শান্তি এসে যায়। সুবহানাল্লাহ! মানুষকে বোঝাবার কি অদ্ভুত পন্থা। প্রকৃতপক্ষে এরাই হলেন জাতির প্রজ্ঞাবান বিবেক। —রূহুল কিয়াস, পৃষ্ঠা ৭

(খ) এ মুহূর্তে এটা প্রমাণ করা আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আমলের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে বিশ রাকাআত তারাবী এবং তিন রাকাআত বিতর নামায জামাতের সাথে পড়া হতো। "মুআত্তা মালিক"-এ রেওয়ায়েত যদিও 'মুনকাতি' (ছিন্ন) বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে এটি 'মুতাওয়াতির' (বর্ণনা-পরম্পরা) পর্যায়ের। উম্মতের অব্যাহত আমল একে মুতাওয়াতিরের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ব্যস, আমলের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। লক্ষ করুন কেউ যদি দোকানে ঔষধ কিনতে যায় দোকানদারকে তখন এ প্রশ্ন করা হয় না—এ ঔষধ আসছে কোথা হতে ? এবং এটা যে আমার কাঙ্ক্ষিত ঔষধ তারই বা প্রমাণ কি? এ ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে বরং দু-একজন জানা ব্যক্তিকে দেখিয়ে মনের সান্ত্বনা হাসিল করা হয়। কেউ যদি পশারীকে বলে যে, যার কাছ থেকে ক্রয় করেছ তার দস্তখত করা প্রমাণ দেখাতে পারলে তবে আমি বিশ্বাস করব যে, ঠিকই তুমি কাঙ্ক্ষিত ঔষধটিই ক্রয় করেছ। এমতাবস্থায় লোকেরা বলবে—আসলে তার ঔষধের প্রয়োজনই নেই। পশারীও পরিষ্কার বলে দেবে—দস্তখত দেখানোর আমার কোন দরকার নেই। বুঝে খাটে নাও, না হয় পথ দেখ। পূর্ববর্তী মুহাক্কিকগণের নীতিও অনুরূপ ছিল। তারা প্রশ্নকারীদের পিছনে মেধা ক্ষয় করতেন না। প্রশ্ন আসত আর তাঁরা মাসআলা বলে দিতেন। এর বিরুদ্ধে কেউ দলীল চাইলে তাঁদের পরিষ্কার জবাব হতো—যার ওপর তোমার বিশ্বাস হয় তার কাছ থেকে জেনে নাও, আমার বিতর্কের সময় নেই! ভূপালস্থ মাওলানা আবদুল কাইউম (র)-এর নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে কিতাব দেখে তিনি জবাব দিতেন আর বলতেন ঃ কিতাবে এরূপই লেখা রয়েছে। আর কেউ হাদীস জিজ্ঞেস করলে বলতেন ঃ ভাই আমি নও-মুসলিম নই, আমার বাপ-দাদা সবাই মুসলমান ছিলেন। এমনিতর তাদের বাপ-দাদারাও এবং মহানবী (সা)-এর যুগ পর্যন্ত সবাই মুসলমান ছিলেন। মহানবী (সা)-এর সমকালীন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ সামনে রেখে আমল করতেন। পরবর্তীগণ

তাদের পূর্ববর্তীগণের অনুকরণে আমল করতেন। এমনিভাবে আমল-পরম্পরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্মপদ্ধতি, নিয়ম-নীতি অনুসারে আমাদের পরিবারেও আমল চলে আসছে। কাজেই হাদীস তালাশ করার আমার প্রয়োজনই পড়েনি। বরং নও-মুসলিমদের জন্য এটা জরুরী। এ ধরনের জবাবের উদ্দেশ্য হলো—বিতর্ক পরিহার করা। কেননা অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক তাদের নিকট ছিল অপ্রিয়। আচ্ছা বেশ–জনসাধারণকে যদি বলে দেয়া হয় যে, হাদীসে এই আছে, তাহলে তারা মাসআলা উদ্ভাবনের নিয়ম কিভাবে জানবে। এতে পুনরায় তাদেরকে ফকীহ্‌গণের শরণাপন্ন হতে হবে। তাহলে প্রথম থেকেই ফকীহ্‌গণের ওপর তারা আস্থাশীল কেন হয় না।

মোটকথা, তারাবীর আমলের জন্য এটুকু প্রমাণই যথেষ্ট যে, মহানবী (সা) তারাবীর নামাযকে সুন্নত আখ্যা দিয়েছেন আর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সাহাবীগণ তারাবীর নামায বিশ রাকাআত আদায় করতেন। সাধারণ লোকদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট, এর চেয়ে অধিক তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা আলিমদের কাজ। এ মুহূর্তে সে আলোচনার অবকাশ অনুপস্থিত। তারাবীর অপর নাম 'কিয়ামে রমযান' (রমযান মাসের কিয়াম)। কেননা এটা রমযান মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর হাদীসে একে কিয়ামে রমযান আখ্যা দেয়াটা তারাবীর নামায তাহাজ্জুদ থেকে ভিন্নতর ইবাদত হওয়ার প্রমাণ। কেননা তাহাজ্জুদ রমযানের সাথে খাস নয়। এ-দুটার বিভিন্ন হওয়ার পক্ষে আরো বহু প্রমাণ রয়েছে।

—তাকলীলুল মানাম বিসুরাতিল কিয়াম, পৃষ্ঠা ১৭

## ৪০. প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) সকল ইমাম অপেক্ষা অগ্রগামী।

"ইমাম আবূ হানীফা (র) সর্বমোট ৭০টি হাদীস অবগত ছিলেন" এ উক্তিটি ইবনে খাল্লিকানের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয়—তিনিই নাকি এটা লিখেছেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মুআত্তা ও আছারে মুহাম্মদ ইত্যাদি গ্রন্থে ইমাম সাহেবের সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ আলোচ্য সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি দেখা যায়। অবশ্য এটা সত্য যে, "মুসনাদাত আবূ হানীফা" নামে সেগুলোর পৃথক সংকলনের চেষ্টা না করে বরং অন্য মাশায়েখদের রেওয়ায়েতের অন্তরালে সেগুলোকে উল্লেখও করা হয়েছে। এর দ্বারাই অনুমান করা যায় তাঁর রেওয়ায়েতের পরিমাণ যে কত হবে। সত্তরের (৭০) বর্ণনার ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। কিন্তু বন্ধুবর্গকে আমি বলি—তোমাদের ইবনে খাল্লিকানের উক্তির বিরোধিতা অর্থহীন, যেহেতু তদ্দ্বারা আমাদের ইমাম সাহেবের ত্রুটির স্থলে শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ হয়। কারণ ইমাম সাহেবের

মুজতাহিদ হওয়া সর্বজনস্বীকৃত, কারো পক্ষে একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আর অস্বীকার করবেই বা কিরূপে, যেক্ষেত্রে মাসআলার প্রতিটি অংগনে, প্রত্যেক স্তরে তাঁর অভিমত, তাঁর সমাধান বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু প্রতিপক্ষের লোকরা পর্যন্ত অধিকাংশ মাসআলায় তাঁর মতবিরোধের উল্লেখ করতে বাধ্য। এর দ্বারা বোঝা যায় বিপক্ষীয়রা ইমাম সাহেবকে মুহাদ্দিস স্বীকার না করুক কিন্তু মুজতাহিদ অবশ্যই স্বীকার করে থাকে। উপরন্তু ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্য ইমাম ইমাম আবূ হানীফার ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়া শুধু স্বীকারই করেননি, বরং ফিকহশাস্ত্রে অন্য সকল ইমামকে আবূ হানীফার عيال তথা শাগরিদ হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটাকে যদি যুক্তির প্রথম অংশ ধরা হয়, অতঃপর দ্বিতীয় অংশ যোগ করা হয় যে, ইমাম সাহেব সর্বমোট ৭০টি হাদীসই অবগত ছিলেন। এখন উভয় অংশ একত্র করে লক্ষ কর ফল কি দাঁড়ায়। সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অঙ্গনে এত তীক্ষ্ণ এবং উচ্চমানের অধিকারী ছিলেন যে, মাত্র সত্তরটি হাদীস অবলম্বনে এত অধিক পরিমাণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেয হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য ইমাম সে পরিমাণ মাসআলা উদ্ভাবনে সক্ষম হননি। শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞার এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে ? বোঝা গেল তিনি ছিলেন শীর্ষতম মুজতাহিদ। কাজেই ইবনে খাল্লিকানের উক্তিতে আমাদের হানাফী বন্ধুদের হৈ চৈ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কেননা এর মাধ্যমে তিনি ইমাম সাহেবের ভূয়সী প্রশংসাই বরং ব্যক্ত করেছেন। কাজেই আমাদের তাদের বিরোধিতা করা নিষ্প্রয়োজন। কথাটাকে এই বলে মেনে নেয়া উচিত যে, বেশ—ইমাম সাহেবের নিকট সত্তরটি হাদীসই পৌঁছেছিল, কিন্তু তিনি এত বড় প্রজ্ঞাবান ছিলেন যে, এই গোটা কয়েক হাদীস অবলম্বনেই লাখো লাখো খুঁটিনাটি মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

যাই হোক, এটা তো ছিল একটা সূক্ষ্মতর আলোচনা। নতুবা স্বয়ং মুহাদ্দিসগণই আলোচ্য উক্তির ভ্রান্তি স্বীকার করেছেন। এ কথা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রেওয়ায়েত ও বর্ণনা পর্যায়ে হানাফীগণ অন্যান্য ইমাম-মুহাদ্দিসের সমকক্ষ নন কিন্তু 'দেরায়েত' তথা অনুধাবন ক্ষেত্রে তাদের স্থান এত উচ্চে যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে বোঝা যাবে যে, কুরআন-হাদীস পড়েছে-পড়িয়েছে সকলেই কিন্তু মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে কেবল হানাফীরাই। একজন আহলে হাদীসের ঘটনা হলো—সে অধিকাংশ বিষয়ে মাসআলা আমার নিকট থেকে জেনে নিত। আমি তাকে বললাম—তোমাদের নিজেদের আলিমগণের কাছে এসব মাসআলা জিজ্ঞেস না করে আমাকে জিজ্ঞেস করার কি হেতু ? অথচ লোকটি স্বীয় মাযহাবের পাক্কা

আমলদার ছিল। কিন্তু ন্যায় কথা লুকানো যায় না। সে অনায়াসে বলে ফেলল—আমাদের আলিমগণ 'আমীন' আর "রফয়ে ইয়াদাইন" ছাড়া আর কিছুই জানে না, এসব মাসআলা তাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আপনার কাছ থেকে জেনে নিলেই মনে সান্ত্বনা পাই। মোটকথা, বোঝা গেল কোন কথা শোনা এক জিনিস আর মর্ম উপলব্ধি করা ভিন্ন জিনিস। —আল-জালাউ লিল-ইবতিদা, পৃষ্ঠা ২

## সাধারণ লোকের সন্দেহের অবসান

### ৪১. নবী করীম (সা) তনয় হযরত ইবরাহীম-এর ইনতিকালে মহানবী (সা)-এর ক্রন্দন করা ধৈর্যহীনতার প্রমাণ।

বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মহানবী (সা) নবীজাদা ইবরাহীম (রা)-এর ইন্তিকালে কেঁদেছিলেন। অথচ কোন কোন ওয়ালীআল্লাহ্‌র ঘটনা বর্ণিত আছে—বিপদকালে তিনি আলহাম্‌দুলিল্লাহ্ বলেছেন। অথচ নবীর মর্যাদা কারো পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।

জবাব হলো—এরূপ পরিস্থিতিতে অশ্রুপাত করাই সন্তানের হক। আর আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সবর করা সৃষ্টিকর্তার হক। রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তান ও আল্লাহ্ উভয়ের হক সমভাবে আদায় করেছেন। কিন্তু ওয়ালীআল্লাহর মর্তবা যেহেতু নিম্ন স্তরের, কাজেই তাঁর দ্বারা এক পক্ষের হক মাত্র আদায় হয়েছে, অপর হক অনাদায়ী রয়ে গেছে। একইভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—কিয়ামতের মাঠে কোন কোন নবীর মনে ওয়ালীআল্লাহর প্রতি ঈর্ষা সৃষ্টি হবে। দৃশ্যত এখানেও প্রশ্ন ওঠে, আফযাল কর্তৃক মাফযূলের তথা উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নিম্নমানের প্রতি ঈর্ষার কি কারণ? আসল কথা হলো—ঈর্ষা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। কোন সময় কামাল তথা পূর্ণতার অভাবে এরূপ হতে দেখা যায়, এখানে অবশ্য তা নয়। কখনো এক বিশেষ প্রশান্তি লাভের আশায়ও হতে পারে। যেমন উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তি দায়িত্বের চাপে মন্তব্য করেঃ পাঁচ টাকা বেতনের কর্মচারীরা আমার তুলনায় বেশ আরামে আছে, হিসেব-নিকেশের কোন বালাই নেই। নবীগণের ঈর্ষা মূলত এ জাতীয়। কেননা নবুয়তের উচ্চ মর্যাদায় আসীন থাকার দরুন তাঁরা উম্মতের চিন্তায় অধীর থাকবেন। অথচ ওয়ালীআল্লাহগণ এ ধরনের চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত। অতএব এই হলো আলোচ্য মানসিক ঈর্ষার ক্ষেত্র ও রহস্য। —মুজদালাতে মাদিলাতে, পৃষ্ঠা ৩৬

### ৪২. পাত্র-পাত্রী প্রায় সমবয়সী হওয়া বাঞ্ছনীয়, ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়

অর্থের প্রলোভনে কেউ কেউ বৃদ্ধের নিকট মেয়ে বিয়ে দিয়ে জুলুম করে বসে। 'গাংগুহ্'তে এক মেয়ে আপন সখিদের বলত—আমার মিঞা বাড়ি এলে মনে হয়

নানাজী এসেছেন। ইমাম সাহেবের রূহের ওপর শত-সহস্র রহমত বর্ষিত হোক যে, তিনি বলেছেন ঃ সাবালিকা মেয়ের ওপর কারো ইখ্‌তিয়ার স্বীকৃত নয়। এ মাসআলায় মতবিরোধ রয়েছে বটে, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে ইমাম সাহেবের ফতোয়া পরিস্থিতির সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সঠিক ও অর্থবহ প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান পরিবেশে কন্যা কর্তৃক মাতা-পিতার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা লজ্জাহীনতারূপে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ মেয়ের অস্বীকৃতি নয় বরং এ জাতীয় প্রস্তাব করাটাই নির্লজ্জতার পরিচায়ক। মেয়ে বিয়ের নামই শুনতে রাজী নয় এতেই তার লাজ-লজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত মেয়েদের দ্বারা এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াই সমীচীন এবং বিবেকসম্মত কাজ। "বৃদ্ধলোকের তরুণী ভার্যা সাধারণত অকাল বৈধব্যের শিকার হয়" এ বিপর্যয়ের জবাবে কেউ কেউ বলে ঃ কার মরণ আগে হবে এটাতো জানা নেই। এ-ও হতে পারে যে, মেয়ের মৃত্যু আগে এসে গেল। কিন্তু বৃদ্ধের মরণ আগে আর মেয়ের মরণ পরে আসাটাই স্বাভাবিক নিয়ম। লোকেরা সমবয়সের গুরুত্ব বড় একটা বিবেচনা করে না। বরং কোন কোন সম্প্রদায়ে বিপরীত রীতি লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ পাত্রী অপেক্ষা পাত্রের বয়স কম হয়। অথচ এর বাস্তব পরিণাম ভয়াবহ হতে দেখা যায়। একটু পরেই বিষয়টা আমি তুলে ধরছি, প্রমাণ দ্বারা যার করুণ পরিণতি সহজেই বুঝে আসবে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে পাত্রীর বয়স সামান্য কম হওয়াতে বিশেষ ক্ষতির কিছু নেই। এর কারণ হলো—বাস্তব জীবনে পুরুষের ভূমিকা শাসকের আর নারীকুল শাসিতের ভূমিকায় দিন কাটায়। দ্বিতীয়ত, নারীর শারীরিক গঠন-কাঠামো এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক বাঁধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল আকারে গড়া। কাজেই নারী দেহে দ্রুত বার্ধক্যের ছাপ পড়ে। প্রবাদ রয়েছে–"বিশেতে ছানা-মাখন, ষাটেতে গোরের ধন।" অতএব কম বয়সী নারী দেহে বার্ধক্য আগমনের কালে অধিক বয়সের দরুন পুরুষ দেহেও বার্ধক্যের পদধ্বনি শুরু হবে আর উভয়ে একই সাথে বার্ধক্যে পা-রাখবে। বিবেকসিদ্ধ এবং যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা) যে ক্ষেত্রে এটা পসন্দ করেননি সে ক্ষেত্রে পাত্রী অপেক্ষা পাত্রের বয়স কম হওয়াটা তাঁর পসন্দ কি করে হতে পারে, যা বিবেক বিরুদ্ধ। বিশেষত নারী শাসিত এবং পুরুষ অপেক্ষা দ্রুত বার্ধক্যে পৌছার বেলায় ? এমতাবস্থায় অধিক বয়স্ক বৃদ্ধা ও মাতৃতুল্য স্ত্রীর ওপর স্বামীর আধিপত্য বিস্তার কতটুকু মধুর হবে ? পরিণামে স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবে আর জীবন-সংসার অশান্তির অতলে তলিয়ে যাবে। কোন কোন গোত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের নিকট পূর্ণবয়স্ক যুবতী নারী বিয়ে দেয়া হয়, পরিণামে অশান্তি আর বিশৃংখলার অনলে সংসার জ্বলতে থাকে।

বন্ধুগণ! আমার নিকট এ ধরনের বহু প্রশ্ন আসে যে, স্বামী নাবালেগ, তাই বিবাহ বিচ্ছেদের কোন উপায় কি আছে ? আমার কথা—জুড়ে দেয়া তো পিতার অধিকারে কিন্তু তিনি ছিন্ন তো করতে পারেন না। কেননা অভিভাবক নাবালেগের লাভের অধিকারী মাত্র ক্ষতির নয়। কেউ প্রশ্ন করে নাবালেগ স্বামীর তালাক কার্যকর হবে কি-না। অথচ মাসআলা হলো—নাবালেগের তালাক কার্যকর নয়। সময়ে দেখা যায় ছেলে সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে, কিন্তু স্ত্রী অধিক বয়সী। অথচ স্বামী তালাক দিতে রাজি নয়। কোন কোন সময় প্রশ্ন আসে—শ্বশুরের সাথে পুত্রবধুর সম্পর্ক গভীর ও মধুর, এখন উপায় ? জবাব দেই—উপায় আর কি—স্বামীর জন্য স্ত্রী হারাম। উক্ত মহিলা এখন এক দিকে তার মা, অপরদিকে স্ত্রী অথচ স্বামীর কোন পরোয়াই নেই। কাজেই শরীয়তের দৃষ্টিতে এ অবস্থা ও ব্যবস্থা কি করে পসন্দের হতে পারে ? অবশ্য দু-চার বছরের ব্যবধান হওয়াটা না-পসন্দের তেমন কিছু না। কানপুরে এক মেয়েকে বলপূর্বক দেবরের সাথে বিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় মেয়েরা খাওয়া-পরার ভয়ে শ্বশুরালয়ের লোকদের মতে সায় দিতে বাধ্য হয়। মোটকথা, এসব ঘটনা আলোচনা দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্ত্রীর বয়স অতিরিক্ত বেশি হওয়াটা হিকমত ও কল্যাণের পরিপন্থী। —ওয়ায —আবদুল জাহিলিয়াহ, পৃষ্ঠা ৫৭

### ৪৩. ইলমে দীন হাসিল করার সহজ পদ্ধতি।

আপনাদের করণীয় এতটুকুই যে, উর্দু[১] ভাষায় লিখিত ছোট ছোট দীনী কিতাব পাঠ করা। পড়ার সময় না থাকলে অথবা অধিক বয়সের দরুন পাঠ করা কষ্টকর হলে কারো কাছ থেকে শুনে নিন। বস্তুত এর জন্য প্রতি শহরে এমন দু-একজন বিজ্ঞ আলিম থাকা দরকার যাদের দ্বারা পড়া ও শোনার প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। এ-লক্ষ্যদ্বয় অর্জনের চারটি উপায় হতে পারে।

১. কেউ তাঁদের নিকট দীন শেখার উদ্দেশ্যে হাজির হলে তারা শিক্ষা দেবেন। ২. মাসআলা জানতে চাইলে তা নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন। ৩. প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত একটি দিনে লোকদের জমা করে মাসআলার কিতাব তাদের সামনে তিনি পাঠ করবেন আর লোকরা মনোযোগসহ তা শুনবে। মাসআলার মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, লেন-দেন, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদির হুকুম শামিল থাকবে। ৪. চতুর্থ কাজ হবে সপ্তাহ কিংবা পনর দিন অন্তর অন্তর তিনি ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করবেন এবং লোকদের ভয় ও আশার বাণী শোনাবেন। ওয়ায মাহফিলকে

---

১. বাংলাভাষীদের জন্য বাংলায় লিখিত ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করা বিধেয়। —অনুবাদক

মাসআলা বর্ণনার জমায়েত থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে দেখা গেছে, ওয়ায মাহফিলে ফিকাহর মাসআলা বড় একটা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। একে তো খুঁটিনাটি মাসআলা প্রায়ই স্মরণ থাকে না, দ্বিতীয়ত মানুষ সাধারণত চমকদার বিষয়বস্তু শোনার আগ্রহ নিয়েই ওয়ায মাহ্ফিলে জমায়েত হয়। এজন্য ওয়াযের মধ্যে ভীতি ও আশাপ্রদ এবং উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় আলোচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ চার ধরনের কাজ ন্যস্ত থাকবে আলিমের দায়িত্বে। আর শহরবাসীদের দায়িত্বে থাকবে আলিমের আর্থিক সংস্থান করে দেয়া। এটা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। দেখুন, যে জনপদে চিকিৎসকের অভাব সেখানকার বাসিন্দাগণ চাঁদা তুলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা করে এবং তার বেতন যোগায়। রূহানী রোগের চিকিৎসা কি তবে শারীরিক ব্যাধির সমান গুরুত্বপূর্ণও নয় যে, এর জন্য প্রয়োজনে দু'পয়সা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতে হবে। এ হলো পুরুষদের কর্মসূচী। কিন্তু মহিলাদের সহজ কর্মপদ্ধতি হলো—শিক্ষিতা মেয়েরা ঘরে বসে বেহেশতী জেওর অথবা এ জাতীয় কোন কিতাব পাঠ করবে। আর অশিক্ষিতা মহিলারা নিজ ছেলেমেয়েদের দ্বারা বেহেশ্তী জেওরের মাসআলাসমূহ পাঠ করিয়ে শুনে নিবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে এ কাজের জন্য তৈরি করবে এবং তাদের মাধ্যমে এ জাতীয় শিক্ষাধারা চালু রাখবে। এ হলো সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী। এর দ্বারা ইনশাআল্লাহ্ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই দীনী ইল্ম হাসিল করতে সক্ষম হবে। অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং দীনী পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে। —ওয়ায—আছারুল মুহাব্বত, পৃষ্ঠা ২০

### ৪৪. কুরআন শরীফ একটি ভাষ্য, হাদীস-ফিকাহ্ তার ব্যাখ্যা।

কুরআন শরীফ আল্লাহ্র ভাষ্য, হাদীস-ফিকাহ্ ইত্যাদি এর ব্যাখ্যাস্বরূপ। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ একেই القياس مظهر لا مثبت বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ হাদীস ও ফিকাহ কুরআনের সারমর্মকে সুস্পষ্ট আকারে, সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করে মাত্র, কুরআনের বিপরীত কোন হুকুম বর্ণনা করে না। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো স্পষ্ট করা যায়। যেমন একটি সিন্দুক তালাবদ্ধ আছে। চাবি দ্বারা খুলে দিলে ভিতরের মণিমুক্তা দেখা যায়। তাহলে এগুলো চাবির সৃষ্ট নয় বরং পূর্বেই এসব মওজুদ ছিল, চাবি এগুলো দৃশ্যমান হওয়ার মাধ্যম মাত্র। সুতরাং হাদীস-ফিকাহ্ কুরআনের জন্য চাবিস্বরূপ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্ণাধারা মূলত এ থেকেই উৎসারিত। কবির ভাষায় ঃ

عباراتنا شتى وحسنك واحد

و كل الى ذالك الجمال يشير

—আমাদের মন্তব্যের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু একক ও অভিন্ন রূপের ছটায় তুমি মহিমান্বিত, গোটা সৃষ্টিকুল তোমার সে রূপের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

প্রেমিকা সকাল-বিকাল যতই রূপচর্চায় মগ্ন থাকুক আর পোশাকের পরিবর্তন ঘটাক না কেন অন্যরা তার পরিচয় লাভে ভুল করতে পারে, কিন্তু প্রেমিক নয়নের ভ্রম হতে পারে না। তার কণ্ঠে ছন্দায়িত সুর লহরী মূর্ত হয়ে ওঠে ঃ

بهر رنگے که خواهی جامه می پوش

من هر انداز قدرت می شناسم

(অর্থাৎ যে রঙ্গের পোশাকই তুমি পরিধান করো চলার ভঙ্গিতেই আমি তোমায় চিনে ফেলি।) অতএব প্রেমিক নয়নে আর আশেক দিলে হাদীস-ফিকাহ্ সব কিছুতে কুরআনের ছবিই ভেসে ওঠে। মাওলানা মাযহার নানুতুবী (র) মাওলানা গাংগুহীকে লক্ষ করে বলতেন, আপনার সান্নিধ্যে আসলে তো হাদীস সব হানাফী রং-এ রঞ্জিত মনে হয়। তাঁদের নযরে হাদীসের মধ্যে ফিকাহ্ ভেসে উঠত। উপরন্তু ওলী-আল্লাহ্গণের অবস্থা হলো ঃ

بسکه در جاں فگار و چشم بیدارم توئی

هرچه پیدا می شود از دور پندارم توئی

—দেহ-মনে একমাত্র তুমিই বিরাজমান, দূর থেকে দৃষ্টির আওতায় যা কিছু ভেসে আসে তা কেবল তুমিই তুমি।

তদ্রূপ ওলী-আল্লাহগণ সবকিছুতেই আল্লাহ্কে দেখতে পান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের দৃষ্টিতে এসবই আল্লাহর আসনে আসীন। আস্তাগফিরুল্লাহ! আল্লাহ মাফ করুন, বান্দা বান্দাই আর আল্লাহ্ আল্লাহ্ই। যেমন কুরআন কুরআনই আর হাদীস হাদীসই। মাওলানা জামীর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার আত্মহারা অবস্থায় তিনি বলতে থাকেন ঃ দূর থেকে যা কিছু দেখি কেবল তুমিই তুমি (অর্থাৎ আল্লাহ্ই আল্লাহ)। বিদ্রূপের সুরে একজন বলল ঃ মাওলানার যদি গাধা নযরে আসে তাহলে ? জবাব দিলেন ঃ বুঝব তুমিই। —ওয়ায—হাক্কুল ইতাআত, পৃষ্ঠা ১২

## ৪৫. আজকাল মুস্তাহাবের পরোয়া করা হয় না, এর শিক্ষার প্রতিও যত্ন নেয়া হয় না

আজকাল মুস্তাহাবকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয় না। অবশ্য আমলের বেলায় এটা ফরয-ওয়াজিবের ন্যায় আবশ্যকীয় অবশ্যই নয়। কিন্তু দুই কারণে এর শিক্ষা জরুরী। প্রথমত, মানুষ যেন এর অবস্থান এবং মুস্তাহাব হওয়াটা জানতে পারে। তাহলে কেউ একে না-জায়েয অথবা ফরয-ওয়াজিব জ্ঞান করবে না। বিশ্বাসগত পরিশুদ্ধির জন্য এটা দরকার। এ হিসেবে মুবাহ্ বিষয়ের শিক্ষাও প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত মুস্তাহাবের সুফল ও বরকত অগণিত। সে সবের অজ্ঞতাই এর প্রতি অনীহার কারণ। ন্যূনতম মুস্তাহাবের সুফল জানার পর আক্ষেপের সুরে নিজেই আপনারা বলবেন—এ মূল্যবান মণি-মুক্তার খবর না জেনে প্রকৃতই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলাম। আমলে পূর্ণতা লাভের জন্য এটা প্রয়োজন। মোটকথা—কুরআনপাকে মুস্তাহাবের উল্লেখ বে-দরকারী নয় ; বরং শিক্ষার পর্যায়ে এর বর্ণনাও গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ। আন্তরিক ভালবাসা দ্বারাই কেবল এর মূল্যমান বুঝে আসা সম্ভব। প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি লাভের ক্ষুদ্রতম উপলক্ষ সন্ধানের প্রতি প্রেমিকের আকর্ষণ চিরন্তন। প্রেমিক যখন জানতে পারে অমুক বিষয়ে আমার প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি তখন সে সেসব পুরো করার প্রাণপণ চেষ্টা চালায়, এমন কি প্রয়োজনীয় কোন কাজ যেন তার দ্বারা উপেক্ষিত না হয়, এতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। অন্তরে এ ধরনের প্রেমের আকর্ষণ সৃষ্টি সাপেক্ষেই কেবল আমাদের দ্বারা মুস্তাহাবের মূল্যায়ন আশা করা যেতে পারে। এর বর্ণনাকে আমরা আল্লাহ্‌র রহমত ও রাসূল (সা)-এর অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য করতে পারি যে, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর সন্তুষ্টির পথ সহজ-সরল ভাষায় কত সুন্দর-সাবলীল ভঙ্গিমায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুস্তাহাব বিষয়ের বর্ণনা বাদ দিয়ে শরীয়তের কেবল আবশ্যকীয় বিষয়াদির উল্লেখ করা হলে আল্লাহ্‌র প্রেমে নিবেদিত প্রেমিকরা ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। কেননা শুধুমাত্র জরুরী বিষয়কে যথেষ্ট মনে করা প্রেমাঙ্গনের রীতিবিরোধী। একে সে অর্পিত দায়িত্ব জ্ঞান করে এর বাইরে অতিরিক্ত এমন কিছু সম্পাদনে উদগ্রীব থাকে যা তার নিজের প্রতি মাহবুবের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হয়। লক্ষ করুন, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য আপনার বেতনভুক্ত কর্মচারী দায়িত্বটুকু সম্পাদনেই সীমিত তৎপরতা দেখাবে। অতিরিক্ত কাজের প্রতি তার আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। আপনার অপর একজন চাকর বাল্যকাল থেকে আপনি লালন-পালন করছেন, যে আপনার স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ কেবল নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা আদৌ সে যথেষ্ট মনে করতে পারে না। বরং তার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা হবে মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এমন যেকোন কাজ আমার

হাতে সম্পাদিত হোক। নির্দিষ্ট দায়িত্ব কাজটুকু ছাড়াও রাতে সে আপনার পা টিপে দেবে, পাখা ঘুরাবে, আপনার জাগার আগেই সে প্রয়োজনীয় সব কাজ সমাধা করে রাখবে। অথচ তার কল্পনাই হবে না যে, এসব আমার দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ, এর পিছনে আমার শ্রম ব্যয় করার স্বার্থকতা কোথায় ? আদৌ না বরং মালিকের প্রতি তার ভালবাসা ও আত্মনিবেদন তাকে বাধ্য করবে মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এমন কাজ করতে।

বন্ধুগণ! ভুল ধারণাবশে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল আইনের বাঁধনে আঁটা। সে জন্যেই ফরয-ওয়াজিবের অতিরিক্ত মুস্তাহাবকে আমরা গুরুত্বহীন ধারণা করি। মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে আমাদের সম্পর্ক প্রেম ও আত্মনিবেদনের আবেশে গড়া হলে ফরয-ওয়াজিবকে যথেষ্ট জ্ঞান না করে মুস্তাহাবের সন্ধানে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত ছিল। যে কাজ আল্লাহ্‌র প্রিয়, যে কর্মে তিনি সন্তুষ্ট তা জানার পর সে পথে অগ্রগামী থাকার লক্ষ্যে আমাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা-যত্ন থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। উল্লেখ্য, কোন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আশেক বা প্রেমিকজনের পক্ষে এতটুকু জ্ঞাত হওয়াই যথেষ্ট যে, এ কাজ আমার মাহবুবের প্রিয় নয়। এ ক্ষেত্রে না-পসন্দের মাত্রা কতটুকু, এর জন্য কি সাজা-শাস্তি নির্ধারিত, তিনি মনক্ষুণ্ন হবেন না-কি শুধু মুখ ফিরিয়ে নিবেন এসব প্রশ্ন সে কল্পনাই করে না। এ সব কথা তার নিকট অর্থহীন। আর যে কাজ তাঁর অসন্তুষ্টি ছাড়াও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তার দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া অকল্পনীয়। কিন্তু আজকাল আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে—যখন কোন কাজের পরিণাম গুনাহ্ বলে জানা যায়, তখন প্রশ্ন ওঠে—গুনাহ্ কোন্ জাতের, বড় না ছোট ? তার অর্থ এই যে, ছোট হলে বোধ হয় করা যায়। এটা আল্লাহ্‌র সাথে ক্ষীণ সম্পর্কেরই পরিচায়ক। অবশ্য একেবারে ছিন্ন বুঝায় না, যেহেতু এ জাতীয় প্রশ্ন জাগাটাই তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেয়। এদের পক্ষ টেনে আমি বলব—তাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে একেবারে সম্পর্কহীন যেন মনে করা না হয়। কারণ সম্পর্ক এতটুকু তো বিদ্যমান যে, আল্লাহ্‌কে তারা অধিক নারাজ করতে চায় না, নতুবা গুনাহ্ বড়-ছোট এ প্রশ্নের তাদের দরকারই ছিল না। তাতে বোঝা গেল, গুনাহ বড় হলে তারা শংকিত যে, আল্লাহ্ তাতে ভীষণ নারাজ। কিন্তু সম্পর্ক যেহেতু গভীর নয়, তাই সামান্য নারাজ করতে তারা একটু সাহসও পায়। মোটকথা, ব্যক্তির এ প্রশ্ন আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্কের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

আমার এ বক্তব্য শুনে "গুনাহ ছোট কি বড়" এ প্রশ্নকর্তারা হয়তো খুশি হবে এই মনে করে যে, যাক—আল্লাহ্‌র সাথে আমাদেরও সম্পর্ক প্রমাণ হয়ে গেল এক হিসেবে কথাটা খুশি হবার মতই। যেমন কবির ভাষায় ঃ

بلا بودے اگر اینہم نبودے

অর্থাৎ যদি এ-ও না হতো, তবে বিপদই ছিল। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, কেবল নামমাত্র সম্পর্কের ওপর সন্তুষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি শুধু এ টুকুকেই যথেষ্ট মনে করা হয়? আদৌ না। বরং প্রত্যেক সম্পর্কের শেষ বিন্দুই সবার কাম্য। দেখুন, স্ত্রীর সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, যা দুই কথায় গড়ে এক কথায় ভাঙে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কাউকে আমরা কেবল নামসর্বস্ব সম্পর্ক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেখি না। বরং সবাই কামনা করে স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক সুগভীর ও প্রীতির শক্ত ডোরে মজবুতভাবে বাঁধা হোক। এজন্যই শুধু বিধিবদ্ধ ও নির্দিষ্ট জরুরী হক আদায় করাকেই যথেষ্ট ভাবা হয় না। বরং স্ত্রীর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে প্রাপ্য হকের অতিরিক্ত কাজ এবং গহনা-অলংকার তৈরি করে দেয়। দাম্পত্য বন্ধন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই কেবল এসব করা হয়। অথচ এতে স্ত্রীর কোন দাবি নেই। স্বামী-স্ত্রী যদি শুধুমাত্র আইনগত সম্পর্কটুকুই রক্ষা করে চলে আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না করে, তবে ন্যূনতম সম্পর্কই বাকি থাকতে পারে মাত্র, কিন্তু তাতে স্বাদের আশা করা যায় না। এমতাবস্থায় সারাক্ষণ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার প্রবল আশংকা বিদ্যমান থাকে। সুদৃঢ় করার সযত্ন প্রয়াসের মাধ্যমেই কেবল সম্পর্ক স্থিতিশীল হতে পারে। স্ত্রীর ভরণ-পোষণই শুধু স্বামীর দায়িত্ব, তার সাজ-অলংকার, মূল্যবান রেশমী পোশাক, ঔষধ-পথ্য কিংবা তার আত্মীয়ের সেবা-যত্ন স্বামীর ওপর অনিবার্য নয় কিন্তু স্ত্রীর মন জয় এবং সম্পর্ক মধুর করার উদ্দেশ্যেই এত সবের আয়োজন। অথচ ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, এ সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তা ছিন্ন করার পক্ষপাতী নয়। আর কোনক্রমে বিচ্ছেদ এসে গেলে কি পরিমাণ বেদনা অনুভূত হয়? তাই তা রোধ করার জন্যই দৃঢ়তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা হয়। তাহলে আশ্চর্যের কথা যে, একটা দুর্বল সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল আনুষঙ্গিকতা বর্জিত মূল সম্পর্কের ওপর ভরসা না করে বিচ্ছেদের আশংকায় একে মজবুত করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। আর মহান আল্লাহর বেলায় কেবল নামমাত্র সম্পর্ককেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অথচ আল্লাহ্‌র সাথে অতুলনীয় গভীর সম্পর্কডোরে আমরা অষ্ট প্রহর বাঁধা। তাহলে একে সুদৃঢ় করার জন্য আমাদের যত্নশীল না হওয়ার কি কারণ। সম্পর্ক কেটে যাওয়ার আশংকা যেখানে সর্বদা অথচ এটা কারো কাম্যও নয়, তাহলে একে দৃঢ় করার ভাবনা কেন অনুপস্থিত? তাই মাওলানা রূমী বলেন ঃ

ایکه صبرت نیست از فرزند وزن

صبر چوں داری زرب ذو المنن

ایکه صبرث نیست از دنیائے دوں

صبر چوں داری زنعم الما هدون

—হে মানুষ! স্ত্রী-সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াটা যেখানে সহ্যের বাইরে সেক্ষেত্রে করুণাময় 'রবের' সম্পর্ক ছিঁড়ে যাক, এটা তোমার কিরূপে সহ্য হবে। হে মানুষ! নিকৃষ্ট দুনিয়ার সম্পর্ক নষ্ট হওয়া যার ধৈর্যে কুলায় না, পরম অনুগ্রহকর্তা আল্লাহ্র সম্পর্ক বিলীন হোক এতে তোমার সবর থাকবে কিরূপে ?

পরিতাপের বিষয়, ক্ষুদ্র জিনিসের সম্পর্ক আমাদের আচরণে নষ্ট হতে দেই না অথচ একই দুর্বলতা আল্লাহ্র সম্পর্কে দেখা দিলে আমাদের অন্তরে ব্যথা লাগে না। অবশ্য আল্লাহ্র সাথে আনুষঙ্গিকতা বর্জিত নামসর্বস্ব সম্পর্ক যদিও একটা নিয়ামত কিন্তু এহেন দুর্বল সম্পর্ক যথেষ্ট ধারণা করাটা নিতান্ত জুলুম। কাফেররা তো সম্পর্কের গোড়া ছিন্ন হওয়াতেই সন্তুষ্ট। এ মুহূর্তে তাদের সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আক্ষেপ তো হয় আমাদের আজকালের মুসলমানদের জন্য যে, আল্লাহ্র সাথে এহেন দুর্বল সম্পর্ক আমরা কিরূপে সয়ে যাই। যে কারণে আমরা মুস্তাহাবের মূল্যও দেই না, গুরুত্বও বুঝি না। আমার নিজের কথাই বলি—বালক বয়সে আমি অধিক পরিমাণ নফল পড়ায় অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু "মুনিয়াতুল মুসল্লী" পড়ে যখন জানতে পারলাম যে, মুস্তাহাব আমল না করাতে গুনাহ নেই তখন থেকেই নফল পড়া ছেড়ে দেই। তখন তো সতর্ক হইনি যে, করছি কি, কিন্তু এখন উপলব্ধি জাগে যে, কাজটা ভাল করিনি। তাহলে এর সারকথা এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্র সাথে আমরা কেবল নিয়মের সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী আর শুধু অত্যাবশ্যক টুকুই মেনে চলি। তাহলে শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিদের সাথেও কি আমরা নিতান্ত প্রয়োজনীয় খেদমতের সম্পর্কটুকুই রক্ষা করি আর দায়িত্বের বাইরে কিছুই করি না ? মোটেই না। দেখুন, কোন কোন সময় নিজ স্বার্থে অথবা শ্রদ্ধা-ভক্তির আবেগে মুরুব্বিদের সাথে আমরা নিছক দায়িত্বের অতিরিক্ত খেদমতও করি। তাহলে আমাদের ওপর আল্লাহ্র হক কি পীর-বুযুর্গ ও মান্যজনদের সমতুল্যও নয় ? কিছুটা তো ইনসাফ থাকা উচিত। তাহলে এটা কেমন কথা হলো যে, আল্লাহ্র আনুগত্য কেবল ফরয-ওয়াজিবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব আর ওয়াজিব বহির্ভূত কাজের গুরুত্বই থাকবে না।

অবশ্য এটা সত্য যে, আল্লাহ্র শান ও মান অনুপাতে আনুগত্য আমাদের সাধ্যের অতীত, আমরা যত চেষ্টাই করি তাঁর হকের তুলনায় তা অল্পই হবে। মুস্তাহাব বিষয়ে আমাদের শৈথিল্যের এ-ও একটা কারণ। কেননা আমরা ধোঁকায় পড়ে যাই যে, আল্লাহ্র হক আদায় করা যখন সম্ভবই নয় তাহলে আর অধিক চেষ্টা করে লাভ কি। কিন্তু এ ধারণা মারাত্মক ভুল। সন্দেহ নেই আল্লাহ্র হক অনুপাতে আমল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু নিজেদের সামর্থ্য অনুপাতে তো করা যায় । রাজা-বাদশার দরবারে দিন-রাত উপহার সামগ্রী আসতেই থাকে আর সবাই জানেও যে, আমাদের উপহার তাদের মর্যাদাতুল্য নয়। কিন্তু তবুও উপহার দেয়া কখনো বন্ধ থাকে না বরং সাধ্যমত উত্তম উপহার পাঠানো অব্যাহত থাকেই। তাই প্রবাদ রয়েছে ঃ উপহার হয়তো পরের মান অনুপাতে হবে অথবা কমপক্ষে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী। সুতরাং নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের আমল করা উচিত। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাদের নিজেদের সাধ্য-মত আমল করাই যথেষ্ট। শক্তির বাইরে আপনার করার প্রয়োজন নেই। বান্দা নিজের শক্তি অনুসারে আমল করুক এটাই আল্লাহ্র হুকুম, আল্লাহ্র মান অনুপাতে নয়। সুতরাং আল্লাহ্র হক আদায় করা সম্ভব নয়—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেয়াটা নিতান্ত ভুল। অবশ্য সময়ে বিশেষ পরিস্থিতি এবং শরীয়তসম্মত কারণে মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেয়া ভিন্ন কথা। যেমন মানুষকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, কাজটা ওয়াজিব নয় অথবা সফরকালে সাথীদের অবস্থা লক্ষ করে নফল থেকে বিরত থাকা কিংবা ক্লান্তির পর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে মুস্তাহাব ছেড়ে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ ان لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا (অর্থাৎ তোমার ওপর তোমার নিজের ও চোখের হক রয়েছে) কিন্তু বিনা কারণে নিছক অলসতাবশত ছেড়ে দেয়া থেকে হাদীসে পানাহ চাওয়া হয়েছে। মহানবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ اللهم انى اعوذبك من العجز والكسل (হে আল্লাহ্! আমি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।) উত্তমরূপে বুঝে নিন—বিশ্রাম এক জিনিস, আর অলসতা ভিন্ন জিনিস, উভয়কে অভিন্ন মনে করা ভুল। মহানবী (সা) নিজে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন এবং কোন সাহাবীকে মুস্তাহাব তরক আর নফলের মাত্রা কমাতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাহলে বুঝুন, বিশ্রাম ও অলসতার ব্যবধান কতটুকু। ব্যক্তি তার সাধ্যমত পরিশ্রমের পর তাকে হুকুম করা হয়—শক্তির বাইরে কাজের দরকার নেই, গিয়ে আরাম কর। এর নাম বিশ্রাম। আর অলসতা বলা হয় সাধ্যমত কাজ না করা কিংবা শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখা। এ থেকেই

আল্লাহ্‌র দরবারে আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের গভীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে মুস্তাহাবও জরুরী বিষয়। "আল্লাহ্‌র প্রত্যেক কাজের প্রতিটি অংশ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ"—আমার এ মন্তব্য থেকে সৃষ্ট সন্দেহের জবাবে আমি এতক্ষণ আলোচনার জের টানছিলাম। কেননা কুরআনে বর্ণিত মুস্তাহাব বিষয়গুলোকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করা হয়। তাই আমি প্রমাণসিদ্ধ আলোচনা করেছি যে, এ শিক্ষাও অপরিহার্য। কারণ এগুলোর অসংখ্য সুফল ও বরকত রয়েছে। সুতরাং এর ফলে অনেক সময় গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। এ হলো এক দিকের বরকত। কারণ তাহাজ্জুদ, ইশরাকে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে পাপাচার হতে আত্মরক্ষা করা অধিকতর সহজ। কিন্তু যে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের ফরযটুকু আদায় করে তার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার অতিরিক্ত এর আরো একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাহলো মুস্তাহাব আমলে অভ্যস্ত ব্যক্তি দীনদার-পরহেযগার হিসেবে সমাজে খ্যাতি লাভ করে। তাই এ উপাধির ফলে অন্যায়-পাপ কাজে লিপ্ত হতে নিজে নিজেই সে লজ্জা ও সংকোচ বোধ করে। আবার সময়ে কোন কোন মুস্তাহাব আমল আল্লাহ্‌র এমনি পসন্দ হয় যে, এটাই তার মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

—যম্মুন্ নিসইয়ান, পৃষ্ঠা ৩

**৪৬. কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সাধারণ লোকের পক্ষে ক্ষতিকর।**

জনৈক মোল্লাজী আমার নিকট কুরআনের অনুবাদ (যাকে সাধারণ লোকেরা বলে মুতারাজ্জিম, যেমন আমার জনৈক বন্ধু "দিওয়ানে-মুতানাব্বী"-কে বলত মুতাবান্নী) নিয়ে হাজির হয়। শাহ্ আবদুল কাদেরকৃত উক্ত অনুবাদ সাধারণ কথ্য ও প্রচলিত পরিভাষায় করা হয়েছিল। তাতে—

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ -

—ওযূ সম্পর্কিত আয়াতের তরজমা করা হয়েছিল ঃ "ধোও তোমরা নিজেদের মুখগুলিকে এবং হাতগুলিকে আর মল মস্তকসমূহকে এবং পাগুলিকে। এতে "নিজেদের পাগুলিকে" প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী "ধোও মুখগুলি এবং হাতগুলির" সাথে সম্পৃক্ত হবে, পরবর্তী "মল মাথাগুলিকে" শব্দের সাথে নয়। এ থেকে মোল্লাজী ধারণা করে নিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী শব্দের সাথে এর সম্পর্ক। এখন অনুবাদ দেখিয়ে তিনি আমাকে বলতে লাগলেন—কুরআন দ্বারা তো পা-মসেহ্ করা প্রমাণ হয়। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম যে, যে লোক 'আতফ' ও 'ই'রাব' (শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ও

মাত্রা) সম্পর্কে অবহিত নয়, এমন জাহেলকে কি করে বোঝাব। যা হোক আমি বললাম, মোল্লাজী! আপনি কি করে এটা বুঝলেন যে, কুরআনপাক আল্লাহ্‌র কালাম ? তিনি বলেন ঃ আলিমদের কথায়। আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবর, আরবী বাক্য সমষ্টিকে 'কুরআন' বলার ব্যাপারে তো আলিমরা সত্যবাদী, ঈমানদার, কিন্তু পা-ধোয়া ফরয বলার ব্যাপারে কি তারা ঈমানদার নন! কাজেই আলিমগণ বলেছেন যে, পা-ধোয়া ফরয আর মসেহ করা জায়েয নয়। অধিকন্তু তারা এ-ও বলেছেন যে, তোমার মত লোকদের কুরআনের তরজমা পড়া জায়েয নয়। খবরদার ভবিষ্যতে কখনো তরজমা পড়বে না। শুধু তিলাওয়াত করবে, অনুবাদ মোটেই দেখবে না। অন্য এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল, যে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও অযিফা পাঠে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু কুরআনের অনুবাদ পড়ে গোমরাহ হয়ে যায়। সে আমাকে বলল, কুরআন তিলাওয়াতের সময় আমি راعنا শব্দটি ছেড়ে দেই। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا যার তরজমা করা হয়েছে ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা راعنا বলো না। তাহলে তিলাওয়াত কালে راعنا শব্দকি পড়ব না ? বললাম راعنا তো ছাড়বে না কিন্তু কুরআনের অনুবাদ পড়া ছেড়ে দাও। কেননা বোঝার যোগ্যতা তোমার নেই।

বন্ধুগণ! কুরআন-হাদীসের তরজমা দেখে এভাবে মুজতাহিদরূপ নিয়ে লোকেরা শরীয়তের সর্বনাশ সাধন করেছে। এখন এদের অযোগ্যতার দৃষ্টিতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া না হলে এবং কুরআনের অনুবাদ পড়া থেকে নিষেধ করা হলে কেউ কেউ বলে বেড়ায়—আলিমরা আমাদের প্রশ্নের সমাধান দিতে অক্ষম। আমি বলি—দুঃখ তো এই যে, আপনারা বুঝতে পারছেন না, জবাব তো প্রশ্ন মাত্রেরই রয়েছে, কিন্তু তা বুঝবে কে ? কবি বলেছেন ঃ

سیوف حداد یالوی بن غالب

مواض ولکن این السیف ضاء ب

—সুদক্ষ কর্মকার কর্তৃক ইস্পাত নির্মিত তরবারি প্রস্তুত আছে বটে, কিন্তু হে লুয়াই ইবনে গালেব! সে অসির আঘাত পড়ছে কোথায় ?

বন্ধুগণ! আপনাদের এ প্রশ্ন আলিমদের প্রতি নয়, স্বয়ং নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে, কিন্তু আপনাদের সে খবর নেই। কবির ভাষায় ঃ

حملہ بر خود می کنی ائے سادہ مرد

ہمچوں آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

—হে সরলমনা! নিজের প্রতি আক্রমণকারী সিংহের ন্যায় আপনার বিরুদ্ধেই তোমার এ আক্রমণ।

প্রসঙ্গত আমাদের এখানকার জনৈকা মহিলার ঘটনা প্রণিধানযোগ্য, যে ঈদের চাঁদ দেখতে বেরিয়েছিল। ইতিপূর্বে সে বাচ্চার পায়খানা পরিষ্কার করেছিল। হাতের আঙ্গুলে ময়লার কিছু অংশ তখনো লেগে রয়েছে। নাকের ডগায় আঙ্গুল রাখা মেয়েদের অভ্যাস। সুতরাং নাকে আঙ্গুল রেখে চাঁদ দেখাতে ময়লার গন্ধ তার নাকে পৌঁছে। তখন সে বলে ওঠে—এবারের চাঁদ কেমন যেন পচা পচা। সে জাহিলদের অবস্থাও তদ্রূপ যারা আলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়, যে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয় না। নিজেদের যে বোঝার যোগ্যতা নেই সে খবরই তাদের জানা নেই। সহিস যদি কলেজের কোন অধ্যাপককে বলে—আমাকে গণিতশাস্ত্রের প্রথম সূত্রের পঞ্চম অংক বুঝিয়ে দিন। অধ্যাপকের বক্তব্য বুঝতে অক্ষম হয়ে সে যদি বলে—কি আবোল তাবোল বলল মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। তাহলে বলুন দোষ কার। অবশ্যই সহিসের ! কিন্তু মূর্খদের মতে তো অধ্যাপক সাহেব এতক্ষণ বকাবকিই করলেন। যেমন আমাদের এলাকায় একবার মেয়ে মহলে ওয়ায হলো। এক তাঁতীর স্ত্রীও সেখানে ওয়ায শুনতে আসে। কতক্ষণ চুপ থেকে যখন কিছুই তার বুঝে আসে না তখন বলতে থাকে—জানি না ছাই মাটি কি যে বলছে। বাস্তবিক সমস্ত ওয়ায তার নিকট ছাই তুল্য। এখন বলুন, তার এ অভিযোগ নিজের ওপর না ওয়াযকারীর প্রতি। তদ্রূপ উক্ত মোল্লাজীকে আমি শিক্ষা ধারায় বুঝাতে অক্ষম হলে সে দোষ কার। এদের বুদ্ধি-বিবেকের দৌড় এ পর্যন্তই।

মসজিদের মুতাওয়াল্লী এ ধরনের একজন লোককে অন্ধকার রাতে প্রতিদিন পায়খানায় বাতি রাখার হুকুম দেয়। একদিন সে বাতি রাখতে সেখানে যায়। কোনও শিক্ষার্থী তখন পায়খানায় বসা। তাকে লক্ষ করে সে বলতে থাকে মৌলভী মিঞা! চোখ বন্ধ কর, আমি আলো রাখব। জি হ্যাঁ, মজার কথা, সে তো তোমায় কাপড় পরা অবস্থায়ও দেখতে পাবে না আর তুমি তাকে উলঙ্গই দেখে নেবে। এখন এ ধরনের বিবেকহারাদের কি প্রকারে বোঝানো যায় যে, আয়াতে বর্ণিত ارجلكم -এর সম্পর্ক وجوهكم ও ايديكم এর সাথে। এটা মানসূব অবস্থায় মাতূফ মাজরূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

আরবী ব্যাকরণ না-জানা ব্যক্তির পক্ষে এ জবাব বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। এজাতীয় লোকের জন্য জবাব হলো—কুরআনের কুরআন হওয়া তোমরা যে উপায়ে অবগত হয়েছ, সে একই সূত্রে তোমরা হুকুম-আহ্কামও হাসিল কর। কুরআনের অর্থ

বোঝার অধিকার তোমাদের জন্য স্বীকৃত নয়। এ ব্যাখ্যা আমি এজন্য দিয়েছি কুরআন পাকের তরজমা বা অনুবাদ পড়ে আপনারা নিজেদেরকে যেন বিজ্ঞ মনে করে না বসেন। মানুষের মধ্যে এটা এক মারাত্মক ব্যাধি।

—তাওয়াসী বিল হক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯

**৪৭. দোয়া কবূল হলে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যেত। সুতরাং ফল যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন দোয়াও কবূল হচ্ছে না এ ধরনের সন্দেহের জবাব।**

এর জবাব হলো—দোয়া কবূল হওয়ার দুটি পর্যায় রয়েছে। (১) আবেদন গ্রহণ করা এবং তার ওপর বিবেচনার আশ্বাস দেয়া। (২) আবেদন অনুযায়ী ফায়সালা দেয়া।

বন্ধুগণ! হাকিমের নিকট আবেদন গৃহীত হওয়াও এক প্রকার মঞ্জুরি ও সফলতা। কোর্ট-কাচারিতে মোকদ্দমার আপীল করা হলে আপনারা লক্ষ করে থাকবেন সেখানেও তা গ্রহণের দুটি ধারা রয়েছে। প্রথমত, বিবেচনার জন্য আবেদন গৃহীত হওয়া। এটাও বড় ধরনের সফলতা। আর অগ্রাহ্য হওয়াটা আবেদনকারীর চরম ব্যর্থতার শামিল। অতঃপর সফলতার দ্বিতীয় পর্যায় হলো আপীল গ্রহণের পর সে অনুপাতে রায় দেয়া। বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার পর এখন বুঝুন ঃ[১] اجيب دعوة الداع।

(১) আয়াতাংশের মর্ম গ্রহণের প্রথম পর্যায়ে প্রযোজ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে নয়। আয়াতের শব্দই এর প্রমাণ। কেননা এটাকে انى قريب (আমি নিকটবর্তী অবশ্যই) এ অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে নৈকট্যের বর্ণনা রয়েছে। যার দাবি হলো—আবেদন গ্রহণ করা, রায় শীঘ্র হোক বা বিলম্বে, পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে এর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ফায়সালা হবে আইনের ভিত্তিতে অথবা প্রার্থীর কল্যাণ দৃষ্টে।

মামলার বিবরণ দৃষ্টে হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণের অর্থ এই যে, প্রার্থীর আবেদন নাকচ না করে শুনানির জন্য গ্রহণ করা। অতএব اجيب অর্থ সকল দোয়াকারীর দরখাস্ত আমি গ্রহণ করি, তার প্রতি দৃষ্টি দেই, অযত্ন করা হয় না। এটাই কি কম কথা। ভাইগণ! দুনিয়াতে তো বিচারকের আদালতে কেবল দরখাস্ত গ্রহণ করার জন্য নানান তদবীর, কত সুপারিশ করা হয়। অতঃপর মনকে আমরা প্রবোধ দেই যে, যথাযথ আইনের বিচার হলে রায় আমার অনুকূলে আসবেই। এক্ষেত্রেও তদ্রূপ মনকে বুঝানো উচিত—দরখাস্ত আল্লাহ্র দরবারে যখন গৃহীত হয়েছে তাহলে আমার কল্যা-

---

১. আমি প্রার্থনাকারীর আবেদনে সাড়া দেই।

ণের বিপরীত না হলে অবশ্যই তা পুরা করা হবে। অন্যথায় এর বিনিময় অন্য কিছু পাওয়া যাবে। এ কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, দোয়া কবূলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বেলায় আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্য পুরা করাটা বান্দার স্বার্থহানিকর হয় কিনা এতটুকু লক্ষ্য রাখা হয়। সুতরাং এটাও বিরাট সাফল্য। লক্ষ করুন, ছেলে পিতার নিকট পয়সা চায়। এখন তা গ্রহণ করার এক পর্যায় তো এই যে, স্নেহের সুরে পিতা তাকে বলল ঃ হ্যাঁ, তোমার দাবি মানলাম। অতঃপর পিতা কখনো নগদ পয়সাই দিয়ে দেয়, আবার কখনো বাজারে গিয়ে ক্ষতিকর বাজে জিনিস কিনে খাবে কিংবা ছেলের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে এ বিবেচনায় নগদ পয়সার পরিবর্তে নিজেই পয়সা দিয়ে কিছু কিনে দেয়। তাহলে কি ছেলের আবেদন পুরা হয়নি বলা হবে ? আদৌ না। বরং বাহ্যত পুরা না হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পূর্ণ হয়েছে বলেই স্বীকার করা হবে। যেহেতু নগদ পয়সা অপেক্ষা তাকে উত্তম বস্তু দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ এখানেও বুঝতে হবে আল্লাহপাক যেমন প্রজ্ঞাময় তেমনি সর্বশক্তিমান, তিনি পরম দয়ালু এবং অনুগ্রহশীলও। উপরন্তু বান্দার প্রতি পিতা-মাতা অপেক্ষা সীমাহীন দয়ালু, তা সত্ত্বেও দাবি অনুপাতে দেয়া হয় না। তাহলে বুঝতে হবে আমাদের দরখাস্ত হুবহু পূর্ণ করা ছিল কল্যাণের পরিপন্থী। অতএব পরিবর্তে তিনি ভিন্নতর অনুগ্রহ দান করবেন। দুনিয়ার বিচারপতিগণ দরখাস্ত গ্রহণ করার পর রায় দেয়ার সময় তা পুরা করা আইনের পরিপন্থী কি-না কেবল এটুকু লক্ষ করেন। আইনবিরোধী হলে তা বাতিল করে দেন আর পরিবর্তে কিছুই দেন না। কিন্তু মহান আল্লাহ বিধানের সাথে এ-ও দেখেন যে, আবেদন পূর্ণ করা বান্দার কল্যাণ বিরোধী কি-না। কাজেই এভাবে আবেদন পূর্ণ হওয়াই প্রকৃত সফলতা। এতএব আল্লাহর ওয়াদাকৃত 'ইজাবত' তথা কবূলের অর্থ—আবেদন গ্রহণ করা, এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া। এ জাতীয় 'ইজাবত' নিশ্চিত বিষয় যার ব্যতিক্রম অসম্ভব। অতঃপর কবূলের দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা যা চায় হুবহু তাই দেয়ার কোন ওয়াদা দেয়া হয়নি। বরং ان شاء (যদি তিনি ইচ্ছা করেন।) বাক্য দ্বারা গণ্ডিভূত ও শর্তায়িত করা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা হলে পাওয়া যাবে অন্যথায় পাওয়া যাবে না। সুতরাং কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء

"তাঁকেই তোমরা বরং ডাক, তিনি ইচ্ছা করলেই কেবল তোমাদের আবেদন পূরণ করবেন।" কোন কোন আলিম اجيب دعوة الداع (প্রার্থনাকারীর আবেদন আমি পূরণ করি) আয়াতকেও ان شاء (তিনি যদি চান) দ্বারা শর্তযুক্ত করেছেন। আবার

কেউ কেউ একে লোপকৃত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমার মতে এটা শুদ্ধ নয়। কারণ অন্যত্র وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের পালনকর্তা বলেছেন—আমাকে তোমরা ডাক, আমি কবূল করব) আয়াতের পূর্বাপর অবস্থাদৃষ্টে প্রমাণ হয় যে, ডাকের প্রতি অবশ্যই সাড়া আসে। কেননা নির্দেশিত দোয়ার মঞ্জুরি অনিবার্য। এক্ষেত্রে ان شاء তথা 'যদির শর্ত বাস্তবতা বিরোধী। দ্বিতীয়ত, এখানেও

انى قريب (অবশ্যই আমি নিকটে) এর পর اجيب دعوة الداع (প্রার্থনাকারীর আবেদন আমি কবূল করে থাকি) আল্লাহ্ নিকটবর্তী হওয়ার তাকীদযুক্ত আয়াতের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কবূল হওয়া ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত নয়। নতুবা 'কুরব' তথা নৈকট্য ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া ইল্‌ম ও বিশেষ সম্পর্ক উভয় দিক থেকেই বাস্তব সত্য বিষয়। যেহেতু তিনি বলেছেনঃ

سبقت رحمتى على غضبى (আমার রহমত গযব অপেক্ষা ব্যাপকতর)। সুতরাং আমার মতে اجيب শব্দ প্রথম অর্থে নয় দ্বিতীয় অর্থে ان شاء কথাটির সাথে শর্তযুক্ত। অতএব দোয়া কবূল হওয়ার পরও তাতে অনীহা-অবহেলার কি কারণ। কারো মনে যদি এ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে, তাহলে দোয়া সম্পর্কে অন্তরকে এভাবে প্রবোধ দিতে পারে যে, পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা আশংকা থাকা সত্ত্বেও অনিশ্চিত লাভের আশায় জীবনে কত কাজই তো করে থাকি। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু দোয়ার মধ্যে ক্ষতির প্রশ্নই আসে না, তাহলে এর সাথে এহেন অবহেলিত আচরণ কেন? উপরন্তু দোয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এর দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দোয়া করা অবস্থায় প্রত্যেকেই গভীর চিন্তা দ্বারা তা অনুভব করে নিতে পারে। আর দোয়া সত্ত্বেও প্রার্থিত জিনিস হাসিল না হলে উপস্থিত ক্ষেত্রে অন্তত এটুকু হবে যে, মনের বল ও সান্ত্বনার ভাব প্রবল হয়ে উঠবে। আর এটা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্কের বরকত ও ফলশ্রুতি। দোয়া দ্বারা আল্লাহ-প্রেমিকদের এটাই একমাত্র কাম্য। মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

از دعا نبود مراد عاشقان

جز سخن گفتن باں شیریں دھاں

(দোয়ার মাধ্যমে সে শীরীযবান প্রেমাস্পদের সাথে কথা বলাই প্রেমিকজনের মূল উদ্দেশ্য)। এরি জন্য দোয়া কবূল কি কবূল নয় সেদিকে তার তিলমাত্র পরোয়াই থাকে না। কেননা মাহবুব আরযী শুনেছেন প্রেমিকের নযরে এটাই বড় কথা,

এতটুকুই যথেষ্ট। আর কবূলের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশ পাওয়াটা তার দৃষ্টিতে অতিরিক্ত দান ও নিয়ামত। অতএব আল্লাহ্র সাথে বিশেষ সম্পর্ক করা উচিত, যার সহজতর পন্থা হলো, দোয়া। এর মাধ্যম ব্যতীত সম্পর্ক গভীর না হয়ে বরং ভাসা ভাসা থেকে যায়। আর একটু গভীরে চিন্তা করলে আল্লাহ্ থেকে নিজেকে দূরত্বে মনে হয়। তাই বন্ধুগণ! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহান আল্লাহ্ আমাদের নিকটে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমরা তাঁর থেকে যোজন দূরে সরে যাচ্ছি। অথচ আগামী দিনে তাঁর সামনেই রয়েছে আমাদের নিশ্চিত উপস্থিতি। —আল-ইসাবাহ, পৃষ্ঠা ৭

**৪৮. আমল ব্যতীত কোন দীনি সুফল প্রকাশ পায় না।**

আমলের ক্ষেত্রে মানুষ দুই স্তরে বিভক্ত। প্রথমত, যারা শুধু বিশ্বাসগত পরিশুদ্ধিই যথেষ্ট মনে করে, আমলকে তেমন গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। এজন্য আমলের সংশোধন এবং এর পরিমাণ বাড়ানোর ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা "বিশ্বাস অপেক্ষা আমলের মান বেশি" একথা বললে আমাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক নেই, অস্বীকারও করি না, বাস্তবিকপক্ষে ঘটনা তাই। কিন্তু এর দ্বারা আমলের মূল্যহীনতা কি করে প্রমাণ হয় ? দ্বিতীয় পর্যায়ের বস্তু কি নিষ্প্রয়োজনীয় ? মূল অপেক্ষা শাখার মান যে কম তা আপনাদের জানা কথা কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রয়োজন নেই একথা কেউ বলতে পারবে না। কারণ গোড়া যতই শক্ত হোক কাণ্ডবিহীন অবস্থায় শাখা ফলবতী হয় না, এ কথা কে অস্বীকার করবে ? তদ্রূপ এখানেও বুঝুন—আমলবিহীন শুধু আকীদা ফলপ্রসূ নয়, অধিকন্তু এর দ্বারা খোদার অভীষ্ট কল্যাণও সাধিত হয় না। অবশ্য আমল ছাড়াও কোন কোন সময় ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু স্বয়ং সে অবস্থা বাঞ্ছিত নয়।

মোটকথা, যে সুফল আল্লাহ্র কাম্য সেটা আমল ব্যতীত হাসিল হয় না। কেননা কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে, আমল-আকীদা উভয়টির পরিশুদ্ধি ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য মূল আকীদার বিশুদ্ধির ভিত্তিতে কেউ কেউ হয় তো ফল পেতেও পারে কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র কথা। আল্লাহ্র ওয়াদা নেই হেতু তা নিশ্চিত নয়। প্রসঙ্গত তারা কেবল ঃ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (যারা জানে আর যারা জানেন না তারা কি সমান ? আয়াতাংশই মুখস্থ করে ধারণা করে নিয়েছে যে, ইল্ম দ্বারা আকীদার সংশোধনই যথেষ্ট। কিন্তু এটা দেখেনি যে, কুরআনের বহু জায়গায় "আমলকারী এবং আমলহীন সমান নয়" একথাও পরিষ্কার বর্ণিত রয়েছে। তাহলে কুরআনের আয়াত শুনুন।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -

—দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর হিসেবে তাদেরকে সেসব লোকদের সমান গণ্য করব যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ? তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ -

—ঈমানদার সৎকর্মশীল এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী আর মুত্তাকী ও পাপাচারী ব্যক্তিকে কি আমি একই পর্যায়ভুক্ত গণ্য করব ? আরো বলা হয়েছে ঃ

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

—মুমিন আর ফাসেক ব্যক্তি কি একই সমান ? এরা সমপর্যায়ের হতে পারে না। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, আমল ছাড়া দীনের বাঞ্ছিত সুফল লাভ করা আল্লাহ্র বিধান নয়। —আল-মুজাহাদাহ্, পৃষ্ঠা ৩

### ৪৯. মুজাহাদা ও সাধনা জরুরী মনে না করা ভুল

কেউ কেউ আমল করা জরুরী ঠিকই মনে করে কিন্তু তার সাথে অন্য কোন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। দৃশ্যত তাদের এ রায় ঠিকই মনে হয় যে, আমল-আকীদা উভয়টির গুরুত্ব তাদের নিকট স্বীকৃত কিন্তু এতেও এক ধরনের ত্রুটি থেকে যায়। তাহলো, বিশ্বাসগত পরিশুদ্ধির পর, আমলের সংশোধন, পরিপূর্ণতা এবং স্থিতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিছক ইচ্ছা-অনুভূতিই যথেষ্ট ধারণা করে নেয়া। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, আমলের সংশোধন সহজ করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত একটি বিষয়ও বিশেষ জরুরী, যদিও স্বাভাবিক নিয়ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ওপর সংশোধন নির্ভরশীল নয় যে, এর অভাবে কোনক্রমে তা সম্ভবই নয়। কিন্তু সহজ করতে হলে তার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এছাড়া আমল করা সম্ভব হলেও সহজ-সরলের বেলায় অবশ্যই তা ভিত্তি স্বরূপ। রেলগাড়ির দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। গাড়ি ছাড়াও দূরত্ব অতিক্রম করা চলে কিন্তু অতি কষ্টে। তদ্রূপ এক্ষেত্রে আকীদা পরিশুদ্ধির পর সে আনুষঙ্গিক বিষয় ছাড়াও আমল সম্ভব কিন্তু অনায়াসে নয়।

এ মুহূর্তে বিষয়টি ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। যার অর্থ না বোঝার দরুন আমলের বেলায় মানুষ মারাত্মক ভুল করে থাকে। মোটামুটি সে বিষয়টি হলো—নফসের মুজাহাদা এবং এর বিরোধিতা, যার অবর্তমানে আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে অনুপাতে আমল করা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। এমনকি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দরুন কোন কোন সময় আমল করা অসম্ভবও হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে এর সাহায্যে আমল সহজ হয়ে যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তাই আমি প্রমাণ করব। অবশ্য এর সপক্ষে এখন নয় অন্য কোন সুযোগে আয়াতের আশ্রয় নেয়ার আমার ইচ্ছা রইল। কেননা আয়াতের অর্থ বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে। যাহোক মুজাহাদা বড় মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। নামায ফরয এটা মুসলমান মাত্রেরই জানা বিষয়। পড়তেও সবার মনে চায়, না পড়াতে মনে বিষণ্নতা আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু লোক অলসতা করে নামায ছেড়ে দেয়। অথচ বিশ্বাসে একে সে ফরয বলেই জানে। একইভাবে স্বেচ্ছায় আবার কেউ কেউ পড়েও নেয়। কিন্তু অনেক সময় আবার কোন প্রতিবন্ধকতার দরুন সে ইচ্ছা অবদমিত হয়ে নিষ্ক্রিয়তায় রূপ নেয়। ফলে নামাযে স্থিতি আসে না। এ দ্বারা বোঝা যায়—আমলের স্থিতি ও কার্যকারিতার জন্য শুধু আকীদার পরিশুদ্ধি অথবা দুর্বল ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট নয় বরং দ্বিতীয় কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রয়োজন রয়েছে, যার ভিত্তিতে আমলের বাস্তবায়ন, স্থিতিশীলতা ও পরিপক্বতা হাসিল হয়। যার ওপর আমলের পরিপূর্ণতা নির্ভরশীল তা হলো ঃ নফসের মুজাহাদা ও বিরোধিতা। অতএব বে-নামাযী এ জন্যই বে-নামাযী যে, সে নফসের গোলামি করে এবং তাকে সযত্ন আরামে রাখে। বস্তুত নফসের মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করা হলে কারো পক্ষে বে-নামাযী থাকার প্রশ্ন আসত না। —আল-মুজাহাদাহ, পৃষ্ঠা ৪

### ৫০. আম্বিয়াগণের ওপর আপতিত কষ্ট-মুসিবত গুনাহ্র পরিণাম সন্দেহ করা নিতান্তই ভুল ধারণা।

হকপন্থীদের মাযহাব হলো—নবী (আ)-গণ মাসুম—নিষ্পাপ, গুনাহ থেকে পবিত্র। কিন্তু খাশাবিয়ারা (সম্প্রদায় বিশেষ) তাঁদের যথাযথ মূল্য দেয় না এবং তাঁদেরকে নিষ্পাপও স্বীকার করে না। আমি বলব খাশাবিদের ধারণা কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী তো বটেই, যুক্তিরও বিরোধী। কেননা দুনিয়ার শাসকগণ কর্তৃক কারো ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার পূর্বে তার চরিত্র যাচাই করার নীতি অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুয়তের দায়িত্ব কি তাহলে বাছাই ছাড়াই অর্পণ করা হয়? অথবা তাতে কি ত্রুটি থেকে যায় যে, এমন ব্যক্তিকে উক্ত পদে আসীন করা হবে যিনি

অপরকে তো বানাবেন আইনের অধীন আর নিজে করবেন বিরুদ্ধাচরণ ? একথা বিবেকসিদ্ধ হতে পারে না। অতএব সে সন্দেহের জবাব এই—আম্বিয়াগণের ওপর আপতিত ঘটনাবলী মূলত বিপদ ছিল না বরং এর রূপটাই ছিল কেবল মুসিবতের। এটা কোন রূপক অর্থ নয়, প্রমাণসিদ্ধ কথা। আমি একটি মাপকাঠি দিচ্ছি যার মাধ্যমে আপনাদের পক্ষে প্রকৃত বিপদ এবং আকৃতিগত মুসিবতের পার্থক্য ও পরিচয় লাভ করা অতি সহজ। তা এই যে, যদি বিপদের দরুন মনের অস্থিরতা বেড়ে যায় আর অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়, বুঝতে হবে এটা গুনাহ্র কারণে। পক্ষান্তরে যে বিপদের ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, আত্মসমর্পণ-স্পৃহা এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের আগ্রহে উন্নতি ঘটে তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেটা মুসিবত নয়, যদিও আকার-আকৃতিতে তা-ই। এখন প্রত্যেককেই নিজের মাথা নীচু করে নিজেই দেখে নিক বিপদকালে তার মনের অবস্থা কি হয়। অতএব এ মাপকাঠির ভিত্তিতে হযরত আম্বিয়া (আ) ও আউলিয়াগণের বিপদকে দুনিয়াদারের বিপদের সাথে তুলনা করা হলে দেখা যায়, এর ফলে নবী ও ওয়ালীগণের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা গভীর এবং আত্ম-নিবেদনে তাঁরা রয়েছেন উন্নতির চরমে। আর আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ তাঁদের ভাষায় ঃ

اے حریفان راہ ها رابسته یار

آهوئے نیگم واو شیر شکار

غیر تسلیم ور ضاء کو چاره

در کف شیر نرخو نخواره

—হে বন্ধু! যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, শিকারী সিংহের কবলে পতিত হরিণের ন্যায় আমরা এখন নিরুপায় তাই রক্ত পিপাসু সিংহের কবলে পড়ে আত্মসমর্পণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

তাঁরা আরো বলেন ঃ

ناخوش تو خوش بود بر جان من

دل فدائے یار دل رنجان من

—তোমার অসন্তুষ্টি আমার জন্য সন্তুষ্টির কারণ, আমার মনে যাতনাদায়ী বন্ধুর পাদমূলে আমার জীবন উৎসর্গিত।

এটা খাশাবীদের বোকামি যে, তারা নবীগণকে নিজেদের সাথে তুলনা করে ধারণা করেছে তাঁরাও আমাদের ন্যায় মানুষ, গুনাহ্ তাঁদের দ্বারাও সম্ভব, আমাদের ন্যায় তাঁরাও বিপদের শিকার। কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান্ বিদ্যমান, তাও তাদের চোখে ধরা দেয়নি। এ জিনিসটিই মানুষের বিনাশ সাধন করেছে। আর এ কারণেই বহু কাফেরের ভাগ্যে ঈমান জোটেনি। নবী (আ)-গণের বাহ্যিক অবস্থাকে তারা নিজেদের সাথে তুলনা করে নিয়েছিল। তাই মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

جمله عالم زیں سبب گمراه شد
کم کسے زابدال حق آگاه شد
گفته اینك ما بشر ایشاں بشر
ما وایشاں بسته خوابیم وخور
ایں ندانستند ایشاں از عمی
درمیاں فرق بود بے منتها
کار پا کاں را قیاس از خود مگیر
گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

—গোটা জগত এ-কারণে গোমরাহ্-পথহারা যে, ওয়ালী আল্লাহ্গণের খবর খুব কম লোকেরই জানা। তারা ভাবে—আমাদের ন্যায় তাঁরাও যেহেতু আহার-নিদ্রার মুখাপেক্ষী, কাজেই তারাও আমাদের মতই মানুষ। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন এ দুয়ের মধ্যকার সীমাহীন ব্যবধান এরা জানতে পারেনি। তাই পুণ্যাত্মাগণের কার্যকলাপ নিজের সাথে তুলনা করো না, যদিও লেখনীতে شیر و شیر (শের ও শীর অর্থাৎ দুধ ও সিংহ) শব্দদ্বয়ের আকৃতি একইরকম।
অপর একজন আরেকটু অতিরিক্ত সংযোজন করে বলেছেন ঃ

شیر آں باشد که آدم می حورد
شیر آں باشد که آدم را خورد

—দুধ তো মানুষ পান করে আর শের তথা সিংহ মানুষ ভক্ষণ করে।

প্রিয় ভাইয়েরা! কোলে নেয়া দু-ধরনের। একে তো চোরকে ধরে মানুষ বগলদাবা করে। এ ক্ষেত্রে দাবানেওয়ালা সুন্দরী নারী হওয়া সত্ত্বেও সে খুশি হয় না। যেহেতু

প্রেমিক সে নয়। তাই সে চাইবে, এ থেকে পালিয়ে যেতে এবং এ চাপ তার মনঃপূত নয়। দ্বিতীয় প্রকার কোলে নেয়া হলো—প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে বগলদাবা করে, সজোরে চাপ দেয়। আপনারা এবার তাকে জিজ্ঞেস করুন সে কি বলে। এ কষ্টের কারণে কি সে প্রেমিকের বাহুবেষ্টন থেকে মুক্তি কামনা করবে? মোটেই না, বরং ছন্দায়িত কণ্ঠে সে বলে উঠবে ঃ

نه شود نصیب دشمن که شود هلاك تیغت

سر دوستاں سلامت که تو خنجر آز مائی

—তোমার তরবারির আঘাতে প্রাণপাত করা শত্রুর ভাগ্যে যেন না জুটে, তোমার তলোয়ারের তীক্ষ্ণ আঘাত পরীক্ষার জন্য বন্ধুদের শির হাজির রয়েছে।

একইভাবে আল্লাহ্ পাকও দু'ধরনের মানুষকে চাপ দেন। এক তো দুর্বৃত্ত চোরকে, দ্বিতীয় স্বীয় প্রেমিককে । চোর তো আল্লাহ্র বেষ্টনীতে অস্থির, ঘাবড়ে যায়। আর তার প্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

خوشا وقت شوريد كان غمش

اگر تلخ بینند دگر مر همش

گدایان از بادشاهی نفور

بامیدش اندر گدائی صبور

دما دم شراب الم در کشند

اگر تلخ بینند دم در کشند

—তার চিন্তায় বেদনাকাতর মুহূর্ত কতই না আনন্দের, একদিকে যদিও বিষাদের ছায়া, কিন্তু পরক্ষণে প্রলেপের আনন্দও রয়েছে। শাহী দরবার থেকে বিতাড়িত ভিক্ষুক অন্য সময় পাওয়ার আশায় ধৈর্য ধারণ করে। সর্বদা তারা দুঃখের মদিরা পান করে যায়, কষ্ট হলেও তারা ধৈর্যের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

এখন তো অবশ্যই আমাদের বুঝে আসার কথা যে, একটা হলো সঠিক অর্থে বিপদ, অপরটি কেবল আকার আকৃতিতে। প্রথমটি গুনাহ্র ফলশ্রুতি, দ্বিতীয়টি মান-মর্যাদা বৃদ্ধি এবং প্রেমের পরীক্ষার নিদর্শনস্বরূপ পতিত হয়।

—আকবারুল আ'মাল, পৃষ্ঠা ১৪

## ৫১. "দান করা বস্তু হুবহু মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে" মূর্খদের এ ভ্রান্ত আকীদার জবাব।

কোন কোন লোক প্রতি মৌসুমে নিজের বিগত আত্মীয়-স্বজনের নামে মৌসুমী জিনিস দান করে থাকে, বিশেষত যেসব বস্তু ছিল মৃতজনদের অধিক প্রিয়। শিক্ষিত সমাজ পর্যন্ত এতে লিপ্ত। এরা তো বরং এতটুকু অগ্রসর যে, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (নিজেদের প্রিয়বস্তু দান না করা পর্যন্ত তোমরা কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে না) আয়াতের ভিত্তিতে প্রমাণ খোঁজে যে, প্রিয় বস্তু ব্যয় করাই শরীয়তের কাম্য, তাহলে মৃত ব্যক্তির প্রিয় জিনিস খয়রাত করাতে ক্ষতি কি ? আমি বলি—আল্লাহ্ পাক مما تحبون (তোমাদের প্রিয় বস্তু) বলেছেন, مما يحبون (তাদের প্রিয় বস্তু) বলেন নাই। সুতরাং দানকৃত বস্তু দাতার প্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়, মৃতের নয়। কথাটার মর্মার্থ হলো—ইখলাস বা আন্তরিকতা ফযিলতের ভিত্তি। আর নিজের প্রিয় বস্তু দান করাতেই অধিক মাত্রায় ইখলাস বিদ্যমান, পরের প্রিয় জিনিস খয়রাতের মধ্যে নয়। এটা ছিল তাদের দলীলের জবাব। এখন আমি সে প্রমাণ উপস্থিত করব যদ্দারা বোঝা যাবে আমাদের দানকৃত জিনিসটি হুবহু মুর্দারের নিকট পৌঁছে না, পৌঁছে বরং এর সওয়াব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم

এ আয়াতের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ কুরবানীর গোশত্-রক্ত আল্লাহ্র নিকট আদৌ পৌঁছে না, পৌঁছে বরং তোমাদের ইখলাস—আন্তরিকতা বা তাকওয়া। তোমরা কেবল আন্তরিকতারই সওয়াব লাভ করবে আর সে সওয়াবই মুর্দারগণকে পৌঁছে দেয়া হয় যদি তাদের নামে কুরবানী অথবা অন্য কোন দান-খয়রাত করা হয়। আপনাদের হয়তো জানা আছে—মুহাররামের শরবতের আকিদাগত বুনিয়াদ এটাই যে, কারবালার শহীদগণ পিপাসার্ত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। কাজেই তাঁদের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য শরবত পাঠানো চাই। কিন্তু প্রথমেই বোঝা উচিত যে, এ শরবত কখনো তাদের নিকট পৌঁছে না। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত, এটা যুক্তিতেও টিকে না। আপনারা কি মনে করেন এখনো তাঁরা পিপাসায় ছটফট করছেন? বেহেশতী শরবত এখনো তাঁদের দেয়া হয়নি ? আপনাদের গড়া এ ধারণা ধন্য হোক। আমরা তো বিশ্বাস করি—আল্লাহ্র রহমতে শহীদ হওয়ার সাথে সাথে বেহেশতের পূতঃপবিত্র শরবতের পেয়ালা তাঁদের দেয়া হয়েছে যা একবার পান করার পর চিরতরে পিপাসা দূর হবে, দ্বিতীয়বার পান করার দরকারই পড়বে না। তাদের সে

ভ্রান্ত আকীদার কুফল সময়ে এমনও দেখা যায় যে, কোন বছর শীতকালে মুহাররাম পড়ে, তখনো এক নাগাড়ে শরবতের বিলি-বণ্টন ও তা পান করার ধুম চলতে থাকে। ফলে অনেকে নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় প্রথার গোলামি থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন। চিন্তা করলে দেখা যায় রেওয়াজের অনু-করণ সর্বদা অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুনই হয়ে থাকে। —দারুল-মাসউদ, পৃষ্ঠা ৮

বলা বাহুল্য, যাই কিছু দান করা হোক মৃতের নিকট অবিকল তাই পৌঁছে যায় এ ধারণার ভিত্তিতেই এসব প্রথা পালন করা হয়। অথচ ধারণাটাই ভুল। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, মৃতের প্রিয়বস্তু দান করার মূল দর্শন হলো, অন্তরের পরিতাপ আর মনের আক্ষেপ। আহা, অমুক বেঁচে থাকলে সেও আমাদের সাথে খেত, সে যখন নেই তো দান-খয়রাত করে দেই, যেন তার কাছে পৌঁছে যায়। এর কারণ হলো জান্নাতের নিয়ামতসমূহ আমাদের সামনে উপস্থিত নেই। যদি আমাদের অনুভূতি থাকত যে, বেহেশতের অফুরন্ত নিয়ামত এবং আনন্দে তাঁরা ডুবে আছেন, তাহলে আমাদের মনে মোটেই আফসোস থাকার কথা নয়। কেননা স্বাদে-গন্ধে জান্নাতী নিয়ামতের সাথে পার্থিব নিয়ামতের কোন তুলনাই করা যায় না। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ জান্নাতের নিয়ামতরাজির মধ্যে আনার, খেজুর ইত্যাদিকে দুনিয়ার আনার-খেজুরের সাথে যেন তুলনা করা না হয়। কেননা বেহেশতের এবং দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য কেবল নামের মধ্যে, নতুবা প্রকৃতিগতভাবে এ দুটি ভিন্নতর জিনিস। একটি ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে বিষয়টা আরো পরিষ্কার করা যায়। মাহমুদাবাদের রাজা একবার ভাইসরয়কে দাওয়াত করেন। এ উপলক্ষে রাজা দু'শ টাকা ব্যয়ে একটি আনার তৈয়ার করান। নামে আর আকারেই কেবল তা ছিল আনার সদৃশ, কিন্তু আসলে ছিল ভিন্ন জিনিস। এ প্রসংগে স্বয়ং কুরআনে বলা হয়েছে ঃ قوارير من فضة قدروها تقديرا অর্থাৎ জান্নাতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ চাঁদির আয়না সাজানো থাকবে, অর্থাৎ তা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ-পরিষ্কার দৃষ্ট হবে। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জান্নাত এবং দুনিয়ার জিনিসপত্রে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য কেবল নামের ক্ষেত্রে। নতুবা সেখানকার রূপা স্ফটিকসম দৃষ্টি ভেদ করে যায়, পার্থিব রূপায় এ গুণ কোথায় ? তাই এখন দুনিয়ায় বসে তোমাদের কামনা—আহা! মৃতেরা যদি দুনিয়ায় থাকত....আর তারা আক্ষেপ করছে আহা... তোমরা যদি সেখানে থাকতে...। আল্লাহ জানে এখানে এমন কি আছে যার জন্য মানুষ পাগল। কবির ভাষায় ঃ

زرو نقره چیست تا مفتوں شوی

چیست صورت تا چنیں مجنوں شوی

অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ এমন কি মূল্যবান বস্তু যে, এর ধোঁকায় পতিত হবে, ছায়া-ছবিরই বা মূল্য কি যে, এর জন্য পাগল হবে? সেখানকার নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জানতে হলে হাদীস থেকে জেনে নাও। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ জান্নাতী হুরদের মাথায় এমন সুন্দর ওড়না শোভা পাবে যার একটি দুনিয়ায় লটকিয়ে দেয়া হলে চাঁদ-সুরুজের আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়তো। সেখানকার হুরদের এমনি রূপের বাহার যে, সত্তর প্রস্থ কাপড়ের ভিতর থেকে তাদের রূপের ছটা বাইরে ঠিকরে পড়বে। বেহেশতের মাটি হবে চুণি-পান্না এবং মেশক-আম্বরের উপাদান মিশ্রিত। হাউজে কাওসারের পানির গুণ হবে ঃ من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا "যে ব্যক্তি এ থেকে একবার মাত্র পানি পান করবে চিরদিন সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।" উপরন্তু মজার ব্যাপার এই যে, তৃষ্ণা ছাড়াই এর প্রতি তার আগ্রহ হবে এবং পূর্ণ স্বাদও পাবে। অথচ দুনিয়ার পানি কেবল তৃষ্ণাকালেই স্বাদের, এ ছাড়া বিস্বাদ। তাই বলুন—দুনিয়ায় এ জাতীয় পানির অস্তিত্ব কোথায়? এর সাথে পার্থিব সমস্ত নিয়ামতের তুলনা করুন তাহলে বোঝা যাবে যে, এ দুয়ের মধ্যে কেবলমাত্র নামের সম্পর্ক, অর্থগত সামঞ্জস্য খোঁজা এক্ষেত্রে অবান্তর। কাজেই "আমার অমুক আত্মীয় বেঁচে থাকলে এখানকার নিয়ামত ভোগ করত" আক্ষেপ করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। বরং তাদের সামনে এসব বস্তু সামগ্রী উপস্থিত করলে সম্ভবত তাদের বমিই আসতে চাইবে। —ঐ পৃষ্ঠা-১০

৫২. "মাশায়েখগণ সময় সময় অযোগ্য ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেন" এ সন্দেহের জবাব।

এ কথার জবাব এই যে, সম্ভবত অনুমতি দেয়ার সময় তিনি ছিলেন যোগ্যই, কিন্তু পরে গিয়ে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এ রকম হওয়াটা অসম্ভবও নয়। আকায়িদের কিতাবে আহলে সুন্নাতের আকীদা বর্ণিত হয়েছে ঃ السعيد قد يشقى। অর্থাৎ সৎলোক কখনো কখনো দুর্ভাগা হয়ে থাকে।

—আল-আবদুর রব্বানী, পৃষ্ঠা ২৫

কাজেই এতে আপত্তির তেমন কিছু নেই। অধিকন্তু এটা الواصل لا يرد (তথা-সিদ্ধ পুরুষ বর্জনকারী হন না) প্রবাদ বিরোধী নয়। কেননা 'সিদ্ধ' এক্ষেত্রে 'বাস্তব' ও

'প্রকৃত' অর্থবোধক, শায়খের ধারণা অনুযায়ী নয়। সুতরাং الواصل لا يرد। নীতিবাক্য সম্পূর্ণ সঠিক ও বাস্তবসম্মত কথা। হাদীসেও এর সমর্থন রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে ঃ وكذالك الايمان اذا خالط بشاشة القلوب। —ঈমানের স্বাদ অন্তরে এমনিতর বদ্ধমূল হওয়ার পর তা থেকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সাহাবীগণ তার এ মন্তব্য বর্ণনা করেছেন, কেউ তাতে আপত্তি তোলেননি। সুতরাং সাহাবীগণের স্বীকৃতি বলে এটা প্রমাণিত হয়ে যায়। এ প্রশ্নের অপর এক সূক্ষ্ম জবাবও রয়েছে যা ব্যক্ত করাই এখানে উদ্দেশ্য। কোন কোন সময় মাশায়েখগণ কোন অযোগ্য চরিত্রে লজ্জাশীলতার আধিক্য লক্ষ করে এ আশায় তাকে খলীফা নিযুক্ত করেন যে, অপরকে সংশোধন করার বেলায় লজ্জার খাতিরে ভবিষ্যতে নিজেও সে সংশোধিত হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে কামেল তথা সিদ্ধ পুরুষে পরিণত হবে। অতপর কোন কোন অযোগ্য শায়খের সে আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেয়। অবশ্য এটা বিরল ঘটনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবের সাক্ষী এটাই যে, যে ব্যক্তি-সত্তায় লজ্জার মাত্রা অধিক পরের সংশোধন করার কালে নিজের সংশোধনে সে অবশ্যই মনোযোগ দেয়। —ঐ, পৃষ্ঠা ২৬

## ৫৩. "আখিরাতের মুক্তি আমাদের আয়ত্তের বাইরে"—এ বিশ্বাসের অসারতা।

বস্তুত এ আকীদা কুরআন-হাদীস বিরোধী এবং নিতান্ত ভুল। এ বিরোধিতার দরুন যদিও কুফরীর ফতোয়া লাগানো হয় না, কিন্তু চরম মূর্খতা অবশ্যই বলা হবে। কুরআনের বহু আয়াত দ্বারা পরকালীন মুক্তি বান্দার আয়ত্তাধীন হওয়ার বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায়। সুতরাং আল্লাহ্র বাণী ঃ سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ। —(তোমাদের রবের ক্ষমা এবং আসমান-যমীনসম বিস্তৃত জান্নাতের প্রতি তোমরা ধাবিত হও।) এর মর্ম অনুযায়ী জান্নাতের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক প্রধাবনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করা যদি আমাদের আওতাধীন না-ই হয়, তা হলে سابقوا। (ধাবিত হও) নির্দেশ বাক্যের কি অর্থ ? অতএব বোঝা গেল, এটা আমাদের আওতাধীন। কেননা আল্লাহ্ পাক বান্দাকে তার আওতাধীন বিষয়েরই নির্দেশ দিয়ে থাকেন, এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের নহে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ لا يكلف الله نفسا الا وسعها (আল্লাহ্ কারো ক্ষমতার উর্ধ্বে বোঝা চাপিয়ে দেন না)। কারো প্রশ্ন জাগতে পারে "জান্নাত ও জাহান্নাম আমাদের দৃষ্টিসীমার ভিতরে তো নয় যে, আমরা দৌড়ে গিয়ে ভিতরে ঢুকব কিংবা বের হয়ে আসব অথবা দূরে সরে পড়ব।

এমতাবস্থায় জান্নাতের দিকে ধাবিত কিংবা জাহান্নাম থেকে বাঁচার কি উপায় ? বেশ, তাহলে শুনুন, কোন কাজ-কর্ম অধিকারভুক্ত হওয়ার দুটি দিক রয়েছে। এক ঃ মাধ্যমহীন সরাসরি এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। যেমন আহার করা, পানি পান করা এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। দুই ঃ মাধ্যমযুক্ত এখতিয়ারী বিষয়। যেমন যানবাহনে চড়ে দিল্লী, কলকাতা কিংবা বোম্বাই উপনীত হওয়া এ অর্থেই এখতিয়ারী বিষয়। কারণ এখান থেকে লাফিয়ে বোম্বাই পৌঁছা কার পক্ষে সম্ভব ? কিন্তু তা সত্ত্বেও একে এখতিয়ারীই বলা হয়। যার অর্থ—দূরত্ব অতিক্রমের জন্য মাধ্যম অবলম্বন করা। গভীর দৃষ্টির আলোকে বোঝা যায় অধিকাংশ এখতিয়ারী কার্যকলাপ এ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যেমন বিয়ে করে সন্তানের জন্মদান, কৃষি দ্বারা ফসল উৎপন্ন করা এবং ব্যবসার মাধ্যমে অর্থোপার্জন করা। এসব বান্দার ইচ্ছাধীন। তাই বলে কি প্রয়োজনীয় মাধ্যমের আশ্রয় ছাড়াই যখন ইচ্ছা তখনি লাভ করা সম্ভব ? আদৌ না। বরং এসব বান্দার ইচ্ছাধীন হওয়ার অর্থ—এর উপায়-মাধ্যমের আশ্রয় নেয়া না নেয়া তার ইচ্ছার অধীন। উদ্দেশ্য—উপায় ধর, সম্ভবত অভীষ্ট বস্তুটি তোমার আয়ত্তে এসে যাবে। অতএব জান্নাত লাভ করা ইচ্ছাধীন এ অর্থে যে, এর মাধ্যম আপনার ইচ্ছার অধীন। কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করুন, দেখতে পাবেন আল্লাহ্ পাক জাহান্নাম থেকে বাঁচা এবং জান্নাতে প্রবেশের উপায় এবং তদবীর নির্দেশ করেছেন। সে সবের সঠিক অনুসরণ-অনুকরণ করতে থাকুন আল্লাহ্ আপনাকে জান্নাতে স্থান দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

واتقوا النار التى اعدت للكافرين

—তোমরা সে আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুফরী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপলক্ষ। পক্ষান্তরে سَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ আয়াতের পর বলা হয়েছে اعدت للمتقين (যা) প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। এর দ্বারা প্রমাণ হয়—তাকওয়া জান্নাত লাভের মাধ্যম। অতঃপর কুরআনের স্থানে স্থানে তাকওয়ার পরিচয় ও ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এরপরই বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ—

—মুত্তাকীর পরিচয় হলো—সচ্ছল এবং অনটন সর্বাবস্থায় যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, রাগ-রোষ হজম করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

এতে সৎপথে ব্যয় করা, রাগ দমন করা, ক্ষমা ও ইহসান তথা সৎকর্মের বর্ণনা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاسِ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

—তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব-পশ্চিমমুখী করা সৎকর্ম নয়, বরং সৎকর্ম হলো—আল্লাহ্, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি কারো বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে নিকটাত্মীয়, পিতৃহীন ইয়াতীম, গরীব-মিসকীন, অভাবী মুসাফির, ভিক্ষুক এবং গোলাম আযাদের ব্যাপারে সম্পদ ব্যয় করার মধ্যে। আর যারা নামায কায়েম করে, রোযা পালন করে, তাদের কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূরণের চেষ্টা করে, অভাব-অনটন এবং বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করে, তারাই মূলত সত্যবাদী এবং তারাই প্রকৃত খোদাভীরু ও মুত্তাকী।

তাকওয়ার যাবতীয় বিভাগ সংক্ষিপ্তাকারে অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে অর্থহীন আকার-আকৃতি যথেষ্ট মনে করাকে নিষেধ করা হয়েছে। لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ ..... الى اخره আয়াতাংশ এ কথারই প্রমাণ। মুনাফিক ও ইহুদীরা কেবলা পরিবর্তন বিষয়ে যেমন চর্চায় মেতে উঠেছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতে বিশ্বাস, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থসমূহ এবং নবীদের প্রতি বিশ্বাসের নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ছিল বিশ্বাস-ই'তিকাদ সম্পর্কিত নির্দেশমূলক আলোচনা। অতঃপর আত্মশুদ্ধি, মনের কপটতা দূর করা কিংবা আল্লাহ্‌র মহব্বতে উৎসাহব্যঞ্জক অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এরপর ব্যক্ত হয়েছে নামায কায়েমের হুকুম যা দীনের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। পরে অর্থনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য প্রথমাংশেও অর্থ ব্যয়ের উল্লেখ রয়েছে

কিন্তু সেটা ঐচ্ছিক ভিত্তিতে। যাকাতের মধ্যে মাল খরচ করার উল্লেখ হয়েছে বাধ্যতামূলক হিসাবে। নফল হিসাবে মাল খরচের উল্লেখ হাদীসেও লক্ষ করা যায়। যেমন তিরমিযীর হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে ঃ. ان فى المال لحق سوى الزكوة ثم تلا الاية অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে হক রয়েছে। অধিকন্তু আয়াতে বর্ণিত على حبه (তাঁর মহব্বতে) বাক্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মারজা (প্রত্যাবর্তনস্থল) যদি মাল হয়, তবে অর্থের মোহ দূর করার জন্য শুধু যাকাত যথেষ্ট নয়, অতিরিক্ত কিছু দানের প্রয়োজন স্বীকৃত। আর এর মারজা' যদি হয় 'আল্লাহ্', তবে আল্লাহ্র মহব্বতের দাবি এটাই যে, ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ ফরযের অতিরিক্ত কিছু মাল খরচ করা হোক। অতঃপর সামাজিক আচরণ হিসেবে অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ এবং শেষ পর্যায়ে সুলূক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে সবর ও ধৈর্যের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। মোট কথা—সংক্ষিপ্ত আকারে তাকওয়ার সকল দিক এতে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই اولئك هم المتقون বাক্য দ্বারা আয়াত সমাপ্ত করা হয়েছে। অতএব এখন বলুন, কুরআনের ভাষায় আল্লাহ্ উপায় নির্দেশ করেছেন কি-না এবং তা মানুষের ইচ্ছাধীন কি-না ? তাহলে বিবেচনা করুন, জান্নাতে প্রবেশ করা ইচ্ছাধীন হলো কি-না ? এখন প্রশ্ন থাকে—আল্লাহ্ উপায় নির্দেশ করেছেন ঠিকই কিন্তু তা গ্রহণ ও যথাযথ প্রয়োগ তো তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তাছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। উত্তরে বলব—কথা ঠিকই, আমাদের বিশ্বাসও তাই। কিন্তু একথা বেহেশত-দোযখের বেলায়ই বা খাস হবে কেন, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মই তো তাঁর ইচ্ছাশক্তির অধীন। চাষাবাদ, দোকান-চাকরি সবই তো এ নীতির আওতাধীন। তাহলে সেসবের জন্য এত চেষ্টা তদবীর কেন ? এ ক্ষেত্রে তো বরং বলা হয় ঃ

رزق هر چند بیگماں برسد

لیك شرط است جستن از درها

—যে কোন অবস্থায় নিঃসন্দেহে রিয্ক পৌঁছবেই কিন্তু শর্ত হলো–সঠিক উপায়ে তার সন্ধান করতে হবে।

উপরন্তু মরণও আল্লাহ্র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাপ-বিচ্ছুর দংশন থেকে আত্মরক্ষার কি অর্থ ? এ সম্পর্কে বরং বলতে শোনা যায় ঃ

اگرچه کس بے اجل نه خواهد مرد

تو مرو در دهاں اژدها

—নির্ধারিত সময় ছাড়া কারো মৃত্যু হবে না এটা চিরন্তন সত্য কিন্তু তবু তুমি অজগরের মুখে পড়ে আত্মাহুতি দিও না।

সমস্ত আস্থা-ভরসা কেবল আখিরাতের বিষয়ে জড়ো করা হয় এটা কেমন কথা। তাওয়াক্কুলের বড় বড় বুলি আওড়াতে হলে দুনিয়ার ব্যাপারেও করা উচিত ছিল। তাওয়াক্কুল করা আমার নিষেধ নয়, আমি কেবল আপনাদের ভুলটুকু ধরিয়ে দিচ্ছি যে, আপনারা যাকে তাওয়াক্কুল সাব্যস্ত করে নিয়েছেন আসলে সেটা তাওয়াক্কুল নয়। যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন বর্জন করাকে তাওয়াক্কুল বলা যায় না। এক্ষেত্রে বরং তাকদীর ও তাদবীরের (ভাগ্য ও উপায় অবলম্বন) একত্র সমাবেশ ঘটানোই সঠিক পন্থা। অন্য কথায় কাজটা সমাধা করার পরই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা উচিত। কবি বলেছেন ঃ

گر توکل می کنی در کار کن

کسب کن پس تکیه بر جبار کن

—"যদি তোমার তাওয়াক্কুলের আগ্রহ থাকে, তবে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথম—কাজ কর, অতঃপর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।" পার্থিব ব্যাপারেও আমরা বলে থাকি "বীজ বুনে ফলের আশায় আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখ।" সার কথা হলো—কাজের ক্ষেত্রে উপায় অবলম্বন কর আর ফলের জন্য তাওয়াক্কুল কর। তাই লক্ষ করা যায়—পার্থিব ব্যাপারে সবাই অভিন্ন নীতির পক্ষপাতী, কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারে বিভক্ত বড় বিস্ময়কর যে, পরকালীন ব্যাপারে তারা কর্ম ও ফল উভয় ক্ষেত্রে কেবল ভরসা নীতিতে বিশ্বাসী। অথচ এক্ষেত্রেও পার্থিব ব্যাপারের ন্যায় একই পন্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। নতুবা উভয়টির পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। বস্তুত গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্যের দাবি বরং এই যে, উপায়-উপকরণ বর্জনের অবকাশ প্রথমটির ব্যাপারে কল্পনা করা যেতে পারে বটে কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপারে মোটেই না। কেননা উপায় ত্যাগ করাই হলো তাওয়াক্কুলের মূল কথা। প্রণিধানযোগ্য যে, যে উপায়ের বাস্তব ফলশ্রুতি সাধারণত নিশ্চিত নয় আর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিবও নয় এমন সব উপায় বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব উপায়ের ফলের বাস্তবায়ন নিশ্চিত সে উপায় বর্জন করা জায়েয নয়। অধিকন্তু ক্ষুধার দাবি না মিটিয়ে নীরব বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। এমতাবস্থায় মারা গেলে সে গুনাহগার হবে। অবশ্য যে উপায়ের বাস্তব ফল নিশ্চিত নয় এমন উপায় বর্জন করা সে ব্যক্তির জন্য জায়েয যে নিজে দৃঢ় মনোবলের এবং তার পরিবার-পরিজনও শক্ত মনের অধিকারী অথবা যদি তার পরিবারই না থাকে। কিন্তু

পরিবার কিংবা নিজে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এ-ও জায়েয নয়। তদ্রূপ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশিত বিষয় বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়। তাওয়াক্কুল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর চিন্তা করুন, শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত আখিরাতের উপায়সমূহের ধরন কিরূপ ? সেগুলো মামূরবিহী (নির্দেশিত) কি-না ? অবশ্যই এসব শরীয়তের নির্দেশিত বিষয়। তদুপরি এটাও লক্ষ করতে হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বাস্তব ফল নিশ্চিত—না-কি সন্দেহযুক্ত। কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, আখিরাতের উপায়ের বাস্তব প্রতিফলন অনিবার্য। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ٠

—যে সব ঈমানদার সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ٠

—প্রত্যেকের বিন্দুমাত্র সৎকাজ তিনি লক্ষ্য রাখছেন, অনুরূপ ব্যক্তির বিন্দুসম অসৎকাজও তাঁর দৃষ্টির আয়ত্তাধীন।

এ ধরনের বহু আয়াতে আখিরাত বিষয়ক আমলের নিশ্চিত প্রতিদানের ওয়াদা ব্যক্ত রয়েছে। অথচ দুনিয়াবী আমল সম্পর্কে এ জাতীয় ওয়াদা-অঙ্গীকার নির্দিষ্ট নেই, অধিকাংশ উপায়ের বাস্তব ফল প্রকাশ জরুরী নয়। যদিও প্রত্যেক বস্তুর একটা না একটা উপায় আছেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ ما جعل الله داء الا جعل له دواء—অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন কোন ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক বা ঔষধ দেননি। এজন্যই চেষ্টার মাধ্যমে উপায়ের আশ্রয় নেয়া শরীয়তের বিধান। কিন্তু "তা ফলবতী হবেই" আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কোন ওয়াদা নেই। কাজেই উপায় সময়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে যে, বীজ বোনা সত্ত্বেও ফসল হয় না, ঔষধ প্রয়োগ করা হলেও নিরাময় হতে দেখা যায় না। আর ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য নয়। অথবা কোন শর্তও নেই যে, ঔষধ ব্যতীত রোগ আরোগ্য সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আখিরাতের আমলের সাথে শর্ত ও কারণ উভয়টি জড়িত। যদিও এ দুটি যুক্তিভিত্তিক বিষয় নয় বরং শরীয়ত নির্ধারিত। ফল প্রকাশে অনিবার্যতার ক্ষেত্রে আখিরাতের আমলের অবস্থা নিশ্চিত সুফলবিশিষ্ট পার্থিব উপায়ের ন্যায়, যার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য। যথা—আহারের ফল তৃপ্তি এবং পানের সুফল নিবৃত্তি বাস্তবে প্রকাশ পাবেই। বরং আল্লাহ্র ওয়াদা করা বা না করার ব্যবধান সাপেক্ষে পরকালীন আমলের কারণ এসব

পার্থিব ফল অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ। সুতরাং ইহজীবনে এসব উপায়-উপকরণ বর্জন করা যেরূপ জায়েয, আখিরাতের যাবতীয় হুকুম সম্পর্কেও তদ্রূপ একই বিধান যে, এসবের একটিও ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। কেননা এসব উপায় অবলম্বনের সফলতা সম্পর্কে শরীয়তে নিশ্চিত ওয়াদা করা হয়েছে। অতএব আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—যেসব জিনিসের প্রতিদানের কোন ওয়াদা নেই সে সবের জন্য ন্যূনতম তদবীরের আশ্রয় নিতেও ত্রুটি করা হয় না। অথচ প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং বিন্দুমাত্র খেলাফের অবকাশ নেই সেখানে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকা হয়। ইহ ও পরজগতের পারস্পরিক ব্যবধানের দৃষ্টিতে এর প্রতিক্রিয়ায় দুনিয়ার কোন কোন উপায় থেকে তাওয়াক্কুল করা বৈধ আর আখিরাতের যে কোন উপায়ে তাওয়াক্কুল অবৈধ ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল। এটা হলো উপায় বা মাধ্যম সম্পর্কিত আলোচনা। কিন্তু 'মুসাববাব' তথা ফলাফল সম্পর্কে বিধান হলো—তা পার্থিব হোক বা পারলৌকিক, সর্বক্ষেত্রে ভরসা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর। অর্থাৎ ফলাফলকে উপায়ের ক্রিয়া ধারণা করার পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ্‌র দান মনে করতে হবে। উত্তমরূপে বিষয়টা বুঝে নিন। —দাওয়াউল গাফ্‌ফার, পৃষ্ঠা ১০

৫৪. চাঁদ দেখা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে শবেবরাত কোন্ তারিখে হবে এবং কোন্ তারিখের রোযা উত্তম হবে ?

যত ইচ্ছা তোমরা চর্চা করতে পার যে, পনর তারিখের সওয়াব নির্দিষ্ট একটি দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু মহান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট কোন স্থান বা কালে বিশেষ ফযীলত সৃষ্টি করে এরূপ গণ্ডিভুক্ত হয়ে পড়েন না যে, অন্য কোন স্থান বা কালে এর পুনরাবৃত্তিতে তিনি অপারক। বরং প্রতি দিন, প্রতি রাত তিনি এ জাতীয় ফযীলত সৃষ্টি করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। এখন প্রশ্ন আসতে পারে—কোন কিছুর সম্ভাবনা থাকলেই তার বাস্তবায়ন অনিবার্য নয়। এর জবাব হলো—অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্‌র বিধান হলো—নির্দিষ্ট তারিখে যে ফযীলত তোমাদের জন্য নির্ধারিত, সে একই ফযীলত অন্যদের জন্য ভিন্ন তারিখেও সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব, নিজেদের সন্ধানের ভিত্তিতে যে দিনটিকে তারা পনর তারিখ হিসেবে সাব্যস্ত করে নেয়। এক রাত থেকে অপর রাতে বরকত স্থানান্তরিত করাটা তাঁর পক্ষে এমন কি কঠিন কাজ। বস্তুত তাঁর ক্ষমতার অবস্থা হলো ঃ اولئك يبدل الله سيأتهم حسنات। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের পাপাচার পুণ্যে, তাদের অপরাধ আনুগত্যে রূপান্তরিত করে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ হাশর প্রান্তরে আল্লাহ্ জনৈক বান্দার প্রতি প্রথমে ছোট ছোট গুনাহ্‌র উল্লেখ করে প্রশ্ন করবেন ঃ তুমি কি অমুক কাজটি করনি, এরূপ কাজ কি তুমি করনি ? সে

স্বীকার করবে এবং মনে মনে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলতে থাকবে—এগুলো তো ছোট অপরাধ বড়গুলো তো এখনো ধরাই হয়নি, সে সবের পাকড়াও না জানি কত সাংঘাতিক ধরনের হবে। কিন্তু আল্লাহ্ কবীরা গুনাহ উল্লেখের পূর্বেই ক্ষমা ঘোষণা করে বলবেন—যাও, তোমার প্রতিটি গুনাহ্র বিনিময়ে একটি করে 'নেকী' দান করলাম। এখন সে লোক নিজের অপরাধসমূহ উল্লেখ করে আরয করবে—আল্লাহ্, আমি তো এর চাইতেও বড় আরো বহু গুনাহ্ করেছি সেগুলোর এখানে উল্লেখই নেই, সে সবের পরিবর্তেও আমাকে নেকী দান করুন। এটাতো হলো আখিরাতের ঘটনা। কিন্তু দুনিয়াতে يبدل الله سيأتهم حسنات (আল্লাহ্ তাদের মন্দকাজগুলোকে সৎকাজে রূপান্তরিত করে দেবেন) কথাটির বাস্তবায়ন এভাবে হবে যে, তাদের কুপ্রকৃতি কুস্বভাবকে সৎস্বভাবে পরিণত করে দেয়া হবে। যেমন কৃপণতাকে দানশীলতা, মূর্খতাকে জ্ঞানের দ্বারা বদলিয়ে দেয়া হবে। অধিকন্তু হাসানাত তথা নেক ফলের পরিবর্তনের স্বরূপ এই যে, পানিকে রক্তে—যেমন ফেরআউনের গোষ্ঠীকে রক্তের আযাবে নিপতিত করা হয়েছিল এবং রক্তকে আবার দুধেও পরিণত করা হয়। যেমন—স্ত্রীলোক এবং বকরী-গাভীর স্তনে লক্ষ করা যায়। সুতরাং এক তারিখের ফযীলত-বরকত অন্য তারিখেও দান করাটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কি ? তাই মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

گر بخواهد عين غم شادى شود
عين بند پائے ازادى شود
كيميا دارى كه تبديلش كنى
گرچه جوئے خون بود نيلش كنى

—তাঁর ইচ্ছায় বিষাদের পাহাড় আনন্দে পরিণত হতে পারে, মজবুত শৃংখলিত পা মুক্ত স্বাধীনরূপে বিচরণ করা বিচিত্র নয়। তোমার হাতে রয়েছে স্পর্শ মণি, এর দ্বারা লোহাকে স্বর্ণে এমন কি তোমার পক্ষে রক্তের ধারাকে নীল নদে পরিবর্তন করে দেয়াও সম্ভব।

মহান আল্লাহ্র ন্যায় দূরদর্শী-সৃজনকুশলী হওয়া আর কার পক্ষে সম্ভব ? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তামাকে সোনায় এবং রাংকে রূপায় রূপান্তরিত করা তোমাদের ন্যায় মানুষের পক্ষে যেক্ষেত্রে সম্ভব, সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র পক্ষে নুড়ি পাথর সোনায় রূপান্তরিতকরণ অসম্ভব কি ? বস্তুত বাস্তবের প্রমাণ এই যে, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ মাটির নিচে উৎপন্ন হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এ মাটি থেকেই কত শত

মূল্যবান জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন থাকে—বাস্তবে এমনটি হয় কি-না ? কিন্তু অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শহর, প্রত্যেক জনপদে সেখানকার বাসিন্দাদের নির্ধারিত পনর তারিখেই বরকত নিহিত। হাদীসে বলা হয়েছে—

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرن والاضحى يوم تضحون

—সে দিনের রোযাই ধর্তব্য যে দিন তোমরা রোযা রাখবে, ঈদুল ফিতর সেটাই গৃহীত হবে যে দিন তোমরা ঈদ উদ্‌যাপন করবে আর সে দিনের ঈদুল আযহাই গ্রহণীয় যেদিন তোমরা কুরবানী করবে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—নিজেদের অনুসন্ধান অনুযায়ী যে দিনটিকে তোমরা রোযা রাখা শুরু কিংবা শেষ করার দিন হিসেবে সাব্যস্ত করবে আল্লাহ্‌র নিকটও সেদিনই রোযা অথবা ঈদের দিনরূপে গণ্য হবে। অর্থাৎ রমযান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে নির্দিষ্ট সওয়াব প্রত্যেক শহরের মুসলমানগণ কর্তৃক নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সে সবের নির্ধারিত তারিখেই হাসিল হবে। সুতরাং যথাযথ অনুসন্ধানের পর যে দিনটিকে শা'বানের পনর তারিখ ধার্য করত রোযা রাখবে সেটাই গ্রহণীয় এবং সে দিনের পূর্ব রাত্রি শাবানের পনর তারিখের রাত অর্থাৎ শবেবরাত হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, অযথা তারিখের বিভিন্নতার সন্দেহে পতিত হবে না। —আল-ইউস্‌রু মাআল ইউস্‌রে, পৃষ্ঠা ৩৭

## ৫৫. মহিলাদের বাড়ির মধ্যে ময়লা কাপড় পরে থাকা কিন্তু বাইরে সাজসজ্জা করে বের হওয়া দূষণীয়।

যে সমস্ত মহিলা মনের প্রশান্তি কিংবা স্বামীর মন সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান করে তাদের গুনাহ হবে না। কিন্তু কেবল লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এ সবের ব্যবহার গুনাহ্‌র ব্যাপার। দ্বিতীয় প্রকারের পরিচয় হলো—নিজ বাড়িতে তারা অতি দীন-হীন নোংরা হয়ে থাকে, কিন্তু কোন আনন্দ-উৎসবে রওয়ানা দিলে শাহযাদী রূপধারণ করে বের হয়। যেমন লক্ষ্ণৌর মজদুররা সারাদিন নেংটি পরে মজদুরী করে আর সন্ধ্যাবেলা দেখ যে—ভাড়া করা পোশাক পরে পকেটে দু-পয়সা সম্বল নিয়ে এক পয়সার পানের বিড়া আর বাকি এক পয়সার ফুলের মালা গলায় দিয়ে নবাব পুত্রের ন্যায় রাস্তায় বের হয়ে পড়েছে। নিত্য দিন নতুন নতুন কাপড় পরে বের হওয়ার কি উদ্দেশ্য তা তাদের চিন্তা করা উচিত। যদি নিজের আরাম ও মনের খুশির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে বাড়িতে এরূপ

জাঁকজমকের সাথে থাকা হয় না কেন ? কোন কোন মহিলা মন্তব্য করে থাকে—স্বামীর মান-সম্মান রক্ষার্থে মূল্যবান পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে আমরা পথে নামি। বেশ—যদি এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়াও হয় তবু কথা থাকে যে, তোমাদের কথানুযায়ী স্বামীর মান রক্ষার্থে প্রথমবার যে পোশাকে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলে সেটাই তো যথেষ্ট ছিল। এখন ক্রমান্বয়ে তিনদিন অনুষ্ঠানে হাজিরা দিতে হলে—তিনদিন তোমরা সে একই পোশাক নিয়ে বের হবে, না-কি প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাক পরিধান করবে ? আমরা তো বরং প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাকের ব্যবহার লক্ষ করি। এটা কেন ? স্বামীর মান রক্ষার্থে তো এক জোড়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দিন নতুন জোড়া চাই, আর না-হোক অন্তত ওড়না হলেও বদলাতে হবে, যেন নতুন দেখায়। আরেকটা বিষয় মহিলাদের চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়—মাহফিলে বসে স্বীয় অলঙ্কার প্রদর্শন-প্রবণতা। কেউ কেউ এ উদ্দেশ্যে মাথার কাপড় ফেলে দেয়, উদ্দেশ্য—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত জেওর সবার চোখে পড়ুক। আবার এদের মধ্যে রক্ষণশীলরা মাথার কাপড় না ফেললেও অন্যদেরকে অলঙ্কার দেখাবার একটা না একটা বাহানা খুঁজে নেয় ; একবার চুলকায় মাথা, আবার চুলকায় কান। এর নাম 'রিয়া' বা 'প্রদর্শনীর প্রবণতা'। সুতরাং রিয়ামূলক উদ্দেশ্যে পোশাক-অলংকার ব্যবহার করা হারাম। মেয়েদের আরেকটা বাতিক হলো—মাহফিলে পৌঁছেই উপস্থিত জনদের জেওর-জরিনা, গয়না-গাটি এক নজর জরিপ করে ফেলবে। উদ্দেশ্য কেউ আমার উপরে তো যায়নি আর আমি নীচে পড়িনি তো ? এটাও অহংকার ও রিয়ার অংশবিশেষ। এ রোগ পুরুষদের মধ্যে বিরল। দশজন একত্র হলে কে-কি পরল, কারো খেয়ালই হয় না। এজন্য সভাস্থল ত্যাগের পর কেউ বলতেই পারে না—কার পোশাক কিরূপ ছিল। অথচ মেয়েলোকদের প্রত্যেকের স্মরণ থাকবে কার পরনে কি ছিল, কোন্‌জনের গায়ে কত অলঙ্কার, কার গহনা পরিপাটি ইত্যাদি স্মরণ রাখবে। অথচ এ উদ্দেশ্যে মূল্যবান পোশাক-আশাক পরা হারাম। —গরীবুদ্দুনিয়া, পৃষ্ঠা ২৯

**৫৬. পুরুষরা নিজেকে মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার দায়িত্বশীল মনে না করা ভুল।**

পুরুষরা কেবল পার্থিব দায়িত্ব পালন করাটাই জরুরী মনে করে, স্ত্রীদের ব্যাপারে নিজেদের দীনী দায়িত্বের কথা তারা চিন্তাই করে না। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে খানা তৈরি হলো কিনা জোর তাকীদ দেয়া হয় কিন্তু 'নামায পড়েছ কি-না' একথা কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না। স্বামী খেতে এসে যদি দেখে খানা তৈরির এখনো বিলম্ব অথবা তৈরি তো হয়েছে কিন্তু মনমত হয়নি তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যদি জানতে পারে

স্ত্রী এখনো নামায পড়েনি তখন স্বামীর খারাপও লাগে না কিংবা স্ত্রীর প্রতি রাগও হয় না। এমনকি কারো স্ত্রী জীবনভর নামায না পড়লেও স্বামীর পরোয়া নেই। কদাচিত কারো খেয়াল যদি হয়ও তবে দায়সারা গোছের মাত্র। "নামায কালাম পড়ে নেবে, না পড়া গুনাহ্র কাজ" ব্যস এটুকু বলেই নিজেকে দায়মুক্ত বলে মনে করে নেয়। এ-ও আবার সেসব লোকের অবস্থা যারা দীনদার হিসেবে পরিচিত। যদি তাদেরকে বলা হয় "স্ত্রীকে নামাযের শাসন কেন করা হচ্ছে না।" জবাবে তাদের উক্তি হলো—বলে তো দিয়েছি, সে না পড়লে আমি কি করতে পারি ? কিন্তু আমি বলব—ইনসাফ করে বলুন—তরকারিতে লবণ বেশি হওয়া অবস্থায় আপনার শাসনের ভূমিকা যত চোটের, স্ত্রীর নামায না পড়ার শাসনও কি সেই একই মানের ? বারবার বলা সত্ত্বেও যদি ঠিকমত লবণ না হয়, তবে দু-একবার বলেই কি আপনি নীরব হয়ে পড়েন, যেরূপ নামাযের বেলায় ? মোটেই না। বরং লবণ কম বা বেশি হলে আপনি মাথা ফাটাতে উদ্যত আর এত রাগ ফুটান যে, স্ত্রী বাধ্য হয় খামখেয়ালী ছেড়ে ঠিকমত লবণ দিতে। কেননা তিনি যে ভীষণ রাগী মানুষ।

বন্ধুগণ! নামাযের জন্য তো আপনি কখনো কড়া মেজায দেখান না যাতে স্ত্রী বুঝতে পারে এর জন্য আপনি বড় অসন্তুষ্ট ; এক্ষেত্রেও যদি আপনার ভূমিকা তা-ই হতো, তবে গুরুত্ব না দিয়ে স্ত্রীর উপায় ছিল না। একবার বলায় কাজ না হলে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতেন। তাতেও কাজ না হলে রাগ করতেই থাকতেন এবং বিভিন্ন পন্থায় নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ ঘটাতেন। যথা—স্ত্রীর সাথে শোয়া বর্জন করে চলতেন অথবা তার হাতের পাক খাওয়া পরিহার করতেন। অতিরিক্ত লবণের বেলায় রাগে কাজ না হলে নীরব না থেকে আপনি বলতেই থাকেন। এ ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা এমন হয় না যে, এতবার বলা সত্ত্বেও যখন কাজ হচ্ছে না, তাহলে চুপ থাকা ছাড়া উপায় কি ?

বন্ধুগণ ! ইনসাফ করে বলুন, নামাযের বেলায় যেভাবে মনকে বুঝিয়ে নিয়েছেন—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কি নিজেকে একই ধরনের প্রবোধ দেয়া হয় ? কখনো না। এটা আপনাদের নিছক দুর্বলতা বৈ নয়। স্ত্রীকে নামাযী বানাতে আপনাদের অকৃত্রিম আগ্রহ থাকলে এটা কোন কঠিন কাজ নয়। কারণ স্ত্রী শাসক নয়, স্বামী কর্তৃক শাসিত। সুতরাং আপন মতলব ও স্বার্থে তো তার ওপর ক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার করাই হয় কিন্তু দীনের ব্যাপারে সে ক্ষমতা আদৌ প্রয়োগ করা হয় না। —হুকূকুল বাইত, পৃষ্ঠা ৬

**৫৭. বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নারীজাতির পক্ষে বিষ তুল্য।**

কেউ কেউ নিজ কন্যাদের মুক্ত, বেপরোয়া মহিলার মাধ্যমে শিক্ষাদানে আগ্রহী। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, মানুষের মধ্যে সহকর্মী-সহপাঠীর চরিত্র ও আবেগের প্রভাব প্রতিফলন অনিবার্য। বিশেষত সে সহযোগী যদি উপরস্থ ব্যক্তি হয়। বলা বাহুল্য—উস্তাদের মধ্যে এসব বিশেষণ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। এমতাবস্থায় মেয়েদের মধ্যে সে বেপরোয়া ও স্বাধীন মনোভাবের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আমার মতে এর ফলে যাবতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি নারীর লাজ-নম্র চরিত্র-মাধুর্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় তাদের থেকে যেকোন কল্যাণের আশা আর অকল্যাণের নিরাশা অর্থহীন। কেননা প্রবাদ রয়েছে ঃ اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت অর্থাৎ, লাজ্জা হারিয়ে ফেললে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার । কথাটা ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু আমার মতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপকতর। কারণ পুরুষের মধ্যে বিবেকের বাধা তবু কিছুটা থাকে কিন্তু নারী চরিত্রে বিবেকের স্বল্পতা হেতু কোন বাধাই থাকে না। অনুরূপ শিক্ষিকা যদি সেরূপ নাও হয় কিন্তু সহপাঠী মেয়েরা এ ধরনের হলে এর দ্বারাও ক্ষতির আশংকা প্রবল। এ বক্তব্য দ্বারা বর্তমানে প্রচলিত দুটি বিষয় উত্তমরূপে ফুটে ওঠে। এক ঃ সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যাতে দৈনিক বিভিন্ন মত ও পথের ছাত্রীর সমাবেশ ঘটে। শিক্ষয়িত্রী যদি মুসলমানও হয়, যাতায়াত করে পাল্কীতে এবং পর্দাঘেরা বাড়িতে থাকে তা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে এখানে এমন সব কারণ সৃষ্টি হয় যার দ্বারা চরিত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সাহচর্য চরিত্র হননকারী প্রমাণিত হয়। আর শিক্ষিকা যদি স্বাধীনমনা এবং প্রবঞ্চক প্রবৃত্তির হয় তবে তো রক্ষাই নেই। দুই ঃ কোথাও যদি দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্যে মিশনারী মেমদের সান্নিধ্যে আসার এবং মেলামেশার সুযোগ অব্যাহত থাকে, তবে ইজ্জত আবরু তো দূরের কথা ঈমান রক্ষাই দায় হয়ে পড়ে। পরিতাপের বিষয়—কেউ কেউ এটাকে গৌরবজনক মনে করে এদেরকে আপন বাড়িতে স্থান দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আমার মতে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে মুসলমান কোন বৃদ্ধা মহিলা পর্যন্ত জীবনে একবারের জন্যও এ সকল মেমদের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ লাভ করাটা মারাত্মক ক্ষতিকর সে ক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত কচি বালিকাদের তো প্রশ্নই আসে না। এসব ক্ষতির কথাই ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বালিকাদের সব চাইতে নিরাপদ শিক্ষা ব্যবস্থা হলো—দু-চারটি বালিকা নিজেদের ঘনিষ্ঠ ও নিরাপদ স্থানে একত্রিত হয়ে শিক্ষা লাভ করবে। ভাগ্যক্রমে

উপযুক্ত অবৈতনিক কোন শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করা গেলে অতি উত্তম এবং এ শিক্ষা অধিক ফলপ্রসূ আর বরকতময় প্রমাণিত হয়। প্রয়োজনে এ জাতীয় শিক্ষয়িত্রী সবেতন নিয়োগ করাতেও ক্ষতি নেই। কোথাও যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অবর্তমানে বাড়ির পুরুষই আপাতত শিক্ষা দেবে। এতো গেল নারী শিক্ষার পদ্ধতিগত আলোচনা।

অতঃপর তাদের ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচী হবে—প্রথমে সহীহ-শুদ্ধ কুরআন পাঠ, অতঃপর সহজ-সরল ভাষায় ইসলামের সকল দিক এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া। আমার মতে দশ খণ্ড বেহেশতী জেওরই এর জন্য যথেষ্ট। পুরুষ শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষাদানের বেলায় লজ্জাজনক মাসআলাসমূহ উপেক্ষা করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীর মাধ্যমে সেসব বুঝিয়ে দেবে। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে নির্দিষ্ট স্থানগুলি এখনকার মত রেখে দেবে মেয়েরা বড় হলে নিজেরাই বুঝে নেবে। স্বামী আলিম হলে তার কাছে শিখে নেবে অথবা স্বামীর মাধ্যমে কোন আলিমের নিকট থেকে জেনে নেবে। (বেহেশতী জেওরের পঠন পদ্ধতিতে আমি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লিখে দিয়েছি। কিন্তু কেউ কেউ সেটা না দেখেই প্রশ্ন করে বসে—পুরুষদের পক্ষে এ জাতীয় মাসআলা শিক্ষাদানের উপায় কি ? কাজেই কিতাবের ভূমিকায় এ সম্পর্কে না লেখাই মনে হয় সমীচীন ছিল। এদের অপক্ক বিবেক দেখে অবাক হতে হয়।) বেহেশতী জেওরের শেষাংশে মহিলাদের জন্য উপকারী কিছু কিতাবের নামোল্লেখ করা হয়েছে, সে সব পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ানো দরকার। সবগুলো সম্ভব না হলে প্রয়োজন পরিমাণ ক্লাসে পড়ানো দরকার, অবশিষ্টগুলি পরে অধ্যয়ন করতে থাকবে। শিক্ষার সাথে সাথে বাস্তব আমলের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত। সাথে সাথে মেয়েদের মনে শিক্ষাদানের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এ ধরনের ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্ছনীয়, তারা যেন সারা জীবন ইল্‌ম চর্চায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পায়। অতএব, এভাবে ইল্‌ম ও আমলের মানসিকতা গড়ে উঠবে। অধিকন্তু উপকারী ও শিক্ষামূলক কিতাবাদি অধ্যয়নে মেয়েদেরকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী সমাপনান্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে আরবী শিক্ষার প্রতি তাদের আকৃষ্ট করা উচিত। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ মূল ভাষায় বোঝার যোগ্যতা যেন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। কোন কোন মেয়ে কুরআনের অনুবাদ পাঠে আগ্রহী। আমার মতে বোঝার ক্ষেত্রে তারা অধিক মাত্রায় ভুল করে থাকে। তাই সবার জন্য এটা উপযোগী নয়।

এতক্ষণের আলোচনা সম্পৃক্ত ছিল কেবল পড়ার মধ্যে। বাকি লেখা সম্পর্কে কথা হলো—তাদের মন-মানসিকতায় বেপরোয়া ও নির্ভয়ের প্রবণতার লক্ষণ দৃষ্ট না হলে ক্ষতি নেই। পারিবারিক প্রয়োজন পূরণে লেখার দরকার রয়েছে। কিন্তু খারাপের

আশংকা থাকাবস্থায় কল্যাণ লাভ অপেক্ষা অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষার গুরুত্ব অসীম। এমতাবস্থায় মেয়েদের লেখা শেখানো এবং লিখতে দেয়া উচিত নয়। নারী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্নে জ্ঞানী মহলের মতবিরোধের এটাই হলো সঠিক ফয়সালা।

—হুকূকুল বাইত, পৃষ্ঠা ৩৮

# বহুল প্রচলিত ভুল সংশোধন

## ৫৮. পীর অপেক্ষা মাতা-পিতার হক বেশি।

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে—পিতা-মাতার হক বেশি না পীরের ? জবাবে আমি বলেছি—পিতা-মাতার হক অগ্রগণ্য। অবশ্য لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে মাখলুকের আনুগত্য স্বীকৃত নয়)। অর্থাৎ পীর যদি শরীয়তের বিধান মোতাবিক হুকুম করেন আর মাতা-পিতার নির্দেশ হয় শরীয়তের বিরোধী এমতাবস্থায় পিতা-মাতার নয় পীরের আনুগত্য জরুরী। পীর যেহেতু শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী পথনির্দেশ করেন, কাজেই তার আনুগত্য অগ্রাধিকারের দাবিদার। কিন্তু এটা হক বা অধিকার হিসেবে নয়। হক হিসেবে আল্লাহ্‌র পরই মাতা-পিতার স্থান। বর্তমানের পীররাও নিজেকে মালিক মনে করেন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, এতদঞ্চলের গদীনশীন পীরদের ভূমিকা তেমন আপত্তিজনক নয়। পূর্বাঞ্চলীয় জনৈক পীর মেয়ে মহলে গিয়ে আস্তানা গাড়ত। আল্লাহ্ এ জাতীয় পীরদের নিপাত করুন। সাথে সাথে তিনি একজন মস্তবড় বুযুর্গ এবং শ্রেষ্ঠ কুতুব হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। তার মুরীদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ, হিন্দুরা পর্যন্ত তার মুরীদ ছিল। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী যুগে ফকীর, দরবেশের জন্য মুসলমান হওয়া ছিল অপরিহার্য। আর বর্তমানে কাফেরও সূফী-দরবেশ হতে কোন বাধা নেই। এ পরিস্থিতি এসব ডাকাতের সৃষ্টি। কাফেররাও এদের মুরীদ হওয়ার যোগ্যপাত্র। দাজ্জালের প্রতি নিশ্চয়ই এরা বিশ্বাস স্থাপনে কুণ্ঠিত হবে না। কারণ সে ভেল্কিবাজী ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিরাট অধিকারী হবে। এদের দৃষ্টিতে যেহেতু সূফীর জন্য মুসলমান হওয়া অপরিহার্য নয়, কাজেই নির্বিঘ্নে এরা দাজ্জালকে ইমাম স্বীকার করে নেবে। কিন্তু যে বিশ্বাস রাখে যে, যেখানে শরীয়ত অনুপস্থিত তথায় কিছুই নেই, তার নিকট কারামত মূল্যহীন, শরীয়তের আনুগত্যকে সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিবে। আর দাজ্জাল হবে যেহেতু কাফের, তাই এর ফিতনা থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

বন্ধুগণ! দাজ্জালের প্রকাশ বেশি দূরে নয়। কাজেই অতি সত্বর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করে নিন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমার নিকট ইলহামের আগমন ঘটেছে বরং পরিস্থিতি আভাস দিচ্ছে যে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় অতি নিকটবর্তী। স্বয়ং মহানবী (সা) সন্দেহ করতেন—আমার সময়েই না জানি তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কাজেই আমাদের সময়ে বের হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। অতএব, নিজের আকীদা সংশোধনে তৎপর হওয়া বিশেষ জরুরী এবং শরীয়ত বিরোধী ব্যক্তির ভক্ত-অনুরক্তের দলে মোটেই শামিল হওয়া চাই না। এরপর আপনারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবেন।

মোটকথা—আজকালের পীররা ধারণা করে—মুরীদরা আমাদের মালিকানা সম্পত্তি, তাই মুরীদকে তারা মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্মরণ রাখবে, যদি পীর বলে রাতে নফল পড় আর পিতা বলে, না শুয়ে থাক। এক্ষেত্রে পিতার আনুগত্য অগ্রগণ্য। অবশ্য পিতা যদি শরীয়তের পরিপন্থী কোন নির্দেশ দেয় এমতাবস্থায় তার আনুগত্য জায়েয নয়। কারণ শরীয়তের দাবি সর্বাগ্রে পালনীয়। মাতা-পিতার হক অনুধাবনের জন্য জুরাইজের ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। প্রাচীনকালে বনী ইসরাঈল গোত্রে জুরাইজ নামক জনৈক দরবেশ বনের মধ্যে নির্জনবাস গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী শরীয়তে এ-বিধান জায়েয ছিল। অবশ্য আমাদের শরীয়তে এ ব্যবস্থা কাম্য নয়। নির্জনবাস সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতি দৃষ্টে একটা মোটা কথা বলে রাখি, বর্তমান যুগের পরিবেশ অনুযায়ী নির্জনবাস গ্রহণ দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ এ ধরনের বনবাসী ব্যক্তিকে লোকেরা বড় বিরক্ত করে, কিন্তু মসজিদের কোণে বসা ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না। দ্বিতীয়ত মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ ইবাদত দুর্বলতার লক্ষণ। কবির ভাষায় ঃ

زاهد نه داشت تاب جمال پری رخان

کنجے گرفت وترس خدارا بهانه ساخت

—পরীর মত রূপসীর রূপের চমক সহ্য করার ক্ষমতা দরবেশের নেই, তাই সে খোদাভীতির ছলে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। বীরত্বের কথা হলো—সমাজের সকলের সাথে মিলে মিশে থাক আর আপন কাজে লিপ্ত থাক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف

অর্থাৎ দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা সবল মুমিন অধিক উত্তম। আর জংগলে কেউ যদি বিরক্ত না করে তো উত্তম কথা, কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু শরীয়তের সীমালংঘন করা হারাম। এরই প্রেক্ষিতে কবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

بزهدو ورع كوش وصدق وصفا

وليكن ميفزائے بر مصطفى

خلاف پيمبر كسے ره گزيد

كه هر گز بمنزل نخواهد رسيد

مپندار سعدى كه راه صفا

توان يافت جزبر پئے مصطفے

—তাকওয়া, পরহেজগারী, সততা, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে শত চেষ্টা কর, কিন্তু নবী মুস্তফা (সা)-কে অতিক্রম করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। পয়গম্বরের বিপরীত পথের পথিকের পক্ষে কখনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছা সম্ভব নয়। হে সাদী! নবী মুস্তফা (সা)-এর আনুগত্য ব্যতীত হিদায়েতের পথ পাওয়া যাবে এ ধারণা কখনো করো না।

অর্থাৎ যা কিছু হাসিল করার একমাত্র মহানবী (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের মর্ম পুরোপুরি বুঝে না আসলে সাহাবীগণের অবস্থা লক্ষ কর। কেননা তাঁরা ছিলেন নবী জীবনের বাস্তব নমুনা।

যা হোক, জুরাইজ একজন আবেদ লোক ছিলেন। একবার নিজের ইবাদতখানায় নফল নামায পড়াকালে তাঁর মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ডাকেন। এখন তিনি এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন যে, জবাব দিবেন কি-না। কারণ জবাব দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর জবাব না দিলে মায়ের বিরাগভাজন হওয়ার আশংকা।

অবশেষে উত্তর না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে দু-তিনবার ডাকার পর মা তাঁর প্রতি ঃ اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات (হে আল্লাহ্! কোন যিনাকারিণী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত যেন তার মৃত্যু না হয়।) এ অভিশাপ উচ্চারণ করে মা ফিরে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ঘটনা বর্ণনার পর ইরশাদ ফরমান ঃ لو كان فقيها لاجاب امه "ফকীহ্ হলে নিশ্চয়ই সে মায়ের জবাব দিত।" এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামায নফল ছিল। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয নামায ত্যাগ করা জায়েয নয়। অবশ্য

আগুনে পুড়ে অথবা গর্তে পড়ে যাওয়া ইত্যাদির ন্যায় বিপন্নকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ফরয নামায ত্যাগ করা ওয়াজিব, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যেই হোক।

বন্ধুগণ! আপনারা শরীয়তের রহমত ও অনুগ্রহপূর্ণ বিধান লক্ষ করুন। এর সৌন্দর্য ও কল্যাণকামিতা আপনাদের অনুভূতি-উপলব্ধির আওতাধীন নয় বিধায় আপনাদের দ্বারা শরীয়তের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এর অবস্থা বরং ঃ

زفرق تا بقدم هر کجامی نگرم

کرشمه دامن دل میکشد که جا اینجاست

—মাথা হতে পা পর্যন্ত যেখানেই তাকাই না কেন তাঁর মহত্ত্ব ও অনুগ্রহ মনকে আকর্ষণ করে নির্দেশ দেয় যে, তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু এখানেই।

শরীয়ত এমনি সুন্দর যে, এর যেকোন অঙ্গের প্রতি তাকাও দেখবে মনোহারী, যে ভঙ্গির প্রতি দৃষ্টিপাত করবে দেখতে পাবে তাই চিত্তাকর্ষক। আপনারা অবশ্যই লক্ষ করেছেন—শরীয়তের বিধান কত জরুরী ও বাস্তবসম্মত যে, বিপন্নের সাহায্যার্থে ফরয নামায পর্যন্ত ছেড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছা অনিবার্য। অধিকন্তু বিনা কারণে ডাকলেও নফল নামায ত্যাগ করে মাতা-পিতার আহবানে সাড়া দেয়া শরীয়তের বিধান। কিন্তু শর্ত হলো—তারা যদি সন্তানের নামাযের খবর অবগত না থাকে। বস্তুত জুরাইজ ফকীহ ছিলেন না বিধায় ডাকে সাড়া দেননি। তাই মায়ের বদ্‌দোয়া প্রাপ্ত হন। এর ফল হলো এই যে, পাশেই চরিত্রহীনা এক নারী ছিল। অন্য কারো সাথে দুষ্কর্মের দরুন সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কতিপয় লোক ছিল জুরাইজের শত্রু। তারা রমণীকে বলল—তুমি জুরাইজের নামোল্লেখ করে বলবে—এটা তারই কর্ম, এ সন্তান জুরাইজের। হতভাগী তাই করে। ফলে জনগণ উত্তেজিত হয়ে ইবাদতখানা ধ্বংস করতে এবং জুরাইজকে শারীরিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করতে উদ্যত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ আচরণের মূলে কোন কারণ আছে কি ? লোকেরা বলল —তুমি রিয়াকার, ইবাদতখানা নির্মাণ করে এর মধ্যে বসে ব্যভিচার কর। অমুক রমণীর সাথে তুমি যিনা করেছ এবং তার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তিনি অতঃপর ইবাদতখানা থেকে নিচে নেমে আসেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় ও মকবূল বান্দা। আল্লাহ্‌র রহমতে ঢেউ ওঠে এবং তাঁর কারামাতের প্রকাশ ঘটে। হযরত জুরাইজ রমণীর শিশু পুত্রকে প্রশ্ন করলেন—বল্, তুই কার পুত্র ? সে বলল ঃ আমি অমুক রাখালের ছেলে। হাদীসে বর্ণিত আলোচ্য ঘটনা দ্বারা মায়ের হক ও মর্যাদা পরিষ্কার হয়ে ওঠে কিন্তু ইমামগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত এই যে,

পীরের আহবানে নফল নামায ত্যাগ করাও জায়েয নয়। সুতরাং পীরের হক মাতা-পিতার হকের অধিক নহে। তাহলে পীর সাহেব তো খাসা লোক যে, পরের পালা ধন হাতিয়ে নিলেন। তাহলে পীর-মুরীদের রহস্য কি এই ?

—ওয়ায—আযলুল জাহেলিয়াহ্, পৃষ্ঠা ৫৭

৫৭. 'ছোট বাচ্চার প্রাণ যায় যাক কিন্তু রোযা সম্পূর্ণ করতেই হবে'—এ ধরনের আমলের কোন সারবত্তা নেই।

এক জায়গায় দেখতে পেলাম বাড়ির সব মেয়েরা মিলে একটি কচি মেয়েকে রোযা রাখিয়েছে। এখন সে রোযা নষ্ট করে দেয় কিনা তার সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা এমনকি পায়খানায় গেলেও পিছনে পাহারাদার খাড়া। অর্থাৎ বাচ্চার প্রাণ গেলেও রোযা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু কোন কোন সময় এহেন রোযা বাচ্চাকে কবরে পৌঁছে ছাড়ে। একবারের ঘটনা, কোন এক ধনীর দুলালকে রোযা রাখানো হয়। গরমের দিন ছিল, দুপুর পর্যন্ত তো বেচারা কোন মতে সামলে নেয়। কিন্তু আসরের সময় লাচার হয়ে পড়ে। বিত্তবান পিতা পুত্রের রোযা খোলা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী দাওয়াত করে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের ব্যবস্থা করল। বাচ্চাকে বার বার ধৈর্যের উপদেশ আর সান্ত্বনা বাণী শুনানোর পুণ্যকাজ চলতে থাকে—এই তো হয়ে গেল, আরেকটু সবর কর ইত্যাদি। কিন্তু কচি প্রাণে এতবড় চোট সামলানোর ক্ষমতা কোথায় ? সবাইকে বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও কোন জালিমের অন্তরে কচি প্রাণের প্রতি দয়া হলো না। এদিকে ধনী পিতা অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে মটকা ভরা পানিতে বরফ দিয়েও ইফতারের বিপুল আয়োজন করল। নিরুপায় ছেলে অবশেষে পরান ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে মটকার ধারে পৌঁছে। আর তার সাথে লেপটানোর সাথে সাথেই প্রাণ বের হয়ে যায়। নিষ্ঠুর কসাই পিতা-মাতাকেই এখন সাজা ভোগ করতে হলো।

বন্ধুগণ! শরীয়তের তো বিধান হলো—প্রাণের আশংকা দেখা দিলে বয়স্ক যুবকের পক্ষেও রোযা খুলে ফেলা ওয়াজিব। কিন্তু রেওয়াজীদের নিকট নিষ্পাপ কচি শিশুর পর্যন্ত অনুমতি নেই। আফসোস! তোমাদের এমন রোযার আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক দয়াশীল। কুরআনের বাণী ঃ النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم—নবী মু'মিনদের প্রাণাপেক্ষা অধিকতর দয়াশীল। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে বয়স্কদের প্রতি রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ, সেক্ষেত্রে চার-পাঁচ বছরের কচি শিশু কোন্ খাতের হিসেবে। এ জন্য আমি বলি, শরীয়তের বিধানে এত দয়া, এত সহজ-সারল্য বিদ্যমান, যা আপন সত্তার প্রতি তোমরা নিজেরাও দেখাতে সক্ষম নও। —আযলুল জাহিলিয়াহ্, পৃষ্ঠা ৫১

## ৬০. ফেরেশতাগণ পয়গম্বর হিসেবে কেন প্রেরিত হননি ? মহানবী (সা) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ।

১. এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত ঃ لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة প্রণিধানযোগ্য। যার মর্ম হলো—আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্তার ভিতর তোমাদের তথা গোটা মানবজাতির কল্যাণে উত্তম আদর্শ নিহিত রেখেছেন। আদর্শ বা নমুনা দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, এই ছাঁচে অন্যান্য জিনিস তৈরি হোক। জনৈক বুযুর্গের মুখে এ সম্পর্কে আমি সূক্ষ্ম জবাব শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ মহানবী (সা)-এর সাথে আমাদের দৃষ্টান্ত এরূপ—যেন এক ব্যক্তি সেলাই করা আচকানের নমুনা দিয়ে দর্জির নিকট আচকান সেলাই করতে দিল। দর্জি পুরো আচকানের নমুনা অনুযায়ী মাপজোখ দিয়ে সেলাই করে নিয়ে আসল। সেলাইতে কোন ত্রুটি নেই। সবই ঠিক, কিন্তু একটা হাতা কেবল এক বিঘত ছোট করেছে। এখন এ আচকান মালিকের হাতে দিলে মালিক কি বলবে ? মালিক কি গ্রহণ করবে, না-কি তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে ? জবাবে দর্জি বলে—জনাব, সবইতো ঠিক, একটা হাতাই তো কেবল ছোট। এমতাবস্থায় আপনারা কি মনে করেন মালিক খুশি মনে গ্রহণ করবে ? মোটেই না। সম্পূর্ণ কাপড়ের দাম উসুল করে নিবে। সুতরাং উত্তমরূপে স্মরণ রাখুন! মহান আল্লাহ্ পূর্ণাঙ্গ আইনের বিধান নাযিল করেছেন এবং বাস্তব নমুনাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তৈরি করেছেন। এখন আপনাদের আমল নমুনা অনুসারে হলে তো ঠিকই আছে, নতুবা ভুল এবং গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হবে। আপনাদের নামায, যিক্র রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী হলে গ্রহণযোগ্য, নতুবা মূল্যহীন, উল্টো গুনাহ হবে। লক্ষ করুন, নামাযের মধ্যে দুটি সিজদার স্থলে এক সিজদা করা হলে নামায বাতিল গণ্য হবে। অর্থাৎ সিজদা দুটোই করতে হবে। অনুরূপ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতকারী সওয়াবের পরিবর্তে উল্টো গুনাহগার হবে। একইভাবে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট নামের পরিবর্তে নিজের তরফ থেকে নাম রাখা কারো পক্ষে জায়েয নয়। আপনার রোযা, হজ্জ, যাকাত সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ অনুযায়ী হওয়া অপরিহার্য। তাঁর নমুনা বহির্ভূত কোন আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এসব হলো ইসলামের যাহেরী আমল। বাতেনী ও আধ্যাত্মিক আমলের অবস্থাও একই ধরনের—পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেনদেন সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই বিধান। আল্লাহ্ কোন ফেরেশতাকে আমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে না পাঠানোর রহস্য এখানেই যে, ফেরেশতা আমাদের নমুনা হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তাদের খাওয়া, পরা, বিয়ে-শাদী , সমাজ-নমায ইত্যাদির কোন প্রয়োজন

পড়ে না। এসব হুকুমের বেলায় তাদের ভূমিকা কেবল আমাদেরকে পড়ে শোনানোতেই সীমিত থাকত। বস্তুত এটুকু দায়িত্ব আমাদের নিকট শুধু কিতাব পাঠালেও চলত যে, হুকুম-আহকাম পাঠ করে অথবা অপরের মুখে শুনে আমল করে নিতাম। ফেরেশতা নাযিল হওয়া দ্বারা কিতাব নাযিল হওয়া অপেক্ষা অধিক লাভের কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা করেন নি। তিনি আমাদের মধ্য থেকেই পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। যিনি খাওয়া, পরা, বিয়ে-শাদী, সুখ-দুঃখ, সমাজ-জামাতে আমাদের সাথী। তাঁর সাথে বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থও দেয়া হয়েছে। তিনি নিজে এর ওপর আমল করেছেন, যেন আমাদের পক্ষে সহজ হয়, আদর্শ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ٠

—তোমার পূর্বে যত রাসূল আমি পাঠিয়েছি তাঁরা মানুষের ন্যায় পানাহার, চলাফেরা এবং সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ٠ অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে হুকুমসহ ফেরেশতা পাঠানো হলে সেও মানব গোষ্ঠীভুক্ত পুরুষই হতো। নতুবা আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে না পারার কারণে তার দ্বারা মানুষের হেদায়েত লাভ সম্ভব ছিল না। এ পর্যায়ে মহানবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ফেরেশতা অপেক্ষা অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও হিকমতে ইলাহীর ইচ্ছা হলো তাঁকে মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা। উদ্দেশ্য—মানবীয় সকল কাজে-কর্মে যেন তাঁর জীবন চরিত আদর্শ ও নমুনার দিশারী হয়ে বিরাজ করে। লক্ষ করুন! মানবীয় সকল সমস্যা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং বিয়ে করেছেন, সন্তানের বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতিতেই কয়েকজন সন্তান চিরবিদায় নিয়েছেন। সন্তানহারার মর্মযাতনা তাকে ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই আপনজনের বিয়োগ-ব্যথার অঙ্গনেও তিনি আমাদের আদর্শ। এখন লক্ষ করুন! আমাদের কোন্ কাজটা তাঁর সে নমুনা-সদৃশ। আনন্দ কিংবা যাতনা কোন অবস্থাতেই আমরা আদর্শের প্রতি তাকাই না যে, এর সাথে আমাদের আচরণ খাপ খায় কি-না। তাই সে দর্জির ঘটনা মনে রাখুন—আধা হাত ছোট হওয়ার দরুন যার আচকান মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। আর সেলাই না করে আসল কাপড়ই নষ্ট করে যদি মালিকের সামনে হাযির করে, তখন সে কি পরিমাণ সাজার যোগ্য হবে ? উপরন্তু মালিকও যখন সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্র কসম! আমাদের আমলের অবস্থাও তদ্রূপ। আসল নমুনা থেকে দূরে সরে বিকৃত আমল আল্লাহ্র সামনে পেশ করছি। এসব আমার অতিরঞ্জন নয়। লক্ষ করুন, আচকানের কাপড় অবিকৃত অবস্থায় থাকা শর্ত। আর বিকৃতি দ্বারা আচকান তো দূরের কথা

কাপড় তৈরির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। তদ্রূপ আমলের পরিশুদ্ধির জন্য ঈমান পূর্ব শর্ত। সুতরাং ঈমান হারিয়ে কারো আমলের প্রচেষ্টা বিকৃত কাপড় দ্বারা আচকান সেলাইয়ের সমতুল্য। —মুনাযাআতুল হাওয়া, পৃষ্ঠা ৬৩

২. মহানবী (সা)-এর চাল-চলন, অবস্থা-ব্যবস্থা সবকিছুকে নিজেদের সাথে সার্বিকভাবে তুলনা করা একটা ভুল চিন্তাধারা। বস্তুত তাঁর অবস্থা হলো بشر لا كالبشر ولكن كالياقوت بين الحجر অর্থাৎ তিনি মানুষ বটে কিন্তু সাধারণ মানুষতুল্য মানুষ নন। বরং মানুষের মধ্যে তাঁর অবস্থান শিলাস্তূপে মণি-কাঞ্চনের ন্যায়। অর্থাৎ জাতে অভিন্ন ও সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও ইয়াকুত এবং শিলা খণ্ডের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এখন কেবল সমজাতীয় হওয়ার ভিত্তিতে ইয়াকূতকে অন্যান্য পাথরের সাথে কেউ তুলনা করতে চাইলে বলতে হবে—তার বিবেক পাথরে পিষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন মানুষ জ্ঞানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজেদের সাথে তুলনা দেয়া চলে না। সকল মানুষ কি একই পর্যায়ের ? লক্ষ কর. কৃষ্ণাঙ্গ, নিগ্রো, তদুপরি চোখ টেরা সেও মানুষ, আবার অনুপম রূপের অধিকারী দ্বিতীয় ইউসূফ সেও মানুষ। কিন্তু উভয়ে কি সমপর্যায়ের, এদের একজনকে অপরজনের সাথে তুলনা করা কি সঙ্গত ? আদৌ না। এদের দু-জনের মধ্যে এত ব্যবধান যে, উক্ত দ্বিতীয় ইউসুফকে দর্শনের পর কেউ নিগ্রো লোকটিকে দেখে মানুষ বলে স্বীকারই করবে না, যেহেতু তার দৃষ্টিতে মানুষ বলতে তখন একমাত্র সুন্দর মুখটিকে বোঝায়। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এমনি এক অদ্বিতীয় মানব যার নূরানী জ্যোতির্ময় চেহারা দর্শনকারীর দৃষ্টিতে তুমি-আমি মানুষ হওয়া তো দূরের কথা, আমাদেরকে সে গরু-গাধা তুল্য মনে করবে। এ প্রশ্নে মানুষ তিন পর্যায়ে বিভক্ত। একশ্রেণীর লোক তো তাঁকে মানুষের ঊর্ধ্বে উঠিয়ে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। দ্বিতীয় শ্রেণী তাঁকে নিজেদের ন্যায় সাধারণ মানুষের কাতারে নামিয়ে আনার পক্ষপাতী। এ উভয়শ্রেণী ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। তৃতীয় দল মধ্যমপন্থী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মানুষ মনে করে কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষ। তারা মহানবীর শানে উচ্চারণ করে ঃ

بشر لا كالبشر بل كالياقوت بين الحجر

—তিনি মানুষ কিন্তু অসাধারণ বরং শৈল জগতে ইয়াকূত আর মণি-কাঞ্চনসম। বাস্তবে ঘটনাও তাই। কবির ভাষায় ঃ

گفت اینك ما بشر ایشاں بشر

ما وایشاں بسته خوابیم وخور

این ندا نستند ایشاں از عمے

درمیان فرقے بود بے منتہا

—তাদের কথা—আমরা মানুষ নবীগণও মানুষ, তাঁরা আমরা একই নিয়মে আহার নিদ্রায় সমঅংশীদার। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন দুইয়ের মাঝখানে সীমাহীন ব্যবধানের মর্ম তাদের বুঝে আসেনি। —ওয়ায—ঈওয়াউল ইয়াতামা, পৃষ্ঠা ২৬

**৬১. আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে ইসলামের প্রতি বৈরী, এরূপ পাত্রের সাথে মুসলমান পাত্রীর বিয়ে বৈধ নয়।**

পরিতাপের বিষয় হলো--এমন সব পাত্রের হাতে আজকাল কন্যা তুলে দেয়া হয় আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে যাদের কেউ কেউ লাগামহীন জীবনে অভ্যস্ত। এমনকি দীন ও ঈমানের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। মুখে কুফরী কথা প্রকাশেও এরা দ্বিধা করে না। এহেন ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়রা খুশি কত—"যাক একটি সুন্নাত তরীকা আদায় হলো।" কিন্তু তাদের কল্পনায়ও নেই যে, সুন্নত শুদ্ধ হওয়া না হওয়া ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। অথচ পরিতাপের বিষয় হলো—দুলা মিয়া কতবার যে ঈমান থেকে খারিজ হয়েছেন তা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। এখন সে পূর্ব দৃষ্টান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে যে, কাপড়কে খণ্ড খণ্ড করে বরং পুড়িয়ে আচকান সেলাইয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে। এর আগে আমরা অশ্রুপাত করতাম এই দেখে যে, "আচকান প্রয়োজনের অনুপাতে সেলাই করা হচ্ছে না, এক হাত আধা হাত ছোট করা হচ্ছে।" আর এখানে তো পুরা হাতাই গায়েব, নিচের পাট্টার খবরই নেই। অথচ 'আচকান তৈরি হচ্ছে' রবে খুশির অন্ত নেই! একটি দীনদার মেয়ের জনৈক ইংরেজি শিক্ষিত ছেলের সাথে বিয়ে হয়। পাত্র একবার ভর মজলিসে মন্তব্য করতে থাকে ঃ "মুহাম্মদ সাহেব (সা) বাস্তবিকই একজন মহান সংস্কারক ছিলেন। তার সাথে আমার উত্তম সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু রিসালাত তো একটি ধর্মীয় কল্পনা মাত্র।" নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক, এটা একটা কুফরী বাক্য। এর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কই তো ছিন্ন হয়ে যায়। একথা পাত্রীপক্ষকে বলা হলে তারা উল্টো মারমুখী হয়ে ওঠে এই বলে যে, এ উক্তি দ্বারা আমাদের বংশের নাক কাটা হয়েছে। আগেকার যুগে বিবেচনা করা হতো পাত্র চরিত্রবান কি-না। আর এখন দেখতে হয় পাত্র মুসলমান, না কাফের। উক্ত ঘটনা দ্বারা আমার এ উক্তি প্রমাণিত যে, "আমাদের আমল শুধু খারাপই নয় বরং বাতিল।" অথচ মজার ব্যাপার হলো আমরা একে কল্যাণকর মনে করে সওয়াবের আশায় বসে আছি। এ প্রসঙ্গে কবির বাক্য প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন ঃ

وسوف ترى اذا انكشف الغبار

افرس تحت رجلك ام حمار

—আঁধারের আচ্ছাদন সরে গেলে অচিরেই তুমি দেখতে পাবে তোমার নিচের বাহনটি ঘোড়া কি গাধা। —ওয়ায—মুনাযা'আতুল হাওয়া, পৃষ্ঠা ৬৫

**৬২. মহানবী (সা)-এর যুগে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা অজ্ঞতাপ্রসূত।**

মাওলানা থানভী (র) বলেন—মহানবী (সা)-এর সময়কালে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা অনেকেই প্রকাশ করে। আমি বলি—নবীযুগে জন্ম না হয়ে এক হিসেবে আমাদের জন্য ভালই হয়েছে। কারণ, আমাদের অবস্থা বিচিত্র রং-এর—আল্লাহ্র পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আমরা অতিশয় কুণ্ঠিত। অথচ নবীযুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব সময় লেগেই থাকত। কখনো হুকুম হতো যাকাত দাও, কখনো নির্দেশ আসত জিহাদে আত্মনিবেদনের, আবার কোন কোন সময় প্রশ্ন আসত আপনজনদের ছেড়ে যাওয়ার। তাই আমাদের ন্যায় এহেন স্বভাব-প্রকৃতির লোকদের পক্ষে নবীর হুকুম পালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতে নবুয়তের অস্বীকৃতি পর্যন্ত বিচিত্র ছিল না। পরিণামে কুফরী এবং ইহ ও পরকালীন ধ্বংস আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ত। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ জানেন আমাদের আচার-আচরণের সমসাময়িকতার অশুভ রূপ আত্মপ্রকাশ করত কি-না। এখন সুসংকলিত শরীয়ত আমরা পেয়ে গেছি। মহানবী (সা)-এর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য,তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের সামনে উপস্থিত, বিনা বাধায় আমরা জানতে ও শুনতে পারি সেসব ঘটনার বিবরণ। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর সুন্নত ও আদর্শের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডও আমাদের দ্বারা ঘটে যায়। আল্লাহ্ না করুন, তাঁর খেলাফ করলেও আমাদের প্রতি অহীর তিরস্কার ও সরাসরি নিন্দার অবকাশ নেই। তাঁর সময়কার লোকেরা জীবনের প্রথম থেকে সর্বক্ষণ তাঁকে লক্ষ করেছে। তিনি তাদের দেব-দেবীর নিন্দা করতেন। তাদের তাঁর সাথে আত্মীয়তা ছিল, সামাজিক ও গোত্রীয় বন্ধন ছিল। মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে বহু বিষয় তাদের বিপক্ষে বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তাঁরা রাসূল (সা)-এর আনুগত্যে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীর যোগ্য কে, তাঁরা না আমরা ?

—মাকালাতে হিকমাত, দাওয়াতে আবদিয়ত, ৭ম খণ্ড

**৬৩. লোকরা গাফুরুর রাহীম-এর অর্থ বুঝতে ভুল করেছে।**

আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম, তওবা ইস্তিগফার করে নেব আর গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু পার্থিব লাভ অর্থাৎ গৃহ নির্মাণ বিনা ঘুষে সম্ভব নয়। ঘুষ ছাড়া তাৎক্ষণিক

উপকার অসম্ভব আর ক্ষতি দৃশ্যত অপূরণীয়। সুতরাং যে ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব তা স্বীকার করে ঘুষ নেয়া বাঞ্ছনীয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেব।

বন্ধুগণ! উপরোক্ত সংলাপ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, নফ্‌স অকল্যাণকে কিভাবে কল্যাণের ভঙ্গিতে, মঙ্গলের আকৃতিতে রঞ্জিত করে পেশ করে। কিন্তু শয়তানের এ সর্বনাশা শিক্ষার দৃষ্টান্ত সে প্রসিদ্ধ ঘটনায় প্রণিধানযোগ্য—একব্যক্তি তার তোতা পাখিকে دریں چه شك 'এতে কি সন্দেহ' ফার্সী গদ শিখিয়েছিল। এখন প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে সে একই বুলি আওড়ায়। বস্তুত বাক্যটিও এমনি প্রকৃতির যে, অধিকাংশ প্রশ্নের জবার হতেও পারে। সুতরাং বেচার জন্য সে ব্যক্তি পাখিটি বাজারে নিয়ে দাবি করল—আমার তোতা ফার্সী কথা বলে। এক ব্যক্তি পরীক্ষামূলক কয়েকটি প্রশ্ন করে, জবাবে সে دریںچه شك (এতে কি সন্দেহ) বুলিই আওড়িয়ে যায়। বলা বাহুল্য, প্রশ্নগুলি ছিল এমন ধরনের যার জবাবে উক্ত বাক্যের প্রয়োগ শুদ্ধ ছিল। প্রশ্নকারী খুশি হয়ে ক্রয় করে পাখীটি বাড়ি নিয়ে যায়। এখন এদিক সেদিকের যত কথাই সে জিজ্ঞেস করে পাখির জবাব একই 'দরীঁ চে শক'। কথাটা ঐ ক্ষেত্রে খাটুক আর নাই খাটুক সে একই কথা বলতে থাকে। সে লোক এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বলল, দুঃখ—তোকে খরিদ করাটাই আমার বোকামি হয়েছে। এর জবাবেও তোতার একই কথা—'দরীঁ চে শক'—এতে কি সন্দেহ। আমাদের নফ্‌সও তদ্রূপ একটি বুলি মুখস্থ করে সর্বত্র চালিয়ে দিচ্ছে—'আল্লাহ গাফুরুর রাহীম'। আল্লাহ্‌র হক কিংবা বান্দার হক গুনাহ যে জাতেরই হোক কথা তার একই। দ্বিতীয়ত, এ আহমকদের এ-ও জানা নেই যে, আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম হলেই পাপের সাজা না হওয়া কি করে অনিবার্য হয়? গাফুরুর রাহীম হওয়ার জন্য তাই যদি জরুরী হয়, তবে আল্লাহ্ পাক আখিরাতে যেরূপ গাফুর ও রাহীম, দুনিয়াতেও তো তিনি তাই। কেননা আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণ চিরন্তন। সুতরাং গাফুর ও রাহীম হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, যা মনে চায় তাই কর—ক্ষতির কোন আশংকা নেই, তাহলে বিষ খেলে তার ক্রিয়া না হওয়া উচিত। অথচ তা অনিবার্যরূপে হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ গাফুর (ক্ষমাশীল) ও রাহীম (দয়ালু) হওয়াতে কোন ব্যাঘাত পড়ে না। তদ্রূপ আখিরাতেও তিনি গাফুর ও রাহীম হবেন আর গুনাহ্‌র সাজাও হবে। কারণ গাফুরুর রাহীম হওয়ার জন্য পাপের সাজা না হওয়া অনিবার্য নয়। আল্লাহ্ রাহীম তথা দয়ালু এ অর্থেও যে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

ولا تقربوا الزنا এবং لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى انه كان فاحشة

অর্থাৎ "বেহুঁশ অবস্থায় নামাযের নিকট যাবে না এবং যিনার ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না, এসব বড় অশ্লীল কাজ।" এটা তার পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি স্বয়ং কল্যাণধর্মী বিধান রচনা করে সবার সামনে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, কল্যাণ ও সন্তুষ্টির পথ এটাই। নতুবা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির রাস্তা জেনে নেয়ার দায়িত্ব মূলত ছিল আমাদের ওপর। অধিকন্তু মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর সন্তুষ্টির পথনির্দেশের সাথে জননিরাপত্তামূলক বিষয়ও শিখিয়েছেন। এছাড়া রহীম শব্দের আরো বহু অর্থ রয়েছে যা আমি পরে উল্লেখ করব। সাজা-শাস্তির পর মাফ করে দেয়াও ক্ষমার অর্থবোধক। প্রশ্ন হতে পারে—সাজার পর ক্ষমা এ দুয়ের সমাবেশ কেমন যেন অযৌক্তিক কথা এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্যও বিদ্যমান। উত্তরে বলব—বন্ধুগণ ! আপনারা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব আর গুনাহ্‌র রহস্য কোনটাই যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি। তাই শুনুন, গুনাহ্ বা পাপ বলা হয় প্রভুর অবাধ্যতাকে। অতঃপর প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব অনুসারে অপরাধের মাত্রা নির্ণিত হয়। যেমন জেলা প্রশাসকের হুকুম অমান্য করা অপরাধ ঠিকই কিন্তু বড়লাটের অবাধ্যতা তদপেক্ষা বড় অপরাধ। সম্রাটের হুকুম অমান্য তার চাইতেও মারাত্মক অপরাধ। অনুরূপ বড় ভাইয়ের হুকুম অমান্য করা অন্যায় কিন্তু পিতার অবাধ্যতা আরো বড় অন্যায়। মোট কথা, মালিক বা প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব অনুপাতে অপরাধের মাত্রা ধার্য হয়। আমার কথার একাংশ তো এই। দ্বিতীয় অংশ হলো—আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা। কারণ অন্যদের বড়ত্ব সীমিত আকারের অথচ আযমতে ইলাহী তথা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব অসীম, অকল্পনীয়। তৃতীয়ত, অপরাধ অনুপাতে সাজা হবে এটা সর্বজনস্বীকৃত। তাহলে এখন বুঝুন, আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। তাই তাঁর অবাধ্যতার চেয়ে বড় অবাধ্যতা আর কিছুই হতে পারে না। অতএব, তাঁর অবাধ্যতার সাজার অধিক সাজা অন্য কারো অবাধ্যতায় না হওয়াই যথার্থ। পায়রুল্লাহ্‌র বড়ত্ব যেহেতু সীমিত পর্যায়ের, কাজেই তার অবাধ্যতার সাজাও সীমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্বের মালিক—অতএব, তাঁর অবাধ্যতার শাস্তি অসীম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এ যুক্তির দাবি হলো, নাফরমানী যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র তাই কারো দ্বারা সগীরা বা ছোট গুনাহ্ সংঘটিত হলে তার সাজা ক্ষমাহীন চির জাহান্নাম হওয়াই ছিল যুক্তিসঙ্গত। অথচ কাফির-মুশরিক ব্যতীত অন্য কারো জন্য চির জাহান্নাম নির্ধারিত নয়। সুতরাং গুনাহর সাজা দশ হাজার কিংবা দশ লাখ বছর ভোগ করার পরও যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মাগফিরাত তথা ক্ষমা হিসেবে গণ্য হবে কি-না ? অবশ্য অবশ্যই এটা তাঁর ক্ষমা ও দয়া। দুনিয়ার

মামলা-মোকদ্দমার ঘটনা প্রবাহে আমরা প্রত্যহ লক্ষ করি—দশ বছর কারাযোগ্য অপরাধীকে দুবছর দণ্ডভোগের পর মুক্তি দেয়া হলে তা বিচারকের বিরাট দান ও অনুগ্রহ বলে গণ্য করা হয়। যদি তাই হয়, তবে আল্লাহ্ সীমাহীন, চিরন্তন আযাবের পরিবর্তে সাজার সময়সীমা সীমিত করে দশ হাজার বা দশ লাখ বছর পরও যদি মুক্তি দান করেন, এমতাবস্থায় অবশ্যই এটা তাঁর মাগফিরাতেরই পর্যায়ভুক্ত। বিষয়টা এতক্ষণে হয় তো আপনাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে থাকবে যে, গাফুর তথা ক্ষমাশীল হওয়ার জন্য শাস্তিদানে বিরত থাকা অনিবার্য নয়। বরং নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত সাজা ভোগের পর মুক্তি দেয়াও ক্ষমাশীল হওয়ার অর্থ প্রকাশ করে। এর অপর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, পাপাচারের সাথে সাথেই পার্থিব জীবন-সীমায় প্রকাশমান তাৎক্ষণিক দণ্ড দান না করা। একে তাঁর রহমত বা দয়াও বলা যায়। রাহীমের দ্বিতীয় অর্থ শুনুন। এটা সবার জানা কথা যে, ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কারামুক্তিই বড় কথা, তাকে পুরস্কার দেয়ার কোন নিয়ম নেই, এর হকদারও তাকে কেউ মনে করে না। তাহলে জাহান্নামের কারাগার থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সুখে-দুঃখে যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়াক, বান্দাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া মহান আল্লাহ্‌র হক ছিল। কিন্তু তিনি রাহীম-দয়াবান তাঁর অনুগ্রহের চিরন্তন আকর্ষণে বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে ঠাঁই দিয়েছেন, যাতে এমন সব সুখের আয়োজন যা কখনো কেউ চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি, এমনকি অন্তরে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فيها مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

(অর্থাৎ জান্নাতে এমনি অফুরন্ত সুখের আয়োজন রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি, এমনকি কোন মানব অন্তর কল্পনাও করতে সক্ষম নয়।

অতঃপর অপরাধ ক্ষমা করে বান্দাকে তিনি নৈকট্য দান করেন। কারো সাথে সপ্তাহে, কারো সাথে মাসিক আবার কারো সাথে বছরান্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা নির্ধারিত থাকবে। সকাল-সন্ধ্যা দৈনিক দু'বার সাক্ষাত লাভে ধন্য ব্যক্তিই হবে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় বান্দা। অধিকন্তু আগন্তুকের প্রতি সালামের নির্দেশ ঘোষিত না হয়ে হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বরং সকল মানুষকে জান্নাতের বাগানে একত্র করে স্বয়ং নূরে ইলাহী বিকশিত হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কালামে রাব্বানী উচ্চারিত হবে السلام عليكم (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। সুতরাং সাধ্য থাকে তো কেউ অপরাধীর সাথে এ ধরনের অনুগ্রহভরা আচরণের নযীর উপস্থাপন করুক। অতএব আপনাদের লক্ষ করার মত ব্যাপার হলো—আল্লাহ কি পরিমাণ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য

বান্দাদের প্রতি স্বয়ং সালাম পাঠাবেন, অতঃপর তাদেরকে নিজের প্রতি আহ্বানের পরিবর্তে নিজেই আগমন করে নূরের তাজাল্লীন বিকশিত করবেন। একবাক্যে সবার কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হবে ঃ

امروز شاہ شہان مہمان شدست مارا

—শাহানশাহ-রাজাধিরাজ এখন আমাদের মেহমান।

তাই রহমতের অর্থ আপনাদের পরিষ্কার হওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাদের উপলব্ধি হলো অনুগ্রহের জন্য জরুরী নয় যে, অপরাধের সাজাই না হোক। এ জাতীয় মানসিকতা নফসের প্রবঞ্চনা ভিন্ন কিছুই নয়। একেই বলা হয়— كلمة حق اريد بها الباطل —অর্থাৎ সত্য ভাষণের অসৎ উদ্দেশ্য। তাই আমি বলি—মানব প্রবৃত্তি বা নফ্স কল্যাণের আবরণে অকল্যাণ ডেকে আনে।

—ওয়ায—ওয়াহদাতুল হুব্ব, ৫ম পৃ., দাওয়াতে আবদিয়াত, ৮ম খণ্ড

৬৪. মূর্খ ওয়ায়েযদের বিভ্রান্তিকর ওয়ায।

ইল্মহীন মূর্খ ব্যক্তির ওয়ায করা অনুচিত। এতে কয়েক প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। প্রথমত এটা হাদীসের পরিপন্থী। কেননা যেকোন কাজ যোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ। তিনি বলেছেন ঃ

اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তির ওপর কার্যভার ন্যস্ত হওয়া শুরু হলে কিয়ামতের অপেক্ষা কর। বোঝা গেল অযোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পণ এত গুরুতর অন্যায় যে, এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং ব্যক্তির আওতাধীন যে কাজ কিয়ামতের আলামতভুক্ত তা গুনাহ্ ও নিন্দনীয়। বলা বাহুল্য, মূর্খ জাহেল ওয়ায করার যোগ্য নয়। এ কাজ যোগ্য ও বিজ্ঞ আলিমগণের। কাজেই অ-আলিমকে এ কাজের অনুমতি দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে অনেক সময় কোন মাসআলায় অজ্ঞতার দরুন এমন সব ভুল-ভ্রান্তি আনাড়ি লোক দ্বারা ঘটে যায়, যা সে ধারণাই করতে পারে না। কেউ হয় তো সতর্ক থাকে। কিন্তু নিজ জ্ঞানের পরিধি অনুপাতেই তো মানুষ হুঁশিয়ার থাকতে পারে ? আর অপরিপক্ব জ্ঞানের দরুন ভুলের সম্ভাবনা লেগেই থাকে। উপরন্তু এহেন ব্যক্তির ওয়ায শুনে সাধারণ লোকেরা আলিম মনে করে মাসআলা-মাসায়েল তার কাছে জানতে চাইবে। কিন্তু আজকাল এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে, যে নিসংকোচে প্রকাশ করবে—আমি আলিম নই,

মাসআলা আমার জানা নেই। অবশ্যই বানিয়ে চড়িয়ে জবাব দেবে আর অধিকাংশই হবে ভুল-ভ্রান্তি ভরা। আর অস্পষ্ট জবাব দ্বারা যদিও সে ভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তাতেও জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে প্রবল। কোন কোন জাহেল অজ্ঞাত মাসআলার এমন চাতুর্যপূর্ণ জবাব দেয় যা দ্বারা সঠিক জবাবও জানা যায় না এবং তার অজ্ঞতাও ধরা পড়ে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গাংগুহতে জনৈক মূর্খ লোক ফতোয়া দিয়ে বেড়াত। মাওলানা গাংগুহী (র)-এর তখন যৌবন বয়স। পরীক্ষামূলকভাবে তাকে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ গর্ভাবস্থায় স্বামীহারা রমণীকে বিয়ে করা কেমন ? সে উত্তর দিল ঃ "যেমন ঘেরাও দেয়া।" এহেন চাতুর্যপূর্ণ অস্পষ্ট জবাব দ্বারা না তার মূর্খতা প্রকাশ পেল, আর না বৈধতার ফতোয়া হলো। কিন্তু সাধারণ লোকরা এর দ্বারা কি বুঝবে ? নিশ্চয়ই ভ্রান্তিতে পতিত হবে। কোন মূর্খ ওয়ায়েয সম্ভবত বলবে—আজকাল উর্দূ ভাষায় মাসআলার যথেষ্ট কিতাব রয়েছে, তাই দেখে আমরা ফতোয়া দেব। জবাবে আমার কথা হলো—কোন কোন মাসআলা একাধিক অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক অধ্যায়ে তা শর্তহীন বর্ণিত হয়েছে, অপর অধ্যায়ে শর্তযুক্তভাবে। অধিকন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব শর্ত এত সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত যে, জাহেল তো দূরের কথা অভিজ্ঞ আলিমের দৃষ্টি পর্যন্ত ততদূর গড়ায় না। এর ফলে কোন সময় মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন কোন অবিজ্ঞ, অদূরদর্শী মৌলভী ওয়াযের মধ্যে বলে থাকে—আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রিয্কের ওয়াদা রয়েছে কিন্তু মুসলমানরা এর ওপর ভরসা না করে ঘাবড়ে যায়। এ ব্যাপক বিষয়টির আলোচনাপর্বে মানুষের ঈমানের দুর্বলতার একচেটিয়া হুকুম জারি করে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন—কোন মানুষ দাওয়াত দিলে তার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে সে বেলার খোরাক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায় অথচ আল্লাহ্র ওয়াদার প্রতি লোকদের আস্থা নেই। অতএব সে অবিজ্ঞ মৌলভীর উত্তমরূপে জানা উচিত যে, এটা ঈমানের দুর্বলতা নয় বরং মানসিক দুর্বলতা। বস্তুত ঈমানের দুর্বলতা এক জিনিস আর মানসিক দুর্বলতা ভিন্ন জিনিস। আল্লাহ্র ওয়াদায় বিশ্বাস রাখে না এমন কোন মুসলমান থাকতে পারে না। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বর্ণিত দৃষ্টান্ত নিতান্ত ভুল এবং আল্লাহ্র ওয়াদাকে মানুষের ওয়াদার সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। কারণ দাওয়াতকারী ব্যক্তি নির্ধারণ করেছেন যে, আমার ঘরে অমুক বেলার দাওয়াত। যদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, সে বেলা আমার খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ নির্দিষ্ট ওয়াদা পাওয়া গেলে মানুষের ওয়াদা অপেক্ষা তাঁর ওয়াদার প্রতি মুসলমানদের ভরসা অত্যধিক প্রবল হতো। কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াদা এরূপ নির্দিষ্ট নয় যে, দুই বেলাই

দেব, এক পোয়া পরিমাণ দেব এবং বন্ধ করা হবে না। বরং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দেয়া হয়েছে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ওয়াদা যে, "আমি রিযক দেব।" এর অবস্থা ও পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। সম্ভবত তৃতীয় দিন পাওয়া যেতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র ওয়াদায় অস্পষ্টতা বিদ্যমান অথচ বান্দার ওয়াদা সন্ধ্যাবেলার নির্দিষ্ট সময়ে। সুতরাং মনের এ বিচলিত ভাব ঈমানী দুর্বলতাভিত্তিক নয়; বরং এর অবস্থা ও পরিমাণ জানা না থাকার দরুন। যার কারণ হলো—নিছক মানসিক দুর্বলতা। দাওয়াতকারীর ওয়াদাও এ ধরনের হলে এর চাইতে অধিক বিচলিত হওয়া বিচিত্র ছিল না। অতএব কত বড় অন্যায় কথা যে, অভিযোগকারীরা ঈমানী দুর্বলতার অভিযোগই দাঁড় করিয়েছে।

—ওয়ায—শাবান, ১৪৮ পৃ., দাওয়াতে আবদিয়াত, ৮ম খণ্ড

প্রসঙ্গত আরেকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। যেমন—এক জাতীয় দু'টি বস্তু পারস্পরিক কম-বেশির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। যথা—রূপার বিনিময়ে রূপা, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ খরিদকালে উভয়দিকে সমান সমান হওয়া অনিবার্য, কম-বেশির তারতম্য হারাম। এখন মূর্খরা মাসআলা এভাবেই বর্ণনা করবে। সময়ে এমনও হতে পারে যে, রূপার দাম সমান না হয়ে বরং দশ আনা তোলা বিক্রি হবে। এমতাবস্থায় এক টাকার বিনিময়ে টাকার ওজন অপেক্ষা অধিক রূপা পাওয়া যাবে। অথচ তাদের কেবল এতটুকু মাসআলাই জানা আছে যে, এক জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে তারতম্য হারাম। এমতাবস্থায় নিজেরাই হয় তো টাকার সমপরিমাণ রূপাই কিনে আনবে আর আত্মীয়দের সামনে বোকা সাজবে অথবা অপরকে এতে বাধ্য করবে। উভয় অবস্থায় শরীয়তের প্রতি কলংক আরোপের কারণ ঘটাবে যে, মাসআলা তো বেশ খাসা যে, একটা জিনিস টাকার বিনিময়ে টাকার ওজন অপেক্ষা পরিমাণ বেশি পাওয়া যায় কিন্তু শরীয়ত বলছে বেশি নেয়া চলবে না, সমান নিতে হবে। তাহলে এ সমস্যা সৃষ্টি হল মূর্খতার দরুন। কোন বিজ্ঞ আলিম এ মাসআলা বর্ণনার সাথে সাথে এ কথাও বলে দিবে যে, এক টাকার বিনিময়ে রূপা যদি ওজনে টাকা অপেক্ষা পরিমাণে বেশি পাওয়া যায়, তবে টাকার বিনিময়ে রূপা কিনবে না, বরং টাকা ভাঙ্গিয়ে সিকি-দোআনী এবং কিছু পয়সা এর সাথে মিলিয়ে তবে খরিদ করবে।

এখন এক টাকার বিনিময়ে জায়েয পন্থায় এক তোলার অধিক রূপা নিয়ে আসবে। কারণ রিজগারী জড়িত চান্দীর বিপরীত সমপরিমাণ চান্দী হল, বাকী চান্দী পয়সার বিনিময়ে গণ্য হবে। চান্দী আর পয়সার মধ্যে 'জিন্‌স্‌' তথা জাতের

বিভিন্নতার কারণে কম-বেশির তারতম্য জায়েয। এটা ছিল মানুষকে অসুবিধায় ফেলা না ফেলার উদাহরণ। এবার শর্ত আর শর্তমুক্তের দৃষ্টান্ত শুনুন। যেমন ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ اختیاری শব্দটিকে "কিনায়া তালাক" অধ্যায়ে বর্ণনা করত এর হুকুমে বলেছেন—এক্ষেত্রে তালাক হওয়া না হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এ দ্বারা দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, اختیاری শব্দের অন্তরালে তালাকের নিয়ত বিদ্যমান থাকা মাত্রই তালাক পড়ে যাবে যেকোন ক্ষেত্রে। কিন্তু "তালাকে তাফ্বীয" অধ্যায়ে বর্ণিত একই اختیاری শব্দ দ্বারা তালাক হওয়ার আরো একটি শর্ত রয়েছে। তাহ্লো—তাফবীযের ক্ষেত্রে اختیاری শব্দ উচ্চারণ দ্বারা নিয়ত থাকা সত্ত্বেও তালাক হবে না যদি না স্ত্রী এখানে একই মজলিসে তালাক কবূল করে। অর্থাৎ, স্ত্রীর কবূলের শর্তে এখানে তালাক হবে। ফকীহ্গণ বিবাহিতা স্ত্রীর ইখতিয়ারের শর্ত 'কিনায়া' অধ্যায়ে নয়; বরং 'তাফবীয' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং 'তাফবীয' অধ্যায় অধ্যয়ন ছাড়াই কেবল 'কিনায়া' অধ্যায়ে اختیاری শব্দ দেখা মাত্র স্বামীর নিয়তের উপর ভিত্তি করে কারো পক্ষে তালাকের ফতোয়া চালিয়ে দেয়া নিতান্ত ভুল সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে কোন কোন আলিম পর্যন্ত ভুল করে ফেলেছেন। আল্লামা শামী উক্ত মাসআলায় ভুল ফতোয়া দানকারী জনৈক ফিকাহ্বিদের ত্রুটি নির্দেশও করেছেন। তদুপরি কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয়—এক মাসআলা এক কিতাবে শর্তহীন, অন্য কিতাবে শর্তযুক্ত বর্ণিত থাকে। কাজেই ফিকার মাসআলাতে শুধু এক কিতাব পড়ে নয়, বরং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন কিতাব দেখে শুনে ফতোয়া দেয়া মুফতীর জন্য বিশেষ জরুরী। মোট কথা, ফিকাহ্ এক জটিল ও সূক্ষ্মতম বিষয়। অনভিজ্ঞ মূর্খ ওয়ায়েয অবশ্যই এতে ভুল করে বসবে। বিষয়টা পরীক্ষা করার সহজ উপায় হলো—কোন জাহেল ওয়াযকারীর ওয়াযের সময় কোন আলিমকে পর্দার আড়ালে দু-চারবার বসিয়ে রাখুন। 'দু-চারবারের' কথা এ জন্য যে, একবারের ভুল থেকে সে সম্ভবত বেঁচেও যেতে পারে কিন্তু প্রত্যেকবার জান বাঁচানো মূর্খের পক্ষে কঠিন। অতঃপর আলিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন কত ভুল যে সে করেছে। ইনশাআল্লাহ্ এভাবে আশা করি তার স্বরূপ ধরা পড়বেই। তাই আমি বলি—এ কাজ অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা অনুচিত। অবশ্য আলিমের ভুল হয় না এরূপ দাবি আমি করি না। তিনিও মানুষ, ভুল-ত্রুটি তাঁর পক্ষেও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর ভুলের পরিমাণ হবে অল্প এবং সাধারণ পর্যায়ের। মারাত্মক ধরনের এবং অধিক পরিমাণে ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকা আলিমের পক্ষেই স্বাভাবিক। হয় তো তিনি শতকরা দু-একবার ভুল করতে পারেন কিন্তু জাহেলের ওয়াযে ভুল হবে পদে পদে। অধিকন্তু আলিমের পক্ষে সংশোধন করত অন্য কোন

ওয়াযে শুধরে দেয়াও সম্ভব। কিন্তু জাহেল ব্যক্তির আপন ভুলের অনুভূতিই থাকে না, শোধরানো তো দূরের আশা। অতএব জাহেলের অবস্থা বড় মারাত্মক, বড় ভয়াবহ। একথা উত্তমরূপে বুঝে নিন।

জনাব, আপনাদের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমার আছে বলেই বলি—অযোগ্য ব্যক্তিকে ওয়াযের অনুমতি ও সুযোগ না দেয়া উচিত। আল্লাহ্র কসম! মূর্খতার অশুভ পরিণাম সমাজ দেহে আজ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কানপুরের ঘটনা, সেখানকার এক ব্যক্তি সর্বাঙ্গদোষী একটি খাসী কুরবানী দেয়। লোকজন বলল—মিয়া এ ধরনের কুরবানী তো জায়েয নয়। সে বলল—বাহ্, আমার বিবি সাহেবা যে ফতোয়া দিয়েছেন জায়েয। অতঃপর সে স্ত্রীকে যেয়ে বলল—মানুষ তোমার ফতোয়া ভুল বলে। স্ত্রীর "শরহে বেকায়া'র উর্দূ তরজমা পড়া ছিল, তাই কিতাবখানা বাইরে পাঠিয়ে বলল—দেখুন, এতে লিখা রয়েছে কোন অংগ এক তৃতীয়াংশের কম কাটা থাকলে সে জন্তুর কুরবানী জায়েয। আর আমার খাসীর কোন অংগই এক তৃতীয়াংশের বেশি কাটা নয়, বরং কমই। যদিও সমষ্টিগতভাবে বেশিই ছিল। এ অযৌক্তিক কাণ্ডের কোন ঠাঁয়-ঠিকানা আছে কি ? শরহে বেকায়ার অনুবাদ পড়েই মেয়ে মানুষ মুফতী হয়ে গেছে। —ওয়ায—আল হুদা ওয়াল মাগফিরাত, পৃ. ৪০

## ৬৫. দীনের প্রত্যেক কাজে জনসাধারণের দলীল তালাশ করা নিতান্ত ভুল।

মাওলানা থানভী (র) বলেছেনঃ ভক্তি-বিশ্বাসের উপর যাবতীয় কাজ-কারবার নির্ভরশীল। লক্ষ্য করুন, বাবুর্চি খানা পাক করে সামনে হাজির করে। আর সেই খানা শুধু তার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে খেয়ে নেয়া হয়। অথচ খাদ্যে বিষ মিশানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া চলে না। অনেক সময় এরূপ ঘটেও। অথচ সর্বক্ষেত্রে এর কোন আশংকাই করা হয় না। একইভাবে কর্মচারীর প্রতি বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বণিক সম্প্রদায়ের কোটি কোটি টাকার কারবার চালু রয়েছে। অথচ কোন কোন সময় কর্মচারীরা বহু মাল আত্মসাৎও করে ফেলে। তদ্রূপ কর্মচারী দ্বারাই রাজার রাজত্ব চলে। দীনের যাবতীয় কার্যকলাপও তদ্রূপ ভক্তি-আস্থার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। যেমন—কুরআন শরীফকে কুরআনরূপে স্বীকার করা আলিমের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানের আলিমদের বিশ্বাস পূর্ববর্তী আলিমগণের উপর, তাঁদের আস্থা সাহাবা কিরামের উপর। আর সাহাবীগণ আস্থা রেখেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর। সুতরাং প্রমাণ হল—দীনী হোক কিংবা দুনিয়াবী যাবতীয় কার্যকলাপ ভক্তি-বিশ্বাস এবং পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে সম্পাদনশীল। অতএব প্রত্যেক দীনী বিষয়ে জনসাধারণের

প্রমাণ তালাশ করা ভুল।

—মাকালাতে হিকমত, ১নং, দাওয়াতে আবদিয়ত, ৮ম খণ্ড

### ৬৬. "আমলের ভিত্তিতে নয় মহানবী (সা)-এর জান্নাতে প্রবেশ হবে রহমতের ভিত্তিতে" এর উপর সন্দেহের জবাব।

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমল দ্বারা জান্নাতে যাবেন না" একথা শুনে কারো এরূপ মনে করা সমীচীন নয় যে, তাঁর আমলে ত্রুটি ছিল। বস্তুত ব্যাপার হল—আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করা উচ্চমানের নয়; বরং রহমতের অসীলায় জান্নাতে প্রবেশ মূলত মানগত দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরের! কারণ "ফলাফল কারণের অধীন"—এ মূলনীতির প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ উপায়ের প্রতিফল অপূর্ণ আর সম্পূর্ণ কারণের পূর্ণাঙ্গ ফল পাওয়া বিধান সম্মত কথা। এ-হল বিষয়ের একাংশ। দ্বিতীয় অংশ হল—আল্লাহর রহমতের যে যত অংশই লাভ করুক তা সীমাহীনই হবে। অন্তহীনের অর্ধাংশও অসীম। আল্লাহ্‌র রহমত অবিভাজ্য, কিন্তু কোনও পর্যায়ে এর কাল্পনিক বিভক্তি মেনে নিলেও তার অসীমত্ব বিনষ্ট হবার নয়। কেননা অংশের সসীমতা স্বীকৃতির দরুন সমষ্টির সসীমতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অধিকন্তু এ স্বীকৃত বিধান যে, সসীম সমন্বিত সংযোজনের প্রতিফল সীমিত ও গণ্ডিভুক্ত হয়ে থাকে। অতএব অসীমের অর্ধাংশও অন্তহীন। ইতিপূর্বে ভূমিকার প্রথম পর্বে আমি বলেছি যে, ফলাফল কারণের অধীন। অর্থাৎ, কারণ অসম্পূর্ণ হলে ফলও তাই, আর পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ফল হবে পরিপূর্ণ।

অতএব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জান্নাতী মর্যাদা আমলের ভিত্তিতে নির্ণীত হওয়া অবস্থায় সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক, যেহেতু আমল এক সীমাবদ্ধ বিষয়। পক্ষান্তরে রহমতের ভিত্তিতে হলে রহমত যেহেতু অসীম, কাজেই তাঁর মর্যাদাও হবে অসীম-অনন্ত। কাজেই রহমতের ভিত্তিতে যাওয়াটাই তাঁর পক্ষে অধিকতর মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়।

মোট কথা, তাঁর আমল সসীম বটে, কিন্তু আল্লাহ না করুন, ত্রুটিপূর্ণ নয়। সুতরাং মহানবী (সা)-এর জান্নাত প্রবেশ আমলভিত্তিক না হওয়ায় তাঁর আমলে ত্রুটি থাকা আদৌ অনিবার্য হয় না। উত্তমরূপে বুঝুন, কারো আমল মহানবী (সা)-এর আমল অপেক্ষা উন্নত অথবা সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। তাঁর প্রত্যেক আমল সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও পরিপূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করা যেহেতু সর্বোচ্চ মর্যাদার, তাই আমলকে এর কারণ ও ভিত্তি নির্ধারিত করা হয় নি। উপরন্তু আমল যে প্রকার, যে মানেরই হোক, এর কারণ বা উপলক্ষ হবেই বা কিরূপে ?

কেননা অবশেষে পরিপূর্ণতাও আল্লাহ্র রহমতের আশ্রয়েই অর্জিত হয়। অতএব আমলের পূর্ণতা যেহেতু খোদাই রহমতেরই ফলশ্রুতি, তাহলে বান্দার কৃতিত্ব কি হল, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং আমলের গর্ব করার কারো অধিকার থাকতে পারেনা। লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা কত উচ্চ, তা সত্ত্বেও তিনি বলেন ঃ আমি পর্যন্ত আমলের আশ্রয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তাহলে আমাদের তো কোন কথাই নেই। —ওয়ায-আল-হায়াত, পৃষ্ঠা ১৮

## ৬৭. হযরত ইবরাহীম ( আ ) কর্তৃক জবাইকালে হযরত ইসমাইল (আ)-এর অভিমত চাওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব।

কারো কারো ধারণা মতে জানার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) কর্তৃক "তোমার রায় কি" জিজ্ঞাসিত হয়ে ইসমাঈল (আ) বললেন ঃ يا ابت افعل ما تؤمر অর্থাৎ, হে পিতা! আপনি তা-ই করুন যা আপনার প্রতি হুকুম হয়েছে। এ দ্বারা তাদের মনে ইবরাহীম (আ)-এর অন্তরে বিচলিত ভাব সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। নাউযুবিলাহ! কবি বলেন ঃ

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر

گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

অর্থাৎ পুণ্যাত্মাগণের কার্যকলাপ নিজের সাথে তুলনা করো না, আসল ব্যাপার লিখন পদ্ধতির شیر ও شیر (শের ও শীর—সিংহ ও দুধ) লেখার ন্যায় যদিও তা সমআকৃতির। প্রকৃত অবস্থা হলো—ইবরাহীম (আ)-এর অন্তরে বিচলিত ভাব আদৌ ছিল না। আম্বিয়াগণের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা অকল্পনীয়। কোন কোন যাহিরপন্থীর মতে ইবরাহীম (আ)-এর মানসিকতায় বিচলিতভাব ছিল না সত্য, কিন্তু সে সময় পিতা অপেক্ষা পুত্রের মনোবল অধিকতর সুসংহত ও সুদৃঢ় ছিল যা তাঁদের ماذا ترى (বল তোমার কি মত) এবং افعل ما تؤمر ( নির্দেশিত কাজ আপনি সম্পাদন করুন) পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর দ্বারা প্রকাশ পায়। এরপর এ-ব্যবধানের তত্ত্বমূলক এক জনপ্রিয় আলোচনার তারা প্রয়াস চালায়, যা ইবরাহীম (আ)-এর নিন্দাজ্ঞাপক সুস্পষ্ট সমালোচনার ইঙ্গিতবাহী। এ প্রসঙ্গে তারা বলে—"নূরে মুহাম্মদী (সা) প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দেহে ছিল, যার অবদানে তিনি এমনি সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন যে, নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হন নি। কিন্তু পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের পর সে নূর পুত্র দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং এরি

ফলে তিনি [ইসমাঈল (আ)] এহেন চূড়ান্ত পর্যায়ের মনোবলের অধিকারী হয়ে ওঠেন।"

এই হল তাদের এ সম্পর্কিত তত্ত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা শুনে আমার শরীরের পশম পর্যন্ত শিউরে ওঠে যে, মর্যাদাবান এহেন সম্মানিত পয়গাম্বরের শানে অশোভন উক্তি আর বেআদবীরও একটা সীমা থাকা উচিত। ছুঁড়ে ফেলুন এসব অপব্যাখ্যা, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করুন যতসব প্রলাপোক্তি। কবির কল্পনা এ-ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য ঃ

زعشق نا تمام ما جمال یار مسغنی است

باب ورنگ وخال وخط چه حاجت روئے زیبارا

—বন্ধুর অনুপম রূপ-লাবণ্য আমাদের অসম্পূর্ণ-পঙ্গু প্রেমের মুখাপেক্ষী নয়, বস্তুত সুন্দর মুখের জন্য বর্ণ ও আকার-আকৃতির প্রয়োজন পড়ে না।

মূলত নূরে মুহাম্মদী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আবিষ্কার করা মুখরোচক গল্প আর অলীক কাহিনী বৈ কিছুই নয়। লক্ষ করলে এর দ্বারা মহানবী (সা)-এর শানেও বে-আদবী প্রমাণ হয়। কেননা তাঁর নূর এত ক্ষণস্থায়ী নয়, যার উষ্ণ প্রভাব শীতল হতে পারে। তন্দুর চুলায় আগুন জ্বালালে তার তাপেও ঘণ্টাখানেকের মত চুলা উত্তপ্ত থাকে। তাহলে নূরে মুহাম্মদী কি এতই শীতলধর্মী যে, স্থানান্তরের পরই তার উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? অধিকন্তু এ উত্তাপ চিরদিনের জন্য স্থিতিশীল হওয়ার যোগ্য নয় কি?

সুতরাং কল্পকাহিনী প্রসূত এ পার্থক্য স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। এবার আসুন তাহলে প্রকৃত বিষয়টা আলোচনা করা যাক। মূলত এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল—হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-এর দয়ালু পিতাই কেবল ছিলেন না, সাথে সাথে রূহানী শায়খও ছিলেন। তাই আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে ইসমাঈল (আ)-এর দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই তিনি বলেছেন ঃ فانظر ماذا ترى "চিন্তা করে দেখ তোমার রায় কি?" কিন্তু এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। জবাবে বললেন ঃ

يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ –

—হে পিতা, আপনি কার্যকর করুন যা আপনাকে হুকুম করা হয়েছে, আমাকে আল্লাহ চাহেতো আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

তাঁদের মা'রিফাত ও অধ্যাত্মজ্ঞান-গভীরতার কি কোন সীমা আছে ? কতবড় কঠোর তাওয়াক্কুল যে, আপন শক্তি উপেক্ষা করে এখানেও বলছেন—"ইনশা আল্লাহ্"; উদ্দেশ্য—যদি আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয়। এরি নাম কামাল বা পূর্ণতা। এহেন পুত্র সম্পর্কে বলা হয় ঃ

شا باش آں صدف که چناں پرور د گهر

ابا از ومکرم وابنا عزیز تر

—ধন্য সে ঝিনুক যার মাঝে এহেন মুক্তা লালিত হয় যে, পিতা তার কারণে সম্মানিত আর পুত্ররা মর্যাদাশীল।

এই ছিল এ বিষয়ের মূল তত্ত্ব। যাহোক, ইসমাঈল (আ) সম্মতি জ্ঞাপনের পর ইবরাহীম (আ) জবাই করার উদ্দেশ্যে ছুরি হাতে নিয়ে তাকে মাটিতে শুইয়ে দেন। বস্তুত ইসমাঈল (আ)-এর এ দৃঢ়তা কামালিয়াতের ক্ষেত্রে ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা অধিক নয়। বরং ইবরাহীম (আ)-এর কামালিয়াতই শ্রেষ্ঠ। কেননা অনেককেই আত্মহত্যা করতে শোনা যায় কিংবা দেখা যায়। কিন্তু সন্তান কুরবানীর ঘটনা অশ্রুতপূর্ব। পুত্রের গলায় ছুরি চালানো পিতার পক্ষে অসম্ভব। এখন বলুন, কার দৃঢ়তা অধিক। অতএব লক্ষণীয়, فانظر ماذا ترى-এর ন্যায় দ্ব্যর্থবোধক বাক্য দ্বারা ইবরাহীম (রা)-এর দৃঢ়তার আপেক্ষিক স্বল্পতা প্রমাণের প্রয়াস কত বড় ভুল চিন্তা। নূরে মুহাম্মদী বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন যদি তিনি উৎকণ্ঠচিত্ত হয়ে থাকবেন তাহলে ছুরি চালনাকালে দৃঢ়চিত্ত হলেন কি করে ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূর মুবারকের বরকত এত অসীম যে, ইবরাহীম (আ)-এর দেহ থেকে বিচ্ছিন্নতার পরও তা পূর্বের মতই নূর বিকিরণ করছিল। পার্থিব জগত অতিক্রমের পরও এখানে যেরূপ কিরণ ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা আপনারা হামেশা প্রত্যক্ষ করছেন।

—রূহুল আজ্জ ওয়াস্‌সাজ্জ, পৃষ্ঠা ১৮

৬৮. পীর ধরার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত মাপকাঠি।

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক اتبع سبيل من ناب الى (সে ব্যক্তির পথ অনুসরণ কর যে আমার প্রতি আকৃষ্ট) আয়াতের মাধ্যমে সেসব লোকের সংশোধন করা হয়েছে যারা বুযুর্গ লোকদের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভবই করে না। এ দ্বারা ইত্তেবা তথা অনুসরণের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। আর سبيل من اناب ( খোদাভীরুদের পথ) দ্বারা সে দলের সংশোধন উদ্দেশ্য যারা যে কোন ব্যক্তির ভক্ত হতে আগ্রহী, কিন্তু ইত্তেবার

(অনুসরণ) নির্ভুল মাপকাঠি তাদের জানা নেই। এভাবে আল্লাহ তাদের বিশুদ্ধ মাপকাঠি নির্দেশ করেছেন। নতুবা মাপকাঠির তো আজকাল অভাব নেই। যেমন—কারো মাপকাঠি কাশ্‌ফ-কারামত; তাদের দৃষ্টিতে কাশ্‌ফের অধিকারী ব্যক্তিমাত্রই অনুসরণযোগ্য। কেউ বানিয়েছে কারামাতকে, কেউ 'ওজদ' ও 'সামাকে' আবার কারো মতে 'হারারাত' তথা উষ্ণ আবেগ যার মধ্যে তীব্রভাবে বিদ্যমান, যে ব্যক্তি অধিক ক্রন্দনে অভ্যস্ত, বুযুর্গ সেই লোক। কারো মাপকাঠি 'তাসার্‌রুফাত' তথা একদৃষ্টিতে বেহুঁশ করতে যে সক্ষম সেই লোক বুযুর্গ অতি বড়। কারো মাপকাঠি নিঃসঙ্গতা, বিশেষ পরিস্থিতিতে এর অনুমতি যদিও স্বীকৃত কিন্তু এটা মাপকাঠি নয়। কারো মতে বুযুর্গীর মাপকাঠি কঠোরতা। কাজেই যে লোক ঢিল ছুঁড়ে, পাথর মেরে যুলুম করতে পারে তারই বেশি ভক্ত হয়ে পড়ে আর পীরের বুযুর্গীর জাবর কাটে। একে কাশ্‌ফের অধিকারী মনে করে 'মজযূব' বা আত্মহারা আখ্যা দেয়। তাই 'কাশ্‌ফ' তাদের নিকট কামালিয়াতের বিষয়। অথচ উন্মাদ ব্যক্তির 'কাশ্‌ফ' হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এখানে এক উন্মাদ নারীর 'কাশ্‌ফ' হত, কিন্তু তাকে জুলাপ দেয়া হলে তা শেষ হয়ে যায়। "শরহে আসবাব" গ্রন্থে লিখিত আছে—উন্মাদ রোগে 'কাশ্‌ফ' হতে থাকে। সুতরাং 'কাশ্‌ফ' হওয়া কামালিয়াতের বিষয় নয়। মোট কথা, বুযুর্গীর পরিচিতি না থাকার দরুন বিচিত্র ধরনের মাপকাঠি নিরূপণ করে নেয়া হয়েছে। সাধারণ লোকের তো কথাই নেই বহু ক্ষেত্রে আলিমরা পর্যন্ত তা অবগত নয়।

বহু আলিমকে আমি এ ধরনের লোকের ভক্ত লক্ষ করেছি। আবার কারো দৃষ্টিতে অনর্গল বানোয়াট রটনা রটে যাওয়াই বুযুর্গীর লক্ষণ ও মাপকাঠি। আমাদের এলাকায় এক লোক ছিল, অধিকাংশ জুয়াড়ী তাকে জিজ্ঞেস করত জিতবে কি হারবে। জবাবে সে বিড় বিড় করে কিছু প্রলাপ করত। আর তাদের মহলে কতগুলি সংকেত নির্দিষ্ট ছিল যার আশ্রয়ে সে প্রলাপ দ্বারা তারা নিজেদের মতলব বুঝে নিত। এই হলো মানুষের ভক্তির অবস্থা। কেউ সূফী-রূপ ধারণ করল তো তার সব কথাই বুযুর্গীপূর্ণ। খামুশ থাকলে সে খামুশ শাহ্‌ পদবী প্রাপ্ত হয়। গালি-গালায আর শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তো তাকে 'মজযূব' (আত্মহারা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বুযুর্গী একবার রেজিস্ট্রি হলেই হলো—অতঃপর তমীযা বিবির অযূর ন্যায় তা একদম পোক্ত জিনিস। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তমীযা বিবি নামে জনৈকা পতিতা ছিল। কোনও বুযুর্গ ব্যক্তি নসীহত দান করত অযূ করিয়ে তাকে নামায পড়ান এবং তাকীদ করেন—সবসময় এভাবেই পড়বে। এরপর তিনি বিদায় নেন। দীর্ঘদিন পর উক্ত বুযুর্গের সাথে তার সাক্ষাত হলে তিনি তমীযা বিবিকে জিজ্ঞেস করেন—সে নামায

পড়ে কি-না। সে উত্তর দেয় জী-হ্যাঁ, পড়ি। তিনি পুনরায় বললেন—অযূও কি কর ? উত্তরে সে বলে—অযূ সেদিন আপনি করিয়ে দিয়েছিলেন না ? সুতরাং তার অযূ যেন ছিল একেবারে পাকাপোক্ত, প্রস্রাব-পায়খানা এমনকি কু-কর্মের দ্বারাও নষ্ট হয় না। বর্তমানের বুযুর্গীও তদ্রূপ দারুণ পোক্ত জিনিস। কোন অবস্থাতেই তা নষ্ট হবার নয়। তেমনি নামায না পড়লেও বুযুর্গী ঠিকই থাকে।

মোট কথা, ভক্তি একবার জমে গেলে তা আর নষ্ট হয় না। অবশ্য শরীয়তের কথা বলার দোষে নষ্ট হতে সময় লাগে না। তখন বলতে থাকে—মিঞা, এ লোক তো কট্টর মোল্লা মানুষ, শরীয়তের কথা কয়। কিন্তু শরীয়তবিরোধী কথা বললে, ইসলামবিরোধী আচার-আচরণ করলে সে "মা'রিফাতের সাগর" উপাধি লাভ করে। কোন পাপাচার, কোন গুনাহ তাকে নাপাক করতে পারে না, সে যেন সাগর। তাতে নাপাক-আবর্জনা যতই পড়ুক অপবিত্র তাকে থোরাই করতে পারে কিন্তু সাগর যদি হয় প্রস্রাবের তবুও কি পাক-পবিত্রই থাকবে ? মোট কথা, এদের আপাদমস্তক পায়খানায় ভরা। জনৈক পীর সাহেব তার মুরীদনীর গান শুনতে শুনতে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে পাশবিক উন্মাদনায় দু'য়ে মিলে একাকার হয়ে যায়। বাইরে এসে বলে—"আইল যখন জোশ, রইল না আর হুঁশ।" কিন্তু মুরীদের নিকট তবু সে বুযুর্গই রয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, কি সাংঘাতিক বুযুর্গী! চরিত্র যাই হোক, বুযুর্গের বুযুর্গী অটল।

সার কথা, মুসলমানরা এমন পথ ধরেছে যা সঠিক ইত্তেবা ছিল না, কোথাও যদি হয়েও থাকে তা হয়েছে মাপকাঠিহীন যথেচ্ছভাবে। প্রথমে অভিযোগ ছিল আনুগত্যের। পরে তা হয়েছে বটে কিন্তু মাপকাঠিহীন বিশৃংখল পরিবেশে। সুতরাং কবির ভাষায় ঃ

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی

تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

—অন্যায়-অত্যাচার করার পর তা থেকে বিরত থাকলে আর হলোটা কি জোর জুলুম যা করার তাতো করাই সারা, প্রতিকার করবে কে ?

—ওয়ায– ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ২০

**৬৯. পীর ধরার সঠিক মাপকাঠি।**

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ سبیل من اناب তথা খোদাভীরুদের পথ অনুসরণ কর। অন্ধভাবে যেকোন লোকের অনুসরণ করবে না। কুরআনের বাকমাধুর্য লক্ষ করুন ঃ

واتبع من اناب الى বলা হয়নি। কেননা এতে স্বয়ং সে ব্যক্তির আনুগত্য দাবির সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এজন্য سبيل (সাবীল—পথ) শব্দ যোগ করে واتبع سبيل من اناب الى (খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গের পথ অনুসরণ কর) বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি স্বয়ং অনুসরণীয় নয় বরং তার নিকট পথ রয়েছে, মূলত সেটাই হলো অনুসরণীয়। এই হলো অনুসরণের সঠিক মাপকাঠি। অর্থাৎ যার অনুসরণে তুমি আগ্রহী প্রথম দেখে নেবে সে লোক আল্লাহর পথের অনুসারী কি-না। তাই সঠিক অর্থে যে আল্লাহর পথে চলছে তার পথের অনুসরণ করো। সুবহানাল্লাহ, কি আশ্চর্য মাপকাঠি! সুতরাং অন্যসব পথ বর্জন করে অনুসরণ কেবল উক্ত মাপকাঠি অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মোট কথা, মহান আল্লাহ খোদামুখী হওয়াকেই মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এর অর্থ হলো—আল্লাহ্র হুকুম যথাযথ পালন করা। অতএব তিনি বলেছেন ঃ ويهدى اليه من ينيب অর্থাৎ খোদামুখীর জন্য হিদায়েত অনিবার্য। আমল-আখলাক, যাবতীয় কার্যকলাপ খোদায়ী নির্দেশের ভিত্তিতে পরিমার্জিত হওয়াই হিদায়েতের মূল কথা।

অতএব এর দ্বারা বোঝা গেল—তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লার (খোদামুখী) অর্থ হলো আমলের পরিশোধন। তাহলে من اناب الى -এর অর্থ দাঁড়ায় পরিমার্জিত আমলের অধিকারী ব্যক্তি, কিন্তু ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আমল অসম্ভব।

অতএব আলোচনার সার কথা হলো—সে ব্যক্তির অনুসরণ কর যার মধ্যে আল্লাহর বিধিবিধানের ইলম এবং সে অনুপাতে আমল উভয়টির সমাবেশ ঘটে। তাহলে এখন মৌলিক দু'টি বিষয় লক্ষ করা যায়। (১) দীনি ইলম এবং (২) দীনি আমল। অথচ মানুষ নিজের পক্ষ থেকে যত মাপকাঠিই নির্ধারণ করে রেখেছে তাতে ইলম ও আমল কোনটাই বর্তমান নেই। অধিকন্তু ইলম ও আমলের সাথে তৃতীয় আর একটি বিষয়ের অস্তিত্ব অনিবার্য, তা-হলো তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা। অতএব প্রথমে ইলম এবং তারপর আমল ও একনিষ্ঠতা থাকা চাই। সুবহানাল্লাহ, কি ব্যাপক কথা যে اناب একটি মাত্র শব্দ-গর্ভে ইলম, আমল ও একনিষ্ঠতা বিষয়ত্রয় নিহিত রয়েছে। বোঝা গেল এ-তিনের সমন্বয় সাধিত ব্যক্তিই অনুসরণযোগ্য। —ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ২৮

**৭০. হজ্জের পর কোন কোন লোক চরিত্রহীন কেন হয় ? এর জবাব।**

এ প্রসঙ্গে কথা হলো—হজরে আসওয়াদ এক কষ্টিপাথর , একে ছোঁয়ার পর মানুষের জন্মগত স্বরূপ প্রকাশ পায়, যা তার চরিত্রে লুকানো ছিল। স্বভাবে পুণ্যের

উপাদান মুদ্রিত থাকলে এখন আগের তুলনায় তার অধিক পুণ্যবান রূপান্তর ঘটে। একইভাবে অসৎ কর্মের বীজ যদি নিহিত থাকে, তবে অতঃপর সে অধিক মাত্রায় অসৎকর্মে লিপ্ত হয় এবং তার কুপ্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। দৃশ্যত বহু লোক পুণ্যবান মনে হয় কিন্তু কষ্টিপাথরে ছোঁয়া দিলে তার কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। কবি বলেছেন ঃ

نقد صوفی نه همه صافی وبے غش باشد

اے بساخرقه که مستوجب آتش باشد

خوش بود گر مهك تجربه آید بمیاں

تاسیه روئی شود هر که دروغش باشد

—দরবেশের মুদ্রা মাত্রই নির্ভেজাল নয়, বহু সূফী জাহান্নামের আগুনের যোগ্য। এ পর্যায়ে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরের সামনে আসলেই এদের স্বরূপ ধরা পড়বে, তখন ভেজাল মিশ্রিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে যাবে।

আপনারা হয় তো বলবেন, ভালই হলো, আপনি ভেদের কথা যাহির করে দিয়েছেন, এখন আমরা তাহলে হজ্জেই রওয়ানা হব না। আমি বলব—জী-না জনাব, হজ্জে যান কিন্তু নিখাঁদ হয়ে রওয়ানা দিন। নিন, তার উপায়ও আমি নির্দেশ করে দিচ্ছি, তা-হলো—যাওয়ার আগে কোন সোনারুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। এ প্রসঙ্গে কবির কল্পনা প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন ঃ

کیمیا ئسیت عجب بندگی پیر مغاں

خاك او گشتم وچندیں در جاتم دادند

—সত্য পীরের আনুগত্য বিস্ময়কর স্পর্শমণি, তাঁর সদনে মাটি হওয়া তথা আত্মনিবেদনের ফলে আমাকে তিনি মর্যাদার এহেন উচ্চ স্তরে পৌছে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, মণিকার দ্বারা নেংটিধারী নয়, আমার উদ্দেশ্য বরং রূহানী মণিকার তথা আল্লাহওয়ালাগণ যাদের অবস্থা হলো—

آهن که بپارس آشنا شد

فی الحال بصورت طلا شد

—লোহা স্পর্শমণির সংস্পর্শে আশা মাত্র মুহূর্তে স্বর্ণখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বস্তুত পরশ পাথরের বৈশিষ্ট্য হলো– তার সাথে ছোঁয়া লাগা মাত্র ধাতব লোহা সোনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাস্তবে পরশ পাথরে সে গুণ থাকুক আর নাই থাকুক

কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, তাঁদের সাহচর্যের ফলে "তওবা নাসূহ" অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ তওবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। যার পরিণামে পূর্বকৃত যাবতীয় পাপাচারের আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব কোন আহ্লুল্লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর তোমরা হজ্জে যাবে। তার সাহচর্যে তোমাদের খাঁটি তওবার তাওফীক হবে। বস্তুত তওবার পর গমন করা হলে হজ্জের প্রতিক্রিয়ায় পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সৎকাজের সৌভাগ্য লাভ হয়। আমার উদ্দেশ্য মুরীদ হওয়া নয়, এর প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কিছুদিনের সাহচর্য এবং আন্তরিক সম্পর্কের প্রয়োজন। —মাহাসিনুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৭

## ৭১. "কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা নামাযের বৈশিষ্ট্য, তাহলে এর বিপরীত হওয়ার কারণ কি ?" এ সন্দেহের নিরসন।

নামায আমাদের কোন্ স্তরের তা আমরা লক্ষ করি না। জনাব, আপনাদের নামাযের দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কেউ বলল—আমার একজন লোকের দরকার আর আপনি তার সামনে কেবল হাড়-মাংস বিশিষ্ট এক পঙ্গু-অচল মানুষ এনে হাযির করলেন। এখন সে যদি অনুযোগের সুরে বলে—এ পঙ্গু দিয়ে আমার কি হবে ? জবাবে আপনি বললেন ঃ জনাব, আপনি লোক চেয়েছিলেন এনে দিলাম, দেখুন সে বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী কি-না। বলা হবে—যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসারে এবং সৃষ্টির আদলে সে মানুষ ঠিকই কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য লোক নয়। এর দ্বারা মানব সংক্রান্ত কোন কাজ সম্পাদন অসম্ভব। আমাদের নামাযের অবস্থাও একই রূপ, যার হাত-পা, মাথা-মুণ্ড, চোখ-কান বলতে কিছুই নেই। সূক্ষ্মদর্শী আলিমগণ হাড়-মাংসে গড়া পঙ্গু লোকটিকে মানব কাতারে স্বীকার না করার ন্যায় এহেন নামাযও তাঁদের নিকট স্বীকৃত নয়। কিন্তু ফকীহ্গণ বিবেচনা করলেন—"এ নামায হয় নাই" বলা হলে মানুষের মধ্যে নামায ত্যাগের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা। তাই তাঁরা "একেবারে না হওয়া অপেক্ষা কিছু হওয়া উত্তম"—প্রবাদ সূত্রের প্রেক্ষাপটে এর বিশুদ্ধির হুকুম লাগিয়েছেন। কিন্তু পঙ্গু-অক্ষম লোকটিকে বাকশক্তি এবং কেবল প্রাণ থাকার ভিত্তিতে আপনাদের মানুষ স্বীকার করার ন্যায় এ নামায বিশুদ্ধ হওয়ার হুকুম। কাজেই আপনাদের নামাযও তদ্রূপ কেবল পারিভাষিক ও আক্ষরিক অর্থে নামায, প্রকৃত নামায নয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, বেকার মনে করে আর পড়বেনই না। জি-না জনাব, একেবারে মূল্যহীন এটুকুও নয়, অন্তত না হওয়া অপেক্ষা কিছু তো হলো। কেননা রহমতের নযর পড়ে গেলে আল্লাহ্র নিকট বন্দেগীর শুধু আকার-

আকৃতিটুকুই গৃহীত হয়ে যায়। এ জাতীয় নামায সম্পর্কে মাওলানা রূমীর দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

این قبول ذکر تو از رحمت است

چوں نماز مستحاضه رخصت است

—নামাযের মধ্যে অপবিত্র রক্তের প্রবাহ সত্ত্বেও 'মুস্তাহাযা' নারীর নামায শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বীকৃত, আমাদের নামাযের অবস্থাও তদ্রূপ যে, প্রকৃতপক্ষে তা প্রাণহীন-শূন্যগর্ভ, কিন্তু কোন কোন সময় কেবল আল্লাহর রহমতে এটাও কবূল হয়ে যায়।

তদুপরি কোন সময় এমনও হতে পারে যে, ধীরে ধীরে ত্রুটিপূর্ণ এ নামাযই একদিন প্রকৃত নামাযের রূপ নেয়া বিচিত্র নয়। যেমন কোন কোন ছাত্র লেখাপড়ায় অমনোযোগী, পড়াশুনায় আগ্রহ কম, কিন্তু দয়াশীল ওস্তাদ তাকে মকতব থেকে বের করে দেন না। তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত ক্ষেত্রে ছেলেটি যদিও অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় মনোযোগী নয় কিন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে সে আগ্রহের সৃষ্টি অসম্ভব নয়। আর বাস্তবে এ-জাতীয় ঘটনা লক্ষও করা যায়। তাই এসব কারণের প্রতি লক্ষ করেই ফকীহ্গণ এ জাতীয় নামায সম্পর্কে বিশুদ্ধতার হুকুম লাগিয়েছেন। বাস্তবিক ফকীহগণের অস্তিত্ব উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। তাই নিজেদের নামাযকে আপনারা একেবারে মূল্যহীন অথবা পরিপূর্ণ কামেল মনে না করাই সমীচীন।

অতএব এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা تنهى عن الفحشاء والمنكر অর্থাৎ "নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে" আয়াতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের মানসিকতা ও চরিত্রে তার প্রভাব স্বভাবত লক্ষ না করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে ?" এ প্রশ্নের জবাব বর্ণিত হয়ে যায় যে, সেটা নিখুঁত (كامل) নামাযের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আপনাদের নামায তদ্রূপ নয়, তাই এর প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। জওশেন্দা চূর্ণ করে সেবনের ন্যায় আমাদের নামাযের আদায় কদর্য পন্থায় তাহলে বলুন, এর উপকার আমাদের ভাগ্যে কিরূপে জুটতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেমনি আমাদের নামায তেমনি তার বারণ। নামায যদি কামেল—ত্রুটিমুক্ত হতো তাহলে যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখা এর পক্ষে বিচিত্র ছিল না। এখন নামায যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ তাই তার বারণও আনুপাতিক হারে স্বল্প মাত্রার। অতএব অভিজ্ঞতার আলোকে অনস্বীকার্য যে, নামাযী ব্যক্তি সাধারণত তুলনামূলকভাবে পাপাচারে কমই লিপ্ত হয়। নিম্নতম লাভ তো এই যে, অন্তত কাফিররা তাকে পথভ্রষ্ট করতে উদ্যত হয়

না। নামাযী ব্যক্তিকে তারা পাকা দীনদার মনে করে কুফরীর দাওয়াত থেকে রেহাই দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা এ ব্যক্তির আমাদের ধোঁকায় পাক খাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত। —ঈওয়াউল ইয়াতামা, পৃষ্ঠা ৬১

**৭২. মি'রাজে আল্লাহ্‌র দীদার লাভ সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব।**

দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শন লাভ করা প্রাকৃতিক নিয়ম ও শরীয়ত উভয় দিক থেকে অসম্ভব। অবশ্য জ্ঞানগতভাবে তা অসম্ভব নয়। কেননা জ্ঞানগত সম্ভবের কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তুত 'নস' ভিত্তিক (কুরআন-হাদীস) প্রমাণ অনুসারে আল্লাহ্‌র দীদার হবে পরকালে।

বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে দর্শন লাভ সম্ভব না হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়, বরং এর কারণ আমাদের পক্ষ থেকেই যে, আমরা তার যোগ্য নই। আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাত সর্বত্র জ্যোতির্ময়, চির উজ্জ্বল, তাঁর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা অকল্পনীয়। এখন هو الظاهر والباطن বাক্য দৃষ্টে কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে—এর দ্বারা বোঝা যায় বাতিন (অস্পষ্ট) আল্লাহ্‌র অন্যতম সিফত এবং তাঁর সত্তায় অদৃশ্যতা বিদ্যমান। অতএব তাঁর মধ্যে "অন্তরায় নেই' মন্তব্য কতটুকু সঙ্গত ? মুহাক্কিক মনীষীবৃন্দ এর জবাবে বলেছেন ঃ 'খেফা' (অন্তরায়)-এর দরুন আল্লাহ্ 'বাতিন' নন, বরং আল্লাহ্‌র সীমাহীন প্রকাশই এর মূল কারণ। পুনরায় প্রশ্ন আসে—তাহলে তো বাতিন না হয়ে তাঁর প্রকাশ হওয়াই উচিত ছিল ? আসল কথা হলো—আমাদের অনুভূতির জন্য তাঁর মধ্যে অন্তরায় থাকা প্রয়োজন। কোন বস্তু আদৌ অদৃশ্য না হলে তাকে অনুভব করা সম্ভব নয়। কারণ আকর্ষণ দ্বারাই বস্তুর প্রতি অনুভূতির সৃষ্টি, আর আকর্ষণের জন্য অন্তরায় প্রয়োজন। সর্বদিক থেকে উপস্থিত বস্তুটির প্রতি আকর্ষণ জন্মে না। এ কারণেই 'রূহ' মানুষের সর্বাধিক নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও একে অনুভব করা যায় না। দেহের শিরা-উপশিরা ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর অবাধ চলাচল। অথচ এর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। কাজেই সীমাহীন প্রকাশের দরুন তিনি বাতিন। সময়ে অন্তরালে চলে যায় বলেই আমাদের চিন্তায় রোদের অনুভব। অনুরূপ অন্ধকারের দরুন আলোর অনুভব আর আঁধারের অপসৃতির নাম আলো। দ্বিতীয়ত, অন্তরায় না থাকাবস্থায় আলোর কোন স্বাদ বা মূল্য থাকে না। রাতের বেলা আলো অদৃশ্য হয় বলেই দিবসের আনন্দ। কবির ভাষায় ঃ

از دست هجر یار شکایت نمی کنم

گر نیست غیبتے نه دهد لذت حضور

—বন্ধুর বিচ্ছেদে আমার কোন অভিযোগ নেই, যেহেতু অদৃশ্যের অবর্তমানে উপস্থিতির কোন স্বাদই পাওয়া যায় না।

মোটকথা, মহান আল্লাহ্ সদা প্রকাশের দরুন আমাদের নযরে অন্তর্নিহিত। আমাদের অনুভূতি দুর্বল যা কেবল সময়ে অদৃশ্য হয় এমন জিনিসের সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে সর্বদিক থেকে প্রকাশ এমন বস্তুর সাথে নয়। অবশ্য আখিরাতে আমাদের অনুভূতি ও বোধশক্তি প্রখরতর রূপ নেবে, ফলে অনাবিল প্রকাশের (ظاهر من كل وجه) সাথেও সে সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। রূহ সেখানে আত্মপ্রকাশ করে আল্লাহ্র দীদারে ধন্য হবে। তখন প্রমাণ হবে যে, অন্তরায় মূলত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, আমাদের পক্ষ থেকেই ছিল। আমাদের চোখের শক্তি ছিল না তাঁকে দেখার, পেঁচা যেরূপ সূর্যের কিরণ সইতে অক্ষম। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবির কল্পনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

شد هفت پرده بر چشم ایں هفت پرده چشم

بے پرده در نه ماهے چوں آفتاب دارم

—চোখের সাত পর্দাই তাঁর দর্শন লাভে অন্তরায়। অন্য কথায় চোখ নিজেই বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে, নতুবা সেদিক থেকে বাধার কিছুই নেই। সূর্য তার আলো ছড়াচ্ছে অথচ তোমার চোখে হাত, তাহলে অন্তরায় তোমারই পক্ষ থেকে, সূর্যকে অন্তরাল বলা যাবে না।

প্রসঙ্গত لا يبقى على وجهه الا رداء الكبرياء (কিবরিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব) পর্দা ব্যতীত তাঁর চেহারায় পর্দামাত্রই বাকি থাকবে না] হাদীসে উল্লিখিত পর্দা খোদাই সত্তার ভেদ-রহস্য উদঘাটনে প্রতিবন্ধক বটে কিন্তু দীদারের পরিপন্থী নয়। আখিরাতে আমাদের শাণিত দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে আল্লাহ্র দর্শন লাভে আমরা ধন্য হব—কথা এটুকুই। এর জন্য খোদার রহস্য জানা নিষ্প্রয়োজন। যেমন এ দুনিয়াতেও আমরা বহু জিনিস দেখতে পাই অথচ তার রহস্য আমাদের অজ্ঞাত।

মোটকথা, পার্থিব জগতে আল্লাহ্র দীদার প্রাকৃতিক কারণেই অসম্ভব। সুতরাং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে— انكم لم تروا ربكم حتى تموتوا (মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের রবকে তোমরা আদৌ দেখতে পাবে না)। তদুপরি কুরআনে মূসা (আ)-এর আবেদনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে—لن ترانى (কখনো তুমি আমায় দেখতে পাবে না)। এখানে লক্ষণীয় যে, তার জবাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে لن ارى -এর স্থলে لن ترانى বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমার পক্ষ থেকে অন্তরায় বলতে কিছুই নেই,

আমি তো এখানেও দর্শনযোগ্য। কিন্তু দর্শন ক্ষমতার অভাবে তোমরাই বরং আমায় দেখতে পাবে না। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌কে দেখেননি এটাই আলিমগণের সর্ববাদীসম্মত অভিমত। কারণ দুনিয়াতে তাঁর দর্শন লাভ করা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী অসম্ভব। অবশ্য তাঁর তাজাল্লী বর্ষিত হয়েছিল আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পর্দা সরানোও হয়েছিল কিন্তু মূসা (আ) দেখার আগেই চেতনা হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য মি'রাজ-রজনীতে মহানবী (সা) আল্লাহ্‌র দীদার পেয়েছিলেন কি-না এ সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-সহ কোন কোন সাহাবা, অধিকাংশ আলিম ও সূফীর মতে রাসূলুল্লাহ (সা) দর্শন করেছিলেন। একই সাথে এ প্রসঙ্গেও সবাই একমত যে, দীদার সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা সূরা নাজমের ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। কারণ— علمه شديد القوى ذو مرة (তাকে শিক্ষাদান করেন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা) আয়াতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের দাবি অনুসারে এর অর্থ হযরত জিবরাঈল (আ)। কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি شديد القوى -এর প্রয়োগ শুদ্ধ নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ অংশটুকু স্মরণ রেখে সামনে চলুন— فاستوى وهو بالافق الاعلى (সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে) আয়াতেও যমীরের (সর্বনাম) প্রত্যাবর্তন জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি। কারণ استوى وهو بالافق। (নিজ আকৃতিতে দিগন্তে স্থিতি)-এর বৈশিষ্ট্য তাঁর সাথেই সংশ্লিষ্ট হতে পারে! অতঃপর— ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى। (অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তার চাইতেও কম।) আয়াতের যমীর সমূহ আল্লাহ্‌র দিকে নয়, জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। অন্যথায় সমজাতীয় যমীরের (সর্বনাম) মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। জিবরাঈলের এ দর্শন ঘটেছিল পার্থিব জগতে। অতঃপর বলা হয়েছে— ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى (নিশ্চয়ই তাকে সে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকট।) দ্বিতীয়বারের এ দর্শন হয়েছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। মহানবী (সা) যদিও জিবরাঈল (আ)-কে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিন্তু এখানে দুইবার মাত্র নিজস্ব আকৃতিতে দর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উক্ত আয়াতের তাফসীর জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ هو جبريل অর্থাৎ তিনি ছিলেন জিবরাঈল। আর যে সকল উলামা শবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহান আল্লাহ্‌র দীদারে ধন্য হওয়ার পক্ষপাতী তাঁদের দলীল সূরা নাজমের আলোচ্য আয়াত নয় বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে সহীহ মুসলিম এবং মুস্তাদরাকে হাকেম সূত্রে আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত মারফূ' হাদীস। অতএব কুরআন যদিও দীদার

প্রশ্নে নীরব কিন্তু যেহেতু এ সকল শীর্ষস্থানীয় সাহাবী তার প্রমাণ দিচ্ছেন তাই বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছেন।

এখন মহানবীর দীদার যেহেতু প্রমাণসিদ্ধ বিষয় তাই উল্লিখিত আলিমগণ তাঁকে "দুনিয়াতে আল্লার দীদার অসম্ভব"-এ নীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকেন। তারা বলেন ঃ দুনিয়াতে দর্শন অসম্ভব হওয়ার মূল কারণ হলো দর্শকের অযোগ্যতা। নতুবা দর্শনীয় সত্তায় (مرئی) অন্তরায়ের কোন অস্তিত্ব নেই। শায়খ ইবনুল আরাবী বিষয়টির সূক্ষ্মতম এক ব্যাখ্যায় বলেছেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নীতির ঊর্ধ্বে রাখা নিষ্প্রয়োজন, একে ব্যাপকার্থবোধক স্বীকার করা হলেও তাঁর দীদারে কোন প্রকার ত্রুটি আসে না। কেননা আমরা মি'রাজে দীদারের সমর্থক আর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে আরশ পর্যন্ত। আরশ ও সামাওয়াত মাকানে আখিরাত (পরকালীন জগত) এবং দুনিয়ার গণ্ডিবহির্ভূত স্থান। তাহলে স্বীকার করাতে অসুবিধা নেই যে, সেখানকার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য এই যে, মরণের আগে অথবা পরে সে জগতের আওতায় যে-ই পদার্পণ করুক মহান আল্লাহ্র দীদার সহ্য করার মত শক্তিসম্পন্ন দৃষ্টিশক্তি লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। যেমন ঈসা (আ) এখন আকাশে বর্তমান। কিন্তু সেখানে পানাহার ও প্রশ্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা বজায় রেখে কেবল আল্লাহ্র যিক্র দ্বারা তিনি জীবন্ত। এর কারণ একটাই। আর তা হলো, পার্থিব জগতের নয়, এখন তিনি পর জগতের বাসিন্দা, যে জগতের বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার স্বভাব-ক্রিয়া থেকে ভিন্ন ধরনের। খাওয়া দাওয়া থেকে মল-মূত্র তৈরি হওয়া এ জগতের বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেখানকার খাদ্যে সম্ভবত এরূপ না-ও হতে পারে। গতি দ্বারা দেহে তাপ সৃষ্টি হওয়া যদিও ইহজাগতিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেখানে সম্ভবত এরূপ না হওয়ারই নিয়ম। এ জগতের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ ওজনবিহীন অথচ পরজগতের ক্রিয়াপ্রভাবে এগুলোও সেখানে ওজনশীল। মৃত্যু এ জগতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য কিন্তু জীবন আখিরাতের একক বৈশিষ্ট্য। সে জগতে কেউ পা রাখা মাত্র মৃত্যুর হাত থেকে চির অব্যাহতি লাভ করে। যেমন কাশ্মীরের প্রশংসায় কোন কবি বলেছেন ঃ

هر سوخته جانے که به کشمیر در آید

گر مرغ کباب است که بابال وپر آید

—যে কেউ কাশ্মীরে আসুক নবযৌবন লাভ করা তার জন্য অবধারিত। এমনকি কাবাব করা মুরগীও যদি কাশ্মীরে পৌঁছে যায়, তার দেহে পর্যন্ত নতুন ডানা ও পালক গজাবে।

যা হোক, কথাটা যদিও কবির অতিরঞ্জন কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, বিশ্বের সকল অংশ অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় বরং কোন কোন স্থান ও নগরের বিশেষত্বে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান লক্ষণীয়। কোন দেশের মানুষ দীর্ঘায়ু, আবার কোন দেশের মানুষ স্বল্পায়ু, কোন অঞ্চলের লোকজন দুর্বল-ক্ষীণ আবার কোন স্থানের মানুষ শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠদেহী হয়ে থাকে। এক এলাকায় রোগ-ব্যাধি, কলেরা-বসন্ত লেগেই আছে, আবার অন্য এলাকার লোকজন এ সবের নামই জানে না। একই বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যখন এতই ব্যবধান তাহলে পরজগতের স্থানের গুণ-বৈশিষ্ট্য দুনিয়া থেকে ভিন্নতর হওয়াতে অবাক হওয়ার কি আছে ? দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সার্বিক তুলনা করা অযৌক্তিক। কাজেই এর পর আমল-আখলাক, কার্যকলাপের ওজন এবং আল্লাহ্র দীদারের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। মুতাযিলাদের বিবেক বিপর্যয়ের মারে বিক্ষত যে, অনুপস্থিতকে উপস্থিত আর অদৃশ্যকে দৃশ্যের সাথে তুলনার ভিত্তিতে এসব বিষয়কে তারা অস্বীকারের দুঃসাহস দেখিয়েছে। অথচ এ ধরনের কিয়াস বা তুলনা বাতিল হওয়া সুস্পষ্ট।

যা হোক, শায়খ ইবনুল আরাবীর গবেষণার সার কথা হলো—স্থান ও কাল হিসেবে আখিরাত দু'পর্যায়ে বিভক্ত। আখিরাতের কাল (زمان اخرت) শুরু হবে মৃত্যুর পর থেকে আর আখিরাতের স্থান (مكان اخرت) এখনই বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আহলে সুন্নাতের আকীদা মতে জান্নাত ও জাহান্নাম এখনই বর্তমান। তাহলে তা কোথায়, দুনিয়াতে ? যদি দুনিয়ায় তার অস্তিত্ব মেনে নেয়া হয়, তাহলে সে ব্যক্তির কথাই সঙ্গত যে বলে—"সারা বিশ্বের ভূগোলশাস্ত্র চষে বেড়ালাম তাতে জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্বই খুঁজে পেলাম না।" হকপন্থীদের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয়—তুমি কেবল দুনিয়ার ভূগোলই পড়েছ, এ ছাড়া আখিরাতেরও ভূগোল রয়েছে যা তোমার পাঠ্যসূচির বাইরে, তোমার সুযোগই হয়নি সেটা অধ্যয়নের। আখিরাতের ভূগোল পাঠেই জানতে পারবে তা আছে কি-না এবং কোথায় ? অতএব হকপন্থীরা এর অস্তিত্ব তালাশ করেন দুনিয়ায় নয়, আখিরাতে (পরজগতে)। বোঝা গেল মাকানে আখিরাত এখনও বিদ্যমান এবং "যমানে আখিরাতের" (পরকাল) ন্যায় "মাকানে আখিরাতেও" (পর জগতের স্থান) দীদার বা দর্শন লাভ করা সম্ভব, দর্শক যদিও এখন পর্যন্ত পরকালের আওতায় প্রবেশ করেনি। অতএব মহানবী (সা)-এর সপক্ষে যে দীদার প্রমাণ করা হয় তা এ জগতের নয় বরং ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়। যেহেতু জাগতিক দীদার মহানবী (সা)-এর পক্ষেও সম্ভব নয়। মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যে যদিও কামিল ও পূর্ণাঙ্গ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মানুষ। —তাহসীলুল মারাম, পৃষ্ঠা ৫

### ৭৩. দরূদ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহের মনোভাব পোষণ করা ভুল।

যদি কেউ বলে যে, আমরা "দরূদ পাঠ করি আর সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) উপকৃত হন" তাহলে তার জবাবে আমি বলব—মহানবী (সা)-এর উপকার ততটুকু নয় যতটুকু লাভ খোদ আপনাদের। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র বাণী প্রণিধানযোগ্য। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (অর্থাৎ হে মুমিন-গণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং যথাযথভাবে তাকে সালাম জানাও।) একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। মনে করুন—চাকরকে আপনি বললেন—এখানে হাজার টাকা, আমার ছেলেকে দেয়ার জন্য তুমি সুপারিশ কর। এর দ্বারা চাকরের মান বাড়ানোই আপনার উদ্দেশ্য এবং এটা একটা বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। তার অর্থ এ নয় যে, টাকা পাওয়ার জন্য আপনার ছেলে চাকরের মুখাপেক্ষী। এখন চাকর যদি সুপারিশ না-ও করে তবুও টাকা ছেলের জন্য বরাদ্দ হয়েই আছে, যথারীতি সে পাবেই। চাকরের মর্যাদা বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য। দরূদ শরীফের অবস্থাও তদ্রূপ। আমরা দরূদ পড়ি আর না পড়ি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি পাবেনই। কেননা এর পূর্বেই—ان الله وملئكته يصلون على النبى (নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে) মর্মে আয়াত বর্তমান রয়েছে। কিন্তু আমাদের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—দরূদ পাঠাও তোমাদের নিজেদের মঙ্গল সাধিত হবে। কাজেই কোন্ মুখে এ কথা আসতে পারে যে, তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী এবং আমাদের বলার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। সম্ভবত এটা কোন অনুর্বর মস্তিষ্কের চিন্তা, তাই পরিষ্কার করে দেয়া হলো।

বস্তুত মহানবী (সা)-এর সাথে আল্লাহর আচরণ আমাদের আবেদন-নির্ভর নয়। আলিমগণ এর প্রমাণ স্বরূপ লিখেছেন ঃ অন্যান্য ইবাদত কোন সময় কবূল হয় কোন সময় কবূল হয় না, না-মঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু দরূদ শরীফ আল্লাহর দরবারে সর্বদা মকবুল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণে আমাদের আমলের কোন প্রভাব যদি সত্যিকার অর্থে থেকেই থাকে, তবে অন্যান্য আমলের ন্যায় দরূদও সময়ে কবূল সময়ে না-মঞ্জুর হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সর্বদা কবূল হওয়া প্রমাণ করে যে, তাঁর প্রতি রহমতের জন্য আমাদের আমলের আদৌ কোন প্রভাব নেই। আমরা দরূদ পাঠাই বা না পাঠাই তাঁর প্রতি খোদায়ী রহমতের অবিরত বর্ষণ চলতেই থাকে। রহমত আল্লাহ পাঠাবেনই, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত। তাই দরূদ কখনো

না-মঞ্জুর হয় না। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি দরূদের নির্দেশ আমাদেরই মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

বলা বাহুল্য, মানগত দিক থেকে আমাদের আমল কবূলের যোগ্য নয়। আর প্রত্যাখ্যাত আমল না হওয়ারই শামিল। এ হিসাবে আমাদের দরূদও মূল্যহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর রহমতের ধারা বর্ষণ অবিরত চলছেই। এটাকে কারো দরূদের প্রতিক্রিয়া মনে করা ভুল চিন্তা। সূর্যের আলোকে আমরাও আলোকিত হই কিন্তু আলোক বিকিরণে সূর্য আমাদের মুখাপেক্ষী নয়। অতএব "লাভালাভের বেলায় মহানবী (সা) কারো মুখাপেক্ষী নন" আলিমগণের উক্তি দ্বারা এ কথার প্রতি জোর সমর্থন লক্ষ করা যায়। অবশ্য অপর এক প্রশ্নের অবকাশ এখানে থেকে যায় যে, মহানবী (সা) আমাদেরকে দীন শিখিয়েছেন এবং আমাদের যাবতীয় আমলের সওয়াব তিনিও লাভ করেন। তাই আমরা আমল না করলে এত সওয়াব তিনি কিভাবে লাভ করবেন ? কাজেই বোঝা গেল এতে আমাদের আমলেরও দখল রয়েছে। এর জবাব হলো—নেক নিয়তে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কাজেই যেকোন অবস্থায় তিনি সওয়াব লাভের অধিকারী। এখন আমাদের আমলের প্রতিক্রিয়া কেবল এতটুকু যে, উম্মতের আমলের সংবাদ পেয়ে তাঁর অন্তর খুশি হয়। নতুবা আমাদের দ্বারা তাঁর কোন লাভ নেই। —যিকরুর্ রাসূল, পৃষ্ঠা ৩

**৭৪. মসজিদ ও মাহ্ফিলের সাজ-সজ্জা অপব্যয় ও মাকরূহ।**

সাধারণত আজকাল মসজিদকে বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় চাকচিক্যময় করে তোলা হয়। আর ইসলামী সভা-সমিতির তো কথাই নেই। এগুলোকে একেবারে যাত্রামঞ্চে পরিণত করা হয়। যুক্তি দেয়া হয় যে, আমরা বিজাতীয়দের পশ্চাতে পড়ে থাকা সঙ্গত নয়। আমি বলব– জনাব, বিজাতীয়দের মুকাবিলা আপনাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাদের সাথে সম্পদের পাল্লায় আপনাদের ভারসাম্য কোথায় ? তারাও যদি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে তবে আপনাদের পরাজয়ের গ্লানি নিশ্চিত। কাজেই কাফিরদের সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব ত্যাগ করে জনাব রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীগণের অনুসরণে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলুন। বস্তুত একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত। কবির ভাষায় ঃ

دل فریباں نباتی ہمہ زیور بستند

دلبر ماست کہ حسن خداداد آمد

—সুন্দরী রূপসীদের সারা অঙ্গ অলংকার সজ্জিত কিন্তু আমার প্রিয়া খোদা প্রদত্ত রূপ লাবণ্যে বিভূষিতা।

ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, সবাই জাঁকজমক ও জলুস নিয়ে বের হোক আর তাদের মুকাবিলায় একজন মুসলমান আসুক জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্র পরে, আল্লাহ্‌র কসম! মুসলমানের খোদাপ্রদত্ত রূপের বন্যায় তাদের সকল চাকচিক্য তলিয়ে যাবে, ভেসে যাবে। জনাব, আল্লাহ্ আপনাকে এমন অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন যে, ধার করা কৃত্রিম সৌন্দর্য আপনার প্রয়োজনই নেই। হে সুন্দর! আল্লাহ্ তোমাকে এতই রূপ দিয়েছেন যা দেখে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত লজ্জিত। পাউডার লাগিয়ে খোদাপ্রদত্ত সে লাবণ্য ঢাকার এ প্রয়াস তোমার কোন্ দুঃখে ? নিজের রূপ তোমার অজ্ঞাত, এ মেকি রূপ তোমার আসল সৌন্দর্যকে অন্তরালে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব মুতানাব্বীর ভাষায় ঃ

حسن الحضارة مجلوب بتطرية

وفى البداوة حسن غير مجلوب

—"শহুরে মেয়েদের রূপ-লাবণ্য সাজ-সজ্জা ও পরিচর্যাকেন্দ্রিক কিন্তু পল্লীবালাদের দেহ-কান্তি খোদা প্রদত্ত।"

বস্তুত শহুরে কৃত্রিম রূপসী অপেক্ষা সুন্দরী পল্লীবালা শত গুণে উত্তম-সুদর্শনা, যারা পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। জনাব, ইসলামী জলসার সৌন্দর্য এতটুকু যথেষ্ট নয় কি যে, ইসলামের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক এবং ইসলামের নামে তার আয়োজন। দো-জাহানের শাহানশাহের দরবাররূপে একে আখ্যা দেয়া হয়েছে অথচ দিল্লী সম্রাট অথবা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের দরবারসম কিংবা ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চের ন্যায় একে সুসজ্জিত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাহলে বোঝা গেল—কাক হয়ে তোমরা ময়ূর নাচের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলে আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়েছ। জনাব, জলসা এমন হওয়া উচিত দূর থেকে যেন ইসলামের স্মৃতি চিহ্ন চমকাতে থাকে, নাচ রং কিংবা সার্কাস-থিয়েটার মঞ্চ নয়। বাইরে থেকে মনে হবে একেবারে সাদাসিধা আর ভিতরে থাকবে সাহাবীগণের চরিত্র-রঞ্জিত। বাজারের নারীদের ন্যায় কণ্ঠে ফুলের মালা, দামী দামী পোশাক, প্রতিটি পদে, চলনে-বলনে অর্থবিত্তের গর্ব-অহংকার আর ঠমকের বাহাদুরী অথচ আসলের ঘর ফাঁকা। বাস্তব সাক্ষীর নির্দেশ এটাই যে, রং ঢং, সাজ-সজ্জা আর রূপ চর্চায় অগ্রণী তারাই, যাদের মাল আছে কামাল (গুণ-বৈশিষ্ট্য) নেই। নতুবা তাদের আচার-আচরণে ধন অপেক্ষা গুণের অনুশীলন থাকত পরিমাণে অধিক। কাজেই তারা গুণের বদলে ধনের প্রকাশ

ঘটায়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী-প্রদত্ত উপমা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—মাথার দোষ লুকাবার উদ্দেশ্যে টেকো ব্যক্তির সুন্দর টুপির সযত্ন ব্যবহার। কিন্তু কালোকেশীর আগ্রহ মাথায় তার টুপিই না উঠুক। লোকেরা দেখুক তার কৃষ্ণ চুল আর সিঁথির বাহার। বন্ধুগণ! আমি কসম করে বলতে পারি, অন্তরে যার সত্যের মানিক, বাহ্যিক আড়ম্বরে থাকবে তার অনীহা আর ঘৃণার ভাব। কিন্তু সত্য ও সুন্দর-মুক্ত হৃদয়ের আগ্রহ কেবল বাহ্যিক ঠাট আর লৌকিক জাঁকজমকের প্রতি। ইসলামী জলসা যতই জাঁকজমকপূর্ণ হোক কিন্তু তা ইসলামের ন্যায় আড়ম্বরহীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মোটকথা, সভা-সমিতিতে বিভিন্ন ওয়ায়েয একত্র করার উদ্দেশ্য কেবল গর্ব-অহংকার আর প্রদর্শনী বাতিক। এর অপর উদ্দেশ্য হলো—মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুপাতে একাধিক বক্তার সমাবেশ ঘটানো, যাতে সভা জমজমাট হয়। আমি বলতে চাই খাঁটি দীনি সভা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষের রুচি-অরুচির কি প্রয়োজন ? কেউ টাকা বণ্টন করা শুরু করলে তো প্রচার লাগে না, এমনি কত ফকীর জমা হয়। "টাকার সাথে মিষ্টিও দেয়া হবে" প্রচারণার কি প্রয়োজন ? তাহলে তো বোঝা গেল আপনার টাকা জাল। আপনার সদাই যদি নির্ভেজাল থাকে, তবে সারি গাওয়া ছাড়াই বিক্রি দিয়ে কুলাতে পারবেন না। নতুবা সারি তো গাওয়া লাগবেই। ভাই সাহেব, দোকানে খাঁটি পণ্য রাখুন। দেখবেন আপনা আপনি খরিদ্দারের দারুণ ভিড় জমে গেছে। তদ্রূপ মনে রাখতে হবে—'সত্য' আকর্ষণহীন বিষয় নয়। হকপন্থী আর জালিয়াতের ভাষায় রাজ্যের ব্যবধান। শেষোক্ত ব্যক্তির বক্তব্যের সূচনা বড় চোটের আর রঙ্গীন ভাষায়, কিন্তু সারমর্ম সারি গাওয়া ভিন্ন কিছুই নয়। পক্ষান্তরে হকপন্থী আল্লাহওয়ালাগণের কথা শুরু হয় নরম সুরে কিন্তু শেষ হয় জোরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবং এতে মানুষের মনে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাঁদের কথার সূচনা হালকা বৃষ্টির ন্যায় ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং মানব অন্তর ক্রমান্বয়ে তা শুষে নেয়। পরিণামে তা উর্বর, সবুজ-সতেজ গুলবাগিচায় আত্মপ্রকাশ করে। মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

در بہار ان کے شود سر سبز سنگ

خاک شو تا گل بروید رنگ برنگ

—"বসন্তের আগমনে চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ কিন্তু তোমাকে মাটি হতে হবে, তবেই রং বেরংয়ের ফুল ফুটবে।"

লোভী মতলববাজরা রং জমানোর উদ্দেশ্যে প্রথমে মসনবীর ছন্দ আওড়ায়, আজকাল কোথাও কোথাও ঢোল-ডঙ্গর, তবলা-হারমোনিয়াম বাজিয়ে ওয়াযের সভা

গরম করা হয় আর বক্তৃতার ভাষা হয় চটকদার। উপস্থিত ক্ষেত্রে সভা বেশ জমে—উত্তেজনাও হয় কিন্তু সভাও শেষ ক্রিয়াও খতম। সামান্য কিছু থাকলে তাও দু-চার দিনের জন্য। হকপন্থীদের কথার ক্রিয়া যদিও রঙ্গিন নয় কিন্তু বড় স্থায়ী ও ফলপ্রসূ। এ-দুয়ের পার্থক্য যেমন—জং ধরা রূপার টাকা আর চটকদার আবরণের চামচ। মরিচাসহই টাকার দাম ষোল আনা কিন্তু চটকদার দস্তার চামচ কেউ কিনে না। যদি বা কেউ নিলই তাতে কি সীসার দাম বেড়ে যাবে? মোট কথা, টাকার জন্য শুভ্রতার চমক নিষ্প্রয়োজন কিন্তু রূপা অপেক্ষা চটকদার গিল্টির ফুটানি দুই দিনের, অতঃপর কানাকড়ি দাম নেই। কবি বলেন ঃ

نقد شو فی نه همه صافی بے غش باشد
اے بسا خرقه که متوجب آتش باشد

—"দরবেশের কার্যকলাপ মাত্রই বিশুদ্ধ নির্ভেজাল নয়, বহু জুব্বাধারী দরবেশ জাহান্নামের উপযোগী।"

কষ্টিপাথরে হাযির করা হলে টাকা তো নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে যায় পরীক্ষার জন্য কিন্তু গিল্টির চামচ শরমে মুখ লুকায়। কবির ভাষায় ঃ

نه باشد اهل باطن درپئے آرائش ظاهر
به نقاش احتیاجے نیست دیوار گلستاں را

—আহ্‌লে বাতেন তথা অধ্যাত্মপন্থিগণ বাহ্যিক আড়ম্বর প্রয়াসী নন, উদ্যান প্রাচীরের জন্য যেরূপ চিত্রকরের শিল্পকর্ম নিষ্প্রয়োজন। কেননা উদ্যানের বসন্ত বাহারই তার জন্য যথেষ্ট।

মহানবী (সা)-এর জীবনের এই ছিল মূল দর্শন। বাহ্যিক লৌকিকতা, শান-শওকত ও আড়ম্বরের চিহ্নও তাঁর জীবনাচরণে অকল্পনীয়। তিনি ছিলেন সীমাহীন স্থিরতা ও ক্ষমতার অধিকারী এবং সত্য-সুন্দরের মহান প্রতীক। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর এবং নিঃসংকোচ চরিত্রের অধিকারী।

—ইসলাহুল ইয়াতামা, পৃষ্ঠা ১২

**৭৫. হযরত আম্বিয়া (আ) এবং আউলিয়াগণের মরণোত্তর জীবনের প্রমাণ।**

মহানবী (সা)-এর দেহ মুবারক রওযা পাকে বর্তমান থাকার দরুন এর মর্যাদা অতি ঊর্ধ্বে। হকপন্থী আলিম সমাজ এবং সাহাবা কিরামের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং সশরীরে রওযা পাকে জীবন্ত রয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان نبى الله حى فى قبره يرزق

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ কবর শরীফে জীবিত রয়েছেন এবং তিনি রিয্ক প্রাপ্ত হন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—তাঁর এ জীবন জাগতিক জীবনের বাইরে এক ভিন্নতর জীবন। প্রশ্ন হতে পারে—মানুষ মাত্রই বরযখী জীবনের অধিকারী এতে নবীর বিশেষত্ব কোথায় ? উত্তর হলো, এ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এক পর্যায়ে সকল মু'মিন সমভাবে শরীক, যার দরুন প্রত্যেক মুসলমানের কবরের শিক্ষা অনুভূত হবে। দ্বিতীয় স্তরের জীবন লাভ করবেন শহীদগণ। তাঁদের জীবন মু'মিনদের জীবন অপেক্ষা উন্নত মানের। মু'মিনদের বরযখী জীবন পার্থিব জীবন অপেক্ষা উন্নততর হওয়া সত্ত্বেও তা শহীদগণের জীবনের তুলনায় দুর্বল ও নিম্ন পর্যায়ের হবে। কিন্তু কারো পক্ষে এ কথা ভাবা ঠিক নয় যে, সাধারণ মু'মিনদের বরযখী জীবন তাদের নিজেদের পার্থিব জীবন অপেক্ষা দুর্বল থাকবে। শহীদগণের উন্নত মানের জীবন প্রাপ্তির ফলশ্রুতিস্বরূপ তাঁদের লাশ গ্রাস করা যমীনের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং এই না খাওয়া জীবনেরই প্রতিক্রিয়া ও নিদর্শন। সুতরাং সাধারণ মু'মিনদের বিপরীত শহীদগণের জীবনের এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া-প্রকাশ তাঁদের শক্তিশালী ও উন্নততর জীবনের প্রমাণ। কেউ কেউ একে অস্বীকার করে বলেছে—বাস্তব অবস্থা শহীদগণের লাশ সম্পর্কিত আলোচ্য আকীদার বিপরীত। কিন্তু এ দাবি শহীদী জীবন অস্বীকারের কারণ হতে পারে না। কারণ, উক্ত আকীদার বিপক্ষ প্রমাণের ন্যায় বাস্তবের সপক্ষ প্রমাণও লক্ষ করা যায়। কাজেই উভয় প্রকার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করা অযৌক্তিক দাবি। বড় জোর এটাকে সার্বিক নিয়ম না বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার স্বীকৃতির দাবি তোলা যায়। 'নসের' (কুরআন-হাদীসের প্রমাণ) মর্মও তাই বলা যায়। কিন্তু সমূলে অস্বীকার করে দেয়াটা সঠিক হতে পারে না। এ জবাব তখনি খাটে যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, বিতর্কিত লোকটি শহীদই ছিল। কিন্তু সম্ভাবনা তো এটাও রয়েছে যে, লোকটি মূলত শহীদই ছিল না। কেননা প্রকৃত শাহাদত শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ার নামই শাহাদত নয়। যেমন নিয়তের পরিশুদ্ধি যে, একমাত্র আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে হতে হবে। যার খবর আল্লাহ্ ছাড়া কারো জানা নেই। তাই আমরা বলতে পারি, যাকে আপনারা বিপরীত অবস্থায় লক্ষ করেছেন প্রকৃতপক্ষে সে শহীদই ছিল না, ছিল কেবল নামসর্বস্ব শহীদ। অথচ উন্নত মর্যাদা কেবল প্রকৃত শহীদের প্রাপ্য। আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে শহীদই ছিল, তাহলে সম্ভাবনা এ-ও তো রয়েছে যে, বিশেষ কোন কারণে তার লাশ মাটিতে মিশে গেছে। যেমন সে স্থানের মাটিতে লবণাক্ততার

আধিক্য ছিল। "শহীদের লাশ আগুনে পোড়ালেও দাহ্য হবে না" এরূপ দাবি আমরা কবেই বা করেছিলাম। আমাদের দাবি বরং এই ছিল যে, অন্যান্য মুর্দার ন্যায় শহীদের লাশ নিয়মমত দাফন করা হলে এবং ভূমির লবণাক্ততা কিংবা অন্য কোন ব্যতিক্রম দেখা না দিলে অন্যসব মুর্দার ন্যায় শহীদের লাশ পচে-গলে মাটিতে মিশে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

তৃতীয় স্তরের সর্বাধিক শক্তিশালী জীবন আম্বিয়া (আ)-গণের। তাঁদের বরযখী জীবন শহীদ অপেক্ষা শক্তিশালী ও উন্নত মানের। সুতরাং তাঁদের দেহের এক ধরনের প্রভাব তো এই যে, মাটির পক্ষে শরীর মুবারক খেয়ে ফেলা সম্ভব নয় যা অনুভবযোগ্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

حرم الله اجساد الانبياء على الارض

"আল্লাহ্ পাক মাটির জন্য নবীগণের (আ) শরীর মুবারক হারাম করে দিয়েছেন।" দ্বিতীয় প্রভাব অনুভবযোগ্য নয় কিন্তু কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো—নবী (আ)-গণের ইন্তিকালের পর উম্মতের কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁদের সম্মানিত স্ত্রীগণকে বিয়ে করা জায়েয নয়। অধিকন্তু তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হয় না। মহানবী (সা)-এর বাণী ঃ

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة

অর্থাৎ "আমরা নবীগণ কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।" অথচ শরীয়ত শহীদগণের জন্য এ বিধান সাব্যস্ত করেনি। শরীয়ত যদিও এর বিশেষ কোন রহস্য উল্লেখ করেনি, কিন্তু মুহাক্কিক আলিমগণের মতে—আম্বিয়াগণের শক্তিশালী জীবনের অন্তরায় আলোচ্য বিষয়দ্বয় বৈধ না হওয়ার মূল কারণ।

উল্লেখ্য, ইন্তিকালের পর উম্মতের জন্য নবীর স্ত্রীগণের বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা সকল নবীর জন্য যদিও প্রমাণিত নয়, কুরআনে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু মীরাসের সাথে তুলনা করে আলিমগণ সমস্ত নবীর স্ত্রীগণের ক্ষেত্রেও এ হুকুম ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। আর হাদীসে মীরাস বণ্টনের অবৈধতা সকল নবীর ক্ষেত্রেই প্রমাণিত। সুতরাং এ সমস্ত বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে সাধারণ মু'মিন ও শহীদান অপেক্ষা আম্বিয়াগণের উন্নতমানের বরযখী জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোটকথা, কবরে আম্বিয়াগণের জীবিত থাকা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। বিশেষত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরয়খী জীবন ইসলামবিরোধী লোকদের নিকট পর্যন্ত স্বীকৃত সত্য। সুতরাং "তারীখে মদীনা" (মদীনার ইতিহাস) গ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনা দ্বারা তাদের স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে ঘটনাটি আমি নিজে পড়েছি। মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের কয়েক শতাব্দী পর (কোন্ সম্রাটের শাসনামলে ঘটেছিল এখন স্মরণে আসছে না) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তি মদীনা আগমন করে। মসজিদে নববীর পাশেই ঘর ভাড়া নিয়ে সারা দিন তারা নামায-তাসবীহ ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকত। এতে মানুষ তাদের ভক্ত হয়ে পড়ে। এদিকে রাতের বেলা হতভাগা পাপিষ্ঠরা তাদের সে ঘর থেকে রওযা পাক বরাবর সুড়ঙ্গ খনন করে এবং রাতের আঁধারে মদীনার বাইরে মাটি সরিয়ে জায়গা পরিপাটি করে রাখত, যাতে কেউ টের না পায়। কয়েক সপ্তাহ্ যাবত তারা সুড়ঙ্গ পথ খননের কাজ অব্যাহত রাখে। এদিকে তাদের এ তৎপরতা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মহান আল্লাহ্ তৎকালীন বাদশাহ্কে (নামটা আমার স্মরণে আসছে না) স্বপ্নযোগে হুঁশিয়ার করে দেন। স্বপ্নে তিনি মহানবী (সা)-কে চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ বদন দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্রাটের নাম ধরে ইরশাদ ফরমান ঃ এ দু-ই ব্যক্তি আমায় কষ্ট দিচ্ছে, শীঘ্র আমাকে এদের হাত থেকে মুক্ত কর। স্বপ্নে তাঁকে সে দু-ব্যক্তির আকার-আকৃতি এবং হুলিয়া পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়া হয়। নিদ্রা ভঙ্গের পর সম্রাট মন্ত্রীর নিকট ঘটনা বর্ণনা করেন। মন্ত্রী বললেন ঃ মনে হয় মদীনায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনি অনতিবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হন। সম্রাট সৈন্য-সামন্তসহ অতি দ্রুত মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মদীনা উপনীত হন। ততদিনে তারা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ খুঁড়ে একেবারে দেহ মুবারকের নিকট পৌঁছে গিয়েছিল। বাদশাহ্র আগমনে আর একদিন বিলম্ব হলেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত। এখানে পৌঁছেই তিনি শহরবাসী সকলকে মদীনার বাইরে এক স্থানে জমায়েত এবং নির্দিষ্ট এক ফটক দিয়ে বের হওয়ার হুকুম দেন। নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে সকলকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। এক সময় সকল পুরুষের নির্গমন শেষ হয়ে আসে কিন্তু স্বপ্নে দেখা দু-ব্যক্তির চেহারা নযরে পড়ছে না। বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে সম্রাট লোকদের প্রশ্ন করেন—সবাই কি এসে গেছে? তারা জবাব দিল—জী হ্যাঁ, ভিতরে এখন আর কেউ নেই। সম্রাট বললেন—কখনো হতে পারে না, অবশ্যই ভিতরে কেউ রয়ে গেছে। জনগণ বলল—দু-জন দরবেশ লোক রয়ে গেছে তারা কারো দাওয়াতে যায় না, কারো সাথে মেলামেশাও করে না। সম্রাট বললেন—আমার এদেরকেই দরকার। সুতরাং ধরে এনে তাদের হাযির করা হলে স্বপ্নে দেখা অবিকল সে চেহারাই

সম্রাট তাদের মধ্যে দেখতে পান। সাথে সাথে এদের বন্দী করার হুকুম দেয়া হয়। অতঃপর এদের জিজ্ঞেস করা হয়—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তোমরা কি ধরনের কষ্ট দিয়েছ ? দীর্ঘ সময় পর তারা স্বীকার করে যে, দেহ মুবারক বের করার উদ্দেশ্যে আমরা সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করেছি। সম্রাট নিজে সে সুড়ঙ্গ প্রত্যক্ষ করে দেখতে পান—তারা কদম মুবারক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। সম্রাট কদম মুবারকে ভক্তিপূর্ণ চুমো খেয়ে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দেন এবং কবরের তলদেশে পানির স্তর পর্যন্ত চতুর্দিকে সীসা গলিয়ে ঢালাই করে দেন, ভবিষ্যতে কেউ যেন সুড়ঙ্গ পথ খনন করার সুযোগ না পায়।

এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা)-এর দেহ মুবারক অক্ষত রয়েছে—ইসলামের দুশমনরা পর্যন্ত তার প্রতি এত দৃঢ় বিশ্বাসী যে, কয়েক শতাব্দী পরও তারা তা বের করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের সে বিশ্বাসই যদি না থাকবে, তাহলে তাদের সুড়ঙ্গ খনন করার কি কারণ ? কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো পক্ষে এ ধরনের আত্মঘাতী পদক্ষেপ কল্পনা করা যায় না। তারা আহলে কিতাব (কিতাবধারী), তাদের স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল যে, নবীর দেহ মাটিতে মেশা অসম্ভব। মহানবী (সা) সত্য নবী এ কথার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। স্বীকৃতি দিচ্ছে না কেবল শত্রুতাবশে। মোট কথা—পক্ষ-বিপক্ষ, শত্রু-মিত্র সবার মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীর মুবারক আজো পর্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ রয়েছে।

—আল-হুবূর, পৃষ্ঠা ১৪

**৭৬. ইলমে তাজবীদ শিক্ষা করা ফরয, উদাসীনতা উচিত নয়।**

তাজবীদ এত প্রয়োজনীয় যে, এর অভাবে কোন কোন সময় আরবীর বিশেষত্বই নষ্ট হয়ে যায়। আর শব্দের আরবীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাওয়ার অর্থ—তা কুরআন থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া। তাহলে এর দ্বারা নামায কি করে শুদ্ধ হবে ? তাজবীদের অভাবে শব্দের আরবীয়ত্ব নষ্ট হওয়ার কথা শুনে আপনাদের হয় তো অবাক লাগবে। কিন্তু দলীল দ্বারা আমি এর প্রমাণ দেব। একথা সবাই জানে যে, আরবী, ফারসী, উর্দু পৃথক পৃথক ভাষা এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। কোন শব্দ ফার্সী বা উর্দু হওয়ার জন্য তার উচ্চারণ নির্ভুল থাকা শর্ত। শব্দের আরবী হওয়ার জন্যও একই শর্ত জরুরী। যেমন—'গাঢ়া' ও 'গারা' দুটি শব্দ। প্রথমটি কাপড় জাতীয়, দ্বিতীয়টি মাটির তৈরি। এখন উভয় শব্দের শেষ বর্ণ ঢ় ও র-এর স্থানচ্যুতির দরুন অর্থের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। কেননা 'গারা' বলতে কাপড় বোঝায় না আবার 'গাঢ়া' মাটির তৈরি জিনিস নয়। তদ্রূপ আরবী বর্ণমালার ث (ছা)-এর স্থলে سين (সীন) অথবা صاد

(সাদ) পড়া হলে কিংবা ح (হা)-এর স্থলে ه (ছোট হা) পড়া হলে শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ উভয়ই বদলে যাবে। এর দ্বারা শব্দ বিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অনুরূপ বর্ণের صفت (বৈশিষ্ট্য) যথাযথ আদায় করাও অনিবার্য। যেমন—পাংখা, রঙ্গ, সঙ্গ ও জঙ্গ শব্দসমূহের 'ন' বর্ণটি নাসিকামূল থেকে অস্পষ্ট আওয়াজে উচ্চারিত হয়। এখন 'ন' বর্ণটি পূর্ণ প্রকাশ করে 'পানখা', 'রনগ', 'সনগ' ইত্যাদি উচ্চারণে পড়া হলে আপনারা কিছুতেই শুদ্ধ পড়া হলো স্বীকার করবেন না বরং বলবেন এটা উর্দু বা ফার্সী রইল না, অর্থহীন শব্দ হয়ে গেল। সুতরাং এখানে যেরূপ শব্দের উচ্চারণ ও অর্থগত ভুল এবং উহার ভাষাচ্যুতি পর্যন্ত আপনাকে স্বীকার করে নিতে হলো, একইরূপে আরবী শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণের স্থলে অস্পষ্ট উচ্চারণের দরুন তা আরবী শব্দ রইল না বলে আপনিই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তাহলে এখনো কি তাজবীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারো প্রশ্ন থাকতে পারে ? আমি তো বলি—তাজবীদ তথা ইলমে কিরাআত শিক্ষা করা ফরয। কারণ তাজবীদ ব্যতীত আরবীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্ভব নয়। সুতরাং তাজবীদ শিক্ষা ফরয। বন্ধুগণ! মনের দুর্বলতার দরুন আপনাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট না হতে পারে, কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাজবীদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো—দৃশ্যত পার্থিব লাভ পরিলক্ষিত না হওয়ার কারণে এদিকে মুসলমানদের আকর্ষণ-আগ্রহ কম। কিন্তু আজ যদি আইন করা হয় যে, বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকারীই কেবল সরকারী চাকরির যোগ্য বিবেচিত হবে, তাহলে বি. এ., এম. এ. পাস করা সবাই আজ কারী হয়ে যাবে। পার্থিব সম্পদের আশায় আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। তাই ওযর-আপত্তি যা কিছু করা হয় সবই বাহানা মাত্র।

—আসবাবুল ফিতনাহ্, পৃষ্ঠা ২৬

**৭৭. উলামাদের পারস্পরিক মতবিরোধের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ।**

এটা এক কঠিন প্রশ্ন, যা মুসলমানদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছে। উলামাদের মতবিরোধ তারা গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করে যে, কোন বিষয় এক পক্ষের মতে হারাম তো সে একই বিষয় অপরপক্ষ জায়েয বলে ফতোয়া দিচ্ছে। কোনটিকে এক পক্ষ সুন্নত সাব্যস্ত করলে অপর পক্ষের মতে তা বিদআত। এমতাবস্থায় আমরা কাকে মানব আর কাকে পরিত্যাগ করব ? সবাইর কথায় আমল করা তো সম্ভব নয়। এক পক্ষকে অপর পক্ষের ওপর প্রাধান্য দিলে তার ভিত্তিই বা কি হবে ? এ জাতীয় প্রশ্ন মুসলমানদেরকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। তাই কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবাইকে

বর্জন করার। বন্ধুগণ! এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু দুঃখ এ জন্য যে, একই মতভেদ যখন পার্থিব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দেখা দেয় তখন সে ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত না নিয়ে এক পক্ষের প্রাধান্য কেন গৃহীত হয় ? অর্থাৎ প্রায়শ এমনটি হতে দেখা যায়—কোন রোগীর চিকিৎসা বিষয়ে চিকিৎসকদের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকম দাঁড়ায়, একেকজন একেক রকম ব্যবস্থাপত্র লিখে। আর তাদের প্রত্যেকেই নিজের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত এবং প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাকে মারাত্মক ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। এ ক্ষেত্রে আপনাদের পক্ষ থেকে সকল চিকিৎসককে কেন বর্জন করা হয় না আর কেন বলা হয় না, আফসোস! চিকিৎসকদের মধ্যে ঐক্য নেই। যাও রোগীকে মরতে দাও, কারো চিকিৎসারই দরকার নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে কোন একজনের প্রাধান্য বিবেচনা করে তার হাওয়ালায় রোগের চিকিৎসা কেন চলতে দেয়া হয় ? অনুরূপ আলিমদের ন্যায় আচরণ উকীলদের বেলায় কেন করা হয় না। উকীলদের মধ্যে কি মতবিরোধ ঘটে না ? অবশ্যই ঘটে কিন্তু সেক্ষেত্রে উকীলদের একজনকে অপরের ওপর নিশ্চয়ই প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে তো সকল উকীলকেই বর্জন করা হয় না ? আপনাদের কাছে এ প্রশ্নের কি জবাব ? চলুন আমি নিজেই এ রহস্যের জট খুলে দেই। তাহলো বিষয়বস্তু দু ধরনের হয়। প্রথমত যেগুলোকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়, দ্বিতীয়ত যে সব বিষয় দরকারী জ্ঞান করা হয় না। এখন বাস্তবের ভাষা হলো—মতবিরোধের দরুন প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেয়া হয় না। মতভেদ সত্ত্বেও বিবেক-বিবেচনা দ্বারা একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিয়ে ব্যবস্থা একটা করাই হয়। আর মতপার্থক্য ইত্যাদির কারণে নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় ছেড়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে চেষ্টা-তদবীরের ঝামেলায় যাওয়া হয় না। এই হলো মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি। এরই প্রেক্ষাপটে এখানেও বিচার করা হয় যে, মানুষের মধ্যে প্রাণ ও ঈমান দুটি জিনিস বিদ্যমান। প্রাণ যেহেতু মানুষের প্রিয় জিনিস,কাজেই নিরাপত্তার খাতিরে "গুণীজনদের পারস্পরিক মতবিরোধ হয়েই থাকে"—এ নীতিবাক্যের আশ্রয়ে উপায় খোঁজা হয় যে, ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন, নিজেদের মঙ্গলকামীদের পরামর্শ এবং বিচার-বিবেচনার দ্বারা সর্বাধিক বিজ্ঞ চিকিৎসকের আমরা শরণাপন্ন হব। কিন্তু ঈমান যেহেতু প্রিয় নয় তাই আলিমদের মতভেদের ক্ষেত্রে নিজেদের বিবেক খাটিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিশ্রমে মন সায় দিতে চায় না। কাজেই ভাইসব! ঈমানকেও যদি প্রিয়বস্তু মনে করা হতো, তা হলে বিজ্ঞ চিকিৎসক নির্বাচনের ন্যায় যোগ্যতম আলিম বাছাই করাটা আদৌ কষ্টকর ছিল না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় হলো—ঈমানের অপ্রিয়তার দরুন আলিম মাত্রই বর্জনীয় মনে করা হয়। অবশ্য মতভেদের প্রেক্ষিতে আলিমরা ত্রুটিমুক্ত

আমার কথা এটা নয়, দোষ তাদের অবশ্যই রয়েছে এবং কে দোষী পরবর্তী পর্যায়ে তার প্রতি আমি ইঙ্গিত দেব কিন্তু আপনাদের আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্যই করব যে, সে মতবিরোধের অজুহাতে সবাইকে বর্জনীয় সাব্যস্ত করা ঈমানের অপ্রিয়তার পরিচায়ক। মতভেদের দরুন কেউ কেউ পরামর্শ দেয়—আলিমদের একমত হওয়া উচিত, অনৈক্য নিন্দনীয়। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি—মতবিরোধ মাত্রই কি অপরাধ ? নাকি এর কোন শর্ত-শরায়েতও আছে ? অনৈক্য যদি শর্তহীন অপরাধ এবং এ কারণে উভয় পক্ষ অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহলে কোর্টে মামলা দায়ের করামাত্র শুনানির আগেই আদালতের উচিত বাদী-বিবাদী উভয়ের শাস্তি বিধান করা। কারণ অভিযোগ এবং অস্বীকৃতির দরুন উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ প্রমাণিত হয়েছে, যা শর্তহীন অপরাধ আর আসামী-ফরিয়াদী উভয়ে সমভাবে সে অপরাধে অপরাধী। আদালতের এ জাতীয় সিদ্ধান্তে সর্বাগ্রে আপনাদের পক্ষ থেকেই প্রতিবাদের ঝড় তোলা হবে—"এই কি ন্যায়বিচারের নমুনা, মামলা তদন্তের আগেই উভয় পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো!" যদি কেউ আপনার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করে—"তাহলে করণীয় কি ছিল ?" বিজ্ঞের ন্যায় আপনিই তখন রায় দেবেন—বাদী-বিবাদী উভয়ের বিরোধপূর্ণ বিষয়টি যথাযথ তদন্তপূর্বক ন্যায়-অন্যায় চিহ্নিত করে—"দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" এই স্বীকৃত নীতি অনুসারে অপরাধীর দণ্ডবিধান বাঞ্ছনীয় ছিল। নিন, আপনার বিচার দ্বারাই প্রমাণ হলো যে, অনৈক্য ও মতবিরোধ মাত্রই অপরাধ নয়। সত্যনিষ্ঠ মতভেদ নয় বরং ন্যায়-নীতি বিবর্জিত অনৈক্যই আসলে অপরাধ। বস্তুত কোন বিষয়ে দুই দল হয়ে যাওয়াতে উভয়পক্ষই অপরাধী আখ্যা পাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্যায় মতভেদকারীই মূলে অপরাধী, ন্যায়নিষ্ঠ বিরোধকারী নয়। অতএব, উলামাদের পারস্পরিক মতভেদের দরুন ঢালাওভাবে উভয় দলকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রত্যেক পক্ষকে প্রতিপক্ষের সাথে আপসরফা এবং ঐক্য স্থাপনের নির্দেশ দেয়া ভ্রান্ত রায়। প্রথমত আপনার বরং উচিত হবে ন্যায়-অন্যায় যাচাই করা, অতঃপর অন্যায়কারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে হকপন্থীর সাথে ঐক্য স্থাপনে বাধ্য করা। নতুবা হকপন্থীকে প্রতিপক্ষের সাথে আপসে বাধ্য করার অর্থ এই দাঁড়ায়—হক ও ন্যায়নীতি পরিহার করে অন্যায় পন্থা অবলম্বনে উৎসাহ যোগানো। এ যুক্তি কোন বিবেকবান ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে না। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এটুকুই যে, তদন্ত না করেই আপনারা সকলের প্রতি ঐক্যের আহবান জানাচ্ছেন। অবশ্য আলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আমাদের নেই তা নয়। কিন্তু সেটা কেবল না-হকপন্থীদের বিরুদ্ধে। যদি বলা হয়—জনাব! অপর পক্ষও আপস করতে বাধ্য। কেননা যেটা

তাদের জ্ঞানে ধরে এবং যতটুকু বুঝে আসে তাই তারা হক মনে করে। তাহলে জনাব, এ জাতীয় মতভেদ তো আল্লাহ্র রহমত, এর দ্বারা ফিতনা-ফাসাদ আসতে পারে না। লক্ষ করুন, আমাদের চার ইমামের মধ্যে মতবিরোধ তো কেবল বুঝের মধ্যেই। অতঃপর সবাই তাঁরা একমত। একে অপরের বিরুদ্ধে তাঁদের কারো কোন নিন্দাবাদ নেই, কটাক্ষ বা বিরূপ সমলোচনাও নেই। প্রত্যেকেই একে অপরকে হকপন্থী মনে করেন। মতবিরোধের ধরন যদি এই হতো তাহলে মুসলমানদের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থা হওয়ার কথা ছিল না। বর্তমানের এ মতভেদ মূলত রুটি প্রসূত বিরোধ। আমি বলে থাকি—হকপন্থীদের কাছে যদি যথেষ্ট অর্থ থাকত আর ঐসব দল-উপদলের জন্য মাসিক বেতন ধার্য করে দেওয়া যেত তাহলে সব রকম মতানৈক্য এক দিনেই শেষ হয়ে যেত। এসব মতভেদ শুধু স্বার্থকেন্দ্রিক। সুতরাং কেউ মিলাদের ওপর, কেউ ফাতিহার ওপর আবার কেউ চল্লিশার ওপর জোর দেয়। এক বিদআতী মৌলবীকে কেউ জিজ্ঞেস করল—আপনি মৌলুদ-ফাতিহার মহিমায় পঞ্চমুখ এবং এর বিরোধীদের গালমন্দ দিয়ে থাকেন অথচ আপনার পরিবারের মহিলারা বেহেশতী জেওর পাঠ করে, এর কারণ কি? (উল্লেখ্য, আল্লাহ্র মেহেরবানী বেহেশতী জেওর কিতাবখানা সারা দেশের মুসলমানরা পরিবারের মহিলাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, সে যে পন্থীই হোক না কেন। সুতরাং উক্ত মৌলবীর পরিবারের মহিলারাও বেহেশতী জেওর পাঠ করত)। নিজ পেটের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন—এই হলো সমস্ত মতভেদের মূল। অন্যথায় বেহেশতী জেওরের বক্তব্যই সঠিক। লক্ষ্ণৌতে একবার প্রতিটি খাদ্যের ওপর পৃথক পৃথক ফাতিহা পাঠের রেওয়াজ লক্ষ করলাম। এক পর্যায়ে সেখানে কিছু বলার সুযোগ হলে আমি বললাম—দরূদ-ফাতিহা সুন্নত কি বিদআত তা পরীক্ষার সহজ উপায় হলো—দরূদ-ফাতিহা পাঠকারী মৌলবীদের নযরানা কিছুই না দিয়ে তাদের দ্বারা বেশি বেশি মৌলুদ পড়াতে থাকুন, পৃথক পৃথক তশতরীতে ফাতিহা পড়িয়ে নিন কিন্তু মণ্ডা-মিঠাই, টাকা-কড়ি নযরানা মোটেই দেবেন না। দেখবেন তারা নিজেরাই একে বিদআত বলে প্রচার শুরু করবে।

সুতরাং কেউ কেউ এর ওপর আমল করলে সেদিনই সন্ধ্যায় ফাতিহা খাঁ মৌলভী সাহেব বলতে লাগলেন, পৃথক পৃথক ফাতিহা পড়া বাস্তবিকই একটা ফালতু বাজে প্রথা মনে হয়, একটাই তো যথেষ্ট। মনে মনে বললাম, এখন তো বুঝবেই। (নযরানা নাই কি-না!) বন্ধুগণ! আমার কথা হলো—তাদের আমদানি বন্ধ করে দিন, দেখবেন তারা নিজেরাই প্রচার করবে—"এসব ঠিক নয়, ফালতু রেওয়াজ।" মূলত এসব রুজি-রোজগারের বাহানা মাত্র।

একবার এলাকায় জোর মহামারী দেখা দিলে লক্ষ করলাম সানা পড়া, ফাতিহা দেয়া, দশমী ইত্যাদি সব রহিত হয়ে গেল। নীরবে দেখতে থাকি। মহামারীর প্রকোপ কমে আসলে লোকদের বললাম—কি ভাই, সানা-ফাতিহা ইত্যাদি কি হলো ? দশমী ইত্যাদি বন্ধ কেন ? বলতে লাগল—হুযূর, এসবের অবসর কোথায় ? বললাম—ছেড়ে দিয়েছ ? বলল, না। আমি বললাম—মনে রাখবে, যে কাজ বন্ধ হয়ে যায় বুঝতে হবে সেটা দীনের কাজ ছিল না, ছিল অবসর কাটানোর ব্যবস্থা। আর দীনের কাজ শত ব্যস্ততার মধ্যেও ছাড়া যায় না। অতএব, সে নিরুত্তর হয়ে গেল। একবার জনৈক গ্রাম্য লোক বলতে লাগল—ফাতিহা পাঠে ক্ষতিই বা কি বরং সূরা-কিরাআতের সওয়াব দ্বারা মৃতের উপকারই হয়। বললাম—উপকার তো কেবল খাদ্যদ্রব্যের সাথে নির্দিষ্ট নয়, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় দ্বারাও তো সম্ভব। তাহলে টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড়ের ওপরও কি কখনো ফাতিহা পড়া হয় ? কখনো না। না কেন ? সূরার সওয়াব পৌঁছত, তাতে মৃতের উপকারই তো ছিল। বলতে লাগল—বস্, বুঝে আসছে, আপনি ঠিকই বলছেন।

ভাইগণ! পরিষ্কার কথা, এসব পন্থা আমদানির লক্ষ্যে আবিষ্কৃত। মৌলুদ পাঠকারীদের আমদানি বন্ধ করে দেয়া হলে দেখবেন তারাও আমাদের ভাষায়ই কথা বলছে। এ সভায় সকল স্তরের মানুষের বোধগম্য মোটা কয়টি কথা রাখলাম, সুন্নত-বিদআতের পরিচয়ের সঠিক পন্থা জানা থাকা সত্ত্বেও তার তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করা হয়নি। কবি বলেন ঃ

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز

ورنہ در مجلس رنداہ خبرے نیست کہ نیست

—ভেদের কথা বাহিরে প্রকাশ না করাই উত্তম, নতুবা আল্লাহ্ওয়ালাদের অজানা-অজ্ঞাত কোন খবরই নেই।

অবশ্য কেউ যদি জানার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং আমাদের সাহচর্য গ্রহণ করে তাকে সে উপায় নির্দেশ করা যেতে পারে।

মোটকথা, আমার বক্তব্য ছিল মতবিরোধ মাত্রই অভিযোগের লক্ষ্য হতে পারে না; বরং প্রথমে আপনাদেরকে সত্য নির্ণয় করে নিতে হবে। অতঃপর লক্ষ করুন, মতবিরোধকারী পক্ষদ্বয়ের কে হকের ওপর আর কে না-হক পথে দণ্ডায়মান। এভাবে হক-বাতিলের পরিচয় জানা যেতে পারে। আরেকটা সহজ পথ আমি ব্যক্ত করছি। মানুষ সাধারণত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দু-রকম হয়ে থাকে। শিক্ষিতরা যদি উর্দু

শিক্ষিতও হয়, তবে এদের পক্ষে সত্য যাচাইয়ের নিয়ম হলো—নিরপেক্ষ ও পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে উভয় পক্ষের আলিমদের লিখিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করবে। পক্ষপাতিত্বের কল্পনাই অন্তরে স্থান দিবে না, কোন এক দিকে ভক্তির ভাব পোষণ করবে না। কারণ ভক্তির নেশায় তার দোষ চোখে ভাসবে না বরং সব কথাই সুন্দর মনে হবে। তাই সত্য সন্ধানের পন্থা এটা নয়। বরং বিশুদ্ধ মনে উভয় পক্ষের কিতাবাদি পাঠ করাই এর উপায়। আরো মনে রাখতে হবে—ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ঘটনা বিশ্লেষণ করা দরকার। সত্যকে জানার সত্যিকার আগ্রহ বিদ্যমান থাকলে ইনশাআল্লাহ্ অন্তরে তা প্রতিভাত হবেই। একজনের হকপন্থী হওয়া প্রমাণ হওয়ার পর তারই সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এখান থেকেই দীনের কথা এবং খোদার রাহের সন্ধান লাভের চেষ্টা করুন। কিন্তু অন্যজনকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ নিন্দা চর্চায় আপনার কোন লাভ নেই। তাই নিজের পরিবেশ এভাবে গড়ে তুলুন ঃ

همه شهر پر زخوباں منم و خیال ما هے

چه کنم که چشم بدخونه کند بکس نگا هے

—সারা শহর সুন্দরী-রূপসীতে পরিপূর্ণ, কিন্তু আমি আমার প্রেমাস্পদের চিন্তায় বিভোর। কি করি, দুষ্ট চোখ যে অন্য কারো প্রতি নযরই তোলে না।

অধিকন্তু কবির ভাষায় ঃ

دل آرا میکه داری دل در و بند

دگر چشم از همه عالم فرو بند

—হে মন! তোমার যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাসনা থাকলে জগতের অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র প্রিয়জনের সাথেই আত্মার বাঁধন সৃষ্টি কর।

আসলে কেউ মন্দ যদি হয়ও তুমি তাকে খারাপ বলতে যেও না। এমনকি তোমার মন্দ চর্চায় লিপ্ত থাকলেও না। কেননা পরের নিন্দা চর্চায় তোমার কি লাভ? কেউ অপকৃষ্ট হলো, তাতে তোমার ক্ষতি কি? এ সম্পর্কে মনীষী 'যওক' বলেছেন ঃ হে 'যওক'! তুমি উত্তম হলে অধম কেউ হতে পারে না। মূলত অধম সে-ই, যে তোমায় মন্দ জানে। কিন্তু যদি নিজেই তুমি মন্দ হও, তাহলে তার কথা যথার্থ। তখন তার মন্দ বলায় তোমার অসন্তুষ্টির কি কারণ?

আলোচ্য নিয়ম শিক্ষিত সমাজের জন্য। কিন্তু যারা শিক্ষা-বঞ্চিত তাদের করণীয় হলো—দুজন আলিমের সাহচর্যে এক এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করবে এবং অবসর সময় জেনে তাদের সান্নিধ্যে বসবে, কথাবার্তা শুনবে আর লক্ষ করে যাবে শরীয়তের সর্বসম্মত মাসআলাসমূহের সার্বক্ষণিক সযত্ন পালনে কে অধিক সতর্ক। দ্বিতীয়ত, কার প্রভাবে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কোন আলিমের সান্নিধ্যে যাওয়ার পর যদি মনে আখিরাত ও ইবাদতের আগ্রহ বেশি হয়, খোদার নাফরমানীর প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও ভয় সৃষ্টি হয় এবং তার সাহচর্যে অবস্থানকারী লোকদের অধিকাংশের সার্বিক অবস্থা উত্তম ও উন্নত মানের হয়, তবে তাঁর সাহচর্যই গ্রহণ করবে। সময় সময় তাঁর নিকট যাওয়া-আসা অব্যাহত রাখবে। এ নিয়ম শিক্ষিত লোকদের জন্যও উপকারী। সান্নিধ্যে অবস্থান দ্বারা কারো আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা যতটুকু জানা যায় কেবল কিতাব পাঠ করে কোন আলিমের আসল রূপ ততটুকু জ্ঞাত হওয়া যায় না। কাজেই শিক্ষিতদের পক্ষেও আলোচ্য উপায় অবলম্বন করাটা অধিক উত্তম।

—আসবাবুল ফিতনাহ্, পৃষ্ঠা ৫৭

## ৭৮. "রোযা মাত্র তিনটি হওয়া উচিত" মন্তব্যের জবাব।

সম্প্রতি একটি প্রচারপত্র নিজের চোখে এইমর্মে প্রচারিত হতে দেখলাম যে, রোযা মাত্র এগার, বার ও তের (১১, ১২ ও ১৩) এই তিন দিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন এর সপক্ষে প্রবক্তাদের পেশকৃত চমৎকার দলীলও শুনুন। এ পর্যায়ে কুরআনে বর্ণিত ايام معدودات (নির্দিষ্ট কয়েক দিন) আয়াতাংশ মূলত তাদের দলীলের ভিত্তি। অথচ আয়াতের আসল মর্ম হলো—রোযার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের উৎসাহ দান এবং সাহস বৃদ্ধিকল্পে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের আতংকের কি আছে, রোযা তো মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। কিন্তু একে তারা হজ্জ সম্পর্কিত ايام معدودات অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের এগার, বার ও তের তারিখের ওপর ইজতিহাদ করে মাসআলা উদ্ভাবন করে নিয়েছে যে, রোযার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। কেননা কুরআনের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু তারা ভাবেনি যে, কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের তাফসীর করে বটে কিন্তু কখন ? এ অর্থ সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে এক আয়াতের তাফসীর তো নির্দিষ্টভাবে জানা কিন্তু অপর আয়াতের তাফসীর অজ্ঞাত। অথচ এখানে উভয় আয়াতের তাফসীর পৃথক পৃথক রূপে বর্ণিত ও জ্ঞাত। কিন্তু জ্ঞানান্ধরা এক স্থানের তাফসীর গ্রহণ করে অন্য আয়াতের তাফসীর উপেক্ষা করে গেছে। আমি বলব— ايام معدودات দ্বারা দ্বিতীয় আয়াতের ন্যায় এখানেও ১১, ১২ ও ১৩ অর্থ গ্রহণ করা হলে সে তো যিলহজ্জ মাসের তারিখ হবে।

ফলে যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ রোযা রাখা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সাব্যস্ত হবে। অথচ এ কয়দিন আইয়ামে তাশরীক, যাতে রোযা পালন সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। সুতরাং এখন ফল এই হলো যে, কুরআন দ্বারা এমন দিনে রোযা রাখা ফরয যেদিনের রোযা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কি চমৎকার ইজতিহাদ। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো— اياما معدودات -এর অর্থ সবখানেই যদি একই ১১, ১২ ও ১৩ হয় তবে ইহুদিদের দাবি لن تمسنا النار الا اياما معدودات ( যে মাত্র কয়েকদিনই আমাদেরকে জাহান্নামবাসী হতে হবে) এর অর্থও কি উক্ত তিন দিনই হবে? কেউ কি ঈমানদারীর সাথে বলতে পারে যে, ইহুদিদের উদ্দেশ্যও যিলহজ্জ মাসের উক্ত তারিখই এবং এ কয়দিনই তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে? এখানেও যদি অর্থ এ-ই হয়, তাহলে কথাটা এমন হলো যে—"যে কালা সেই আমার বাপের শালা।" মোটকথা—এমনিভাবে মানুষ নানান ফিতনা সৃষ্টি করে নিয়েছে, ইসলামী হুকুমত ব্যতীত এসবের নির্মূল-নিধন আর কত করা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষেই কেবল এসবের উৎখাত সম্ভব। —আজরুস্সিয়াম মিন গাইরি ইনসিরাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯

## ৭৯. অসুবিধার দরুন তাবলীগের দায়িত্ব রহিত হয় কি-না, এ সন্দেহের জবাব।

এর জবাব হলো—প্রথমে সৎকাজের আদেশ এবং তাবলীগের কাজ আপনারা শুরু করুন, এরপর দেখুন গাড়ি কোথায় আটকে, ফতোয়া জিজ্ঞেস করবেন তখন। আগেই ওযরের মাসআলা জিজ্ঞেস করার অর্থ—জান বাঁচানোর বাহানা তালাশ করা। সে অধিকার আপনার কোথায়? শক্তির বাইরে শরীয়তের হুকুম নেই, মুসলমান মাত্রেরই তা জানা। আর অন্যান্য ব্যাপারে এ ধরনের ওযর-আপত্তি কেউ উত্থাপনও করে না। যেমন—সময়ে বিশেষ ওযরের কারণে অযূ করা এবং দাঁড়িয়ে নামাযের মধ্যে দাঁড়ানোর হুকুম রহিত হয়ে যায়। কিন্তু কাউকে যখন নামাযের কথা বলা হয় সে তখন এ প্রশ্ন তোলে না যে, প্রথমে বলুন—কি কি কারণে অযূ এবং কিয়াম রহিত হয়? কেননা নামায পড়া সবাই জরুরী আর ওযরকে সাময়িক মনে করে। তদ্রূপ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কেউ বলে না—হাকিম সাহেব, খাওয়ার শর্ত কি এবং কখন ত্যাগ করতে হবে আগে বলুন। কারণ সবাই জানে—খাদ্য অপরিহার্য আর ত্যাগ করাটা সাময়িক ব্যাপার। একইভাবে রমযানের রোযা, যারা মনে করে রমযান মাসে রোযা রাখা অপরিহার্য তাদের প্রশ্ন কখনো এরূপ হয় না—মাওলানা সাহেব বলে দিন কি কি কারণে রমযানের রোযা রহিত হয়ে যায়। বরং এ জাতীয় প্রশ্নকর্তাকে বে-রোযার দলে গণ্য করা হয়।

অতএব জনাব, আপনার কর্তব্য ছিল সৎকাজের আদেশ দানের কাজ প্রথমে শুরু করে দেয়া। অতঃপর কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে উপদেশ দানে অথবা কাফিরকে দীনের তাবলীগ করার ব্যাপারে কোথাও আটকে গেলে তখন মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, হুযূর এখন কি করা ? আপনারা শাসক-শাসিত, মুসলমান-কাফির, স্ত্রী-সন্তানকে সৎকাজের আদেশ দানের আগেই শুরু করলেন ওযরের মাসআলা জানতে। আপনারা হয় তো বলতে পারেন—নামায-রোযার ওযর অপেক্ষা সৎকাজের আদেশ দানে বাধার পরিমাণের হার অধিক। আমি বলি—এটা ভুল কথা। পরিবারের লোকদের সৎকাজের আদেশ দানে, বে-নামাযী স্ত্রীকে উপদেশ দানে ও শাসন করাতে ভয় কিসের ? সে কি আপনাকে মেরে ফেলবে ? বে-নামাযী ছেলেকে শাসন করলে আপনার কি ক্ষতি হবে ? যদি আপনি বলেন—সে অবাধ্য, কথা শোনে না। তাহলে আমি বলব—ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে তার ওপর কেন আপনার শাসনের মার পড়ে, তখন সে আপনার কথা কিরূপে শোনে ? তাই বোঝা গেল —এ সবই টালবাহানা মাত্র। আসল কথা হলো—এটাকে আপনি অপরিহার্য মনেই করেন না। আপনার কোন প্রিয়জন চোখের সামনে বিষপানে উদ্যত হলে আপনার করণীয় কি হবে, আপনি কি তাকে বিরত রাখবেন না ? এ ক্ষেত্রে তো আপনি বলপূর্বক তার হাত থেকে বিষের পাত্র ছিনিয়ে নেবেন, একা সম্ভব না হলে অবশ্যই সহায়ক জোটাবেন। তাহলে দীনের ব্যাপারে ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষার এ পরিমাণ যত্ন কেন হয় না ? বোঝা গেল—দীনের ক্ষতি আপনাদের নযরে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা একটা প্রতিকারবিহীন মারাত্মক ব্যাধি। ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া সবাই এত উদাসীন যে, চিকিৎসার প্রতি কারো মনোযোগ নেই।

—তাওয়াসী বিল-হক, ১ম খণ্ড

## ৮০. তাবলীগের সহজ পন্থা।

নির্দিষ্ট নাম-ধাম ছাড়া দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে জিলায় জিলায় তাবলীগী জামাত প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য, এমনকি দায়িত্বশীলদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা আজকাল সভা-সমিতির নিয়মনীতি এবং দায়িত্বশীলদের ফিরিস্তিতে রেজিস্টার খাতা বোঝাই করা হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অথচ আমরা চাই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ হোক। বিরাট পরিকল্পনার কথা চিন্তা না করে প্রথমে ছোট আকারেই কাজ শুরু করুন। আমাদের অবস্থা হলো—কাজ করি তো অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে করি নতুবা একেবারেই করি না। ভাবখানা এই—"খাব তো ঘিয়ে-ভাতে—যাব তো মনের স্রোতে।" এটা বড়ই বোকামি।

স্মরণ থাকা দরকার, যে কোন কাজের সূচনা হয় ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে, ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে ওঠে। এ পার্থিব জগতে আল্লাহ্ তাঁর কাজের গতি ধীরে এবং ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশ করেছেন। মানব অস্তিত্বের সূচনায় এক বিন্দু পানি, পরে দীর্ঘ নয় মাসে তার জন্ম, অতঃপর লালন-পালন ও বিকাশের ক্রমধারায় পনর বছর বয়সে তার যৌবনে পদার্পণ। অথচ মহান আল্লাহ্ জান্নাতের ন্যায় দুনিয়াতেও মুহূর্তের ব্যবধানে সবকিছু সম্পন্ন করতে সক্ষম। যেমন—জান্নাতে কারো সন্তানের কামনা হবে আর স্ত্রীর সাথে মিলন-মুহূর্তেই স্ত্রী গর্ভধারণ করবে এবং তৎক্ষণাৎ সন্তানের জন্ম হবে। এমনকি একই সময় ছেলে পিতার সমপর্যায়ে বেড়ে উঠবে। আল্লাহ্ কর্তৃক সে দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপিত না হয়ে ধীরে ক্রমান্বয়ে তাঁর কর্মনীতির প্রকাশ আমাদের শিক্ষার জন্যই তো যে, কর্মের সূচনাতেই তোমরা সমাপ্তির ধারণা পোষণ করো না। বরং সূচনা কর তোমরা ক্ষুদ্র আকারে এবং যত্ন পরিচর্যায় লেগে থাক। ধীরে ধীরে একদিন তা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবে। সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করার জন্যই তোমরা আদিষ্ট, এর অধিক নয়। এতেই আল্লাহ্ বরকত দিবেন। সাড়ম্বরে সমিতির নাম দিয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ দ্বারা নিট ফল কিছুই আসে না। বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে এবং পত্র-পত্রিকায় নাম তুলে প্রচারণা দ্বারা তেমন লাভ হয় না। মূলত কর্মই কল্যাণ বয়ে আনে যদি তা অল্পও হয়। অতএব, নিজেদের সংখ্যাল্পতার প্রতি লক্ষ না করে দু-চারজন মিলেই তাবলীগ শুরু করুন। মহান আল্লাহ্ মাত্র একক ব্যক্তিত্বের কল্যাণে সাড়া বিশ্বে ইসলাম পৌছিয়েছেন। সে একই আল্লাহ্ এখনো বর্তমান। তাঁরই ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ কুরআন পাকে সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَـــاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰــى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الــزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ –

—তাদের দৃষ্টান্ত যমীনে প্রোথিত বীজের ন্যায়, যা থেকে অংকুরোদগম হয়, অতঃপর আলো-বাতাসের পরশে তা শক্ত ও পরিপুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।

অতএব, ক্ষুদ্র দানা থেকে উদ্গত চারাগাছ পাড়া জুড়ে ছায়া বিস্তারকারী প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হতে আপনারা লক্ষ করেছেন। উদ্ভিদের সামান্যতম বীজের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে মুষ্টিমেয় দু-এক ব্যক্তির পদক্ষেপ দ্বারা তাদের কাজের অগ্রগতি ও উন্নতি বিচিত্র কি। কিন্তু আজকাল মুশকিল হলো—কোন

কাজ শুরু করার পূর্বেই বিবৃতি ছাপার উদ্দেশ্যে পত্রিকা অফিসে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়, শুরু হয় বিজ্ঞাপন ছাড়ার পালা। ভাইগণ! এটা 'রিয়া' (লোক দেখানো) নয় কি, আর তা কি নিষিদ্ধ নয় ? এ হুকুম কার জন্য, কাফেরের প্রতি ? আদৌ না। মুসলমানদেরকেই বরং 'রিয়া' ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা মূল বিষয় ঈমান গ্রহণে আদিষ্ট, আনুষঙ্গিক (فروع) বিষয়ে নহে। এ প্রসঙ্গে কারো কারো মন্তব্য—অন্যদের উৎসাহের জন্য আমরা প্রচারের পক্ষপাতী, নিজেদের সুনামের জন্য নয়। আমি বলব—জনাব থামুন, এটা বাক-চাতুরী ও অপব্যাখ্যা বৈ অন্য কিছুই নয়। নিজের অন্তর হাতিয়ে দেখুন সুনাম-সুখ্যাতির অদম্য আগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই সেখানে পাওয়া যাবে না। বাস্তবিক যদি কারো উদ্দেশ্য অপরকে উৎসাহ দান করা হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও এর প্রচারণার পূর্বে কোন বিজ্ঞ আলিমের পরামর্শ জেনে নেয়া উচিত। —তাওয়াসী-বিল হক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

### ৮১. মুজতাহিদগণের মতবিরোধের প্রকৃত কারণ।

একাধিক সুন্নতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মূল উদ্দেশ্য কোন্‌টি এবং কোন্‌টি আনুষঙ্গিক তা চিহ্নিত করাই মুজতাহিদগণের কাজ। যে কেউ এ কাজের যোগ্য নয়। এ ইজতিহাদ-কাজে সময়ে মতবিরোধও ঘটে যায়। যেমন নামাযের মধ্যে "রাফয়ে ইয়াদাইন" (হাত ওঠানো) করা এবং না করা উভয় প্রকার রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রমাণিত। তাই এ বিষয়ে মুজতাহিদগণের মতবিরোধ হয়ে যায়। একজন মনে করেন, "রাফয়ে ইয়াদাইন" করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মূল উদ্দেশ্য আর 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না করা উদ্দেশ্য নয় বরং কেবল বৈধতা প্রমাণ করাই লক্ষ্য। অপরপক্ষে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' যারা সমর্থন করেন না তাঁদের বক্তব্য হলো—নামাযের মধ্যে মনের একাগ্রতা অপরিহার্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে লক্ষ করে বলেছেন ঃ "তোমাদের কি হলো যে, নামাযের মধ্যে তোমরা হাত ওঠাও। নামাযে তোমরা একাগ্রতা অবলম্বন কর।" সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেল হাত না ওঠানো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য। অবশ্য সময়ে উঠিয়েছেন বৈধতা প্রমাণের জন্যে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়। যারা হাত ওঠানো মূল ওদ্দেশ্য মনে করেন এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এই যে, নিষিদ্ধ 'রাফয়ে ইয়াদাইন' (হাত ওঠানো) সেটা নয় যা রুকূতে যাওয়া ও ওঠার সময় করা হয় বরং তা হলো—সালাম ফিরানোর সময় যে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা হয়। কোন কোন হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ নামাযের সালাম ফিরানোকালে হাত তুলে বলতেন—আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সালামকে নিষেধ করেছেন।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়—বেশ, স্বীকার করলাম 'রাফয়ে ইয়াদাইন' দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে একথা অবশ্যই প্রমাণ হয় যে, নামাযের মধ্যে একাগ্রতাই আসল কাম্য আর রফা (হাত ওঠানো) এর পরিপন্থী। অতএব, বিতর্কিত স্থানেও রফা মাকসূদ নহে। কেননা তা নামাযের আসল অবস্থা অর্থাৎ একাগ্রতা বিরোধী। পক্ষান্তরে হাত না ওঠানো একাগ্রতার অনুকূল বিধায় তা মাকসূদ ও কাম্য একইভাবে অন্য যেসব ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার কারণ এই ছিল যে, একজন এক বিষয়কে মাকসূদ মনে করেছেন অপর জন অন্য বিষয়কে। যেমন—আমীন বলা। কোন মুজতাহিদের মতে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন জোরে বলাটা শরীয়তের কাম্য কিন্তু আস্তে বলার উদ্দেশ্য বৈধতা নির্দেশকল্পে। অন্যদের অভিমত—কাম্য আস্তে বলাই। কারণ এটা দোয়া বিশেষ। আর দোয়া আস্তে করাই যুক্তিযুক্ত। কখনো উচ্চকণ্ঠে বলার অর্থ জানিয়ে দেয়া যে, আমীনও বলা হচ্ছে। অন্যথায় জানাই যেত না আপনি কখনো আমীন বলছেন কি-না। যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো কখনো 'সির্‌রী' (অনুচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ) নামাযের মধ্যে উম্মতের শিক্ষার উদ্দেশ্যে আয়াত বিশেষ উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে দিতেন। শরীয়তের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মুজতাহিদগণের কেউ এটাকে লক্ষ্য স্থির করেছেন, কেউ ওটাকে। কাজেই মতবিরোধ দেখা দেয়। বস্তুত বিষয়টিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে পারস্পরিক ঝগড়ার কারণ খতম হয়ে যায়। এই হলে মতভেদের মূল কারণ যার ভিত্তিতে সর্বত্র মতবিরোধ দেখা দেয়।

—আহকামুল মাল, পৃষ্ঠা ৩৩

## ৮২. দরূদে ইবরাহীমী উত্তম হওয়া সন্দেহের জবাব।

প্রশ্ন উঠেছে—

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم —

দরূদে মহানবী (সা)-এর দরূদকে ইবরাহীম (আ)-এর দরূদের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। এতে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগে—মুহাম্মদ (সা)-এর দরূদ অপেক্ষা ইবরাহীম (আ)-এর দরূদ উত্তম ও পরিপূর্ণ হওয়ার। এর উৎস হলো—মানুষের প্রচলিত ধারণা যে, তাশবীহের (তুলনা দেয়া) ক্ষেত্রে তুল্য বিষয় অপেক্ষা তুলনীয় বিষয়টি উত্তম ও শক্তিশালী হওয়া শর্ত। অথচ মূল ভূমিকাটিই ভুল। এ ক্ষেত্রে বরং কেবল স্পষ্ট ও প্রচলন-সমৃদ্ধ হওয়াই জরুরী, উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া অপরিহার্য নয়। স্বয়ং কুরআনে এর প্রমাণ বিদ্যমান। বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ —

—"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে একটি দীপ।"

এতে আল্লাহ্ আপন জ্যোতিকে প্রদীপের আলোর সাথে তুলনা করেছেন। অথচ নূরে রব্বানীর সাথে প্রদীপ-আলোর কোন সম্পর্ক কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীপের আলো মানব কল্পনায় বিরাজমান ও স্পষ্ট থাকার দরুন তার সাথে আল্লাহ্র জ্যোতির তুলনা দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে—চন্দ্র-সূর্যের আলোও তো মানব চিন্তায় বিদ্যমান এবং দীপের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, তাহলে এ-দুয়ের সাথে তুলনা না দেয়ার হেতু কি ? উত্তর এই যে, দীপ অপেক্ষা চাঁদ-সুরুজের আলো উজ্জ্বল, কিন্তু উভয়টির মধ্যে এক প্রকার ত্রুটি রয়েছে। সূর্য-কিরণের ত্রুটি হলো—এতে দৃষ্টির স্থিতি আসে না। তাই সূর্যের আলোর সাথে তুলনা করা হলে শ্রোতার মনে সন্দেহ জাগা বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্র নূর সম্ভবত এ ধরনেরই যে, এতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা দায় হবে। ফলে জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) সম্পর্কে নৈরাশ্য সৃষ্টি হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়। আর চাঁদের আলোর সাথে তুলনা না করার কারণ শ্রুতি রয়েছে যে, চাঁদের আলো সূর্যের আলো থেকে প্রতিফলিত। কাজেই তার সাথে তুলনা করায় সন্দেহ রয়েছে—খোদায়ী জ্যোতিও বোধ হয় কারো থেকে প্রাপ্ত। উপরন্তু চন্দ্র-সূর্য অপেক্ষা প্রদীপের অতিরিক্ত একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অপরকেও সে জ্যোতির্ময় করে দেয়। ঘণ্টায় লাখো দীপে যে অগ্নি সংযোগ করে তাকেও সে সমশক্তিতে রূপান্তরিত করে দেয় কিন্তু তার আলোতে কোন প্রকার কমতি আসে না। অথচ চন্দ্র-সূর্য নিজ নিজ আলোয় আলোকিত, অপরকেও আলোর ভুবনে উজ্জ্বল করে দিতে সক্ষম কিন্তু কারো মধ্যে আলোক সঞ্চার দ্বারা আলোকাধারে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। যদি বলা হয়—চন্দ্র কিংবা সূর্য কিরণের মুখোমুখি আয়না রাখা হলে সে নিজে আলোকোজ্জ্বল হয়ে প্রাচীর পর্যন্ত আলোকিত করে দেয়। এর জবাব হলো—আয়না উদ্ভাসন ও আলোক প্রতিফলনের মাধ্যম মাত্র। আধার নয়। অথচ দীপ আলোর আধার রূপে গণ্য, খোদাই নূর যেরূপ স্থিতিশীল মাধ্যম। কিন্তু এ সামঞ্জস্য সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ না করুন, এর দ্বারা কেউ যেন অন্য খোদা বানিয়ে না নেয়।

মোটকথা, এ ক্ষেত্রে মূল কথা —নূরে রব্বানী নিজে জ্যোতির্ময় হওয়ার সাথে অপরকেও আলোকাধার বানিয়ে দিতে সক্ষম, যদিও উভয় কিরণে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান। আর এ বৈশিষ্ট্য প্রদীপেও বিদ্যমান, চাঁদ ও সূর্যে নয়। এসব হলো আনুষঙ্গিক রহস্য কথা, মূল উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজস্ব প্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়।

৮৩. আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার ব্যাপারে সংশয়।

কারো মনে সন্দেহ জাগা বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্‌র দরবার ও নৈকট্য সীমাহীন, যথা মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

اۓ برادر بے نہایت در گہیست
هرچه بروے میوسی بورئے مائیست

—ভ্রাতঃ আদিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন এ দরবার, নিঃসীম তাঁর সদন-সান্নিধ্য, চলা শেষে উপনীত তুমি যেখানে হবে তার পরও আমিই আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আল্লাহ্)।

অপর এক প্রেম-বিদগ্ধ আরেফ বলেছেন ঃ

نگردد قطع هرگز جاده عشق از دویدنها
كه مى بالد بخوداين راه چوں تاك از بريدنها

—প্রেমের সূক্ষ্ম পথ দৌড়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়, যতই কাটা হোক আঙ্গুর লতার ডগার ন্যায় আপনা থেকে তা বাড়তেই থাকে (অর্থাৎ প্রেমের পথও তদ্রূপ দীর্ঘায়িত হতে থাকে)।

সুতরাং এ পথের যেহেতু কোন সীমা নেই, প্রান্ত নেই, তাই তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছার কি উদ্দেশ্য ? কেননা চলমান ক্রিয়া একটা সীমিত বিষয়, যা অসীমের পথে কতই বা এগুতে পারে ? এর জবাব হলো —'পৌঁছা' (وصول) দুই প্রকার। (১) সীমিত ও (২) সীমাহীন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক (تعلق مع الله) দুই স্তর বিশিষ্ট। (১) سير الى الله —আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়া যা সীমিত এবং (২) سير فى الله —আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ভ্রমণ। এটা সীমাহীন। অতঃপর "সায়র ইলাল্লাহ"র মর্ম এই যে, রূহানী চিকিৎসার মাধ্যমে নফসের (অন্তর) রোগ নিরাময়ের পর আল্লাহ্‌র যিক্‌র-শোগল বা ধ্যান-ধারণা দ্বারা অন্তরের পুনর্গঠন শুরু হয়ে যাওয়া। এমন কি এখন তা যিক্‌রের নূরে পরিপূর্ণ এবং গাইরুল্লাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌তে আত্মনিবেদনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। সকল অন্তরায় বিদূরিত, আত্ম-ব্যাধির চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত আর আত্মশুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে কলুষিত চরিত্র দূরীভূত হয়ে গেছে। উপরন্তু অন্তর এখন পরিমার্জিত ও যিক্‌রের নূরে অলংকৃত, সৎকর্মের আগ্রহ চরিত্রের অঙ্গে পরিণত এবং আমল-ইবাদত সহজতর আর আল্লাহ্‌র সম্পর্ক এখন ঘনিষ্ঠতর সুতরাং সায়ের ইলাল্লাহর সমাপ্তি ঘটেছে। এরপর শুরু হয় "সায়র ফিল্লার" পর্যায়। এ পরিমণ্ডলে ব্যক্তির যোগ্যতানুসারে আল্লাহ্‌র যাত (সত্তা) ও

সিফাত (গুণাবলী) আবরণমুক্ত হতে থাকে। আর পূর্ব সম্পর্কের উন্নতি এবং রহস্য ও তত্ত্বপূর্ণ অবস্থার অব্যাহত বিকাশ শুরু হয়। বস্তুত এ পর্যায় সীমাহীন। আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্ট এ 'সম্পর্ক' লক্ষ করেই বলা হয়েছে ঃ

بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز اینکه جان بسپارند چاره نیست

—প্রেমের সাগর মূলত এক অকূল সমুদ্র, এ জগতে আত্মসমর্পণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

এর উপমা—এক ব্যক্তি বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সনদপত্র লাভ করল। অতএব তার যেন "সায়র ইলাল্লাহ্" (আল্লাহ্‌র দিকে পথ চলা) সমাপ্ত হলো। অতঃপর শুরু হলো তার বিজ্ঞান বিচরণ। অর্থাৎ বিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগের ফলে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া। এর কোন সীমা নেই, অনন্ত এ জগত। সুতরাং বিজ্ঞানীরা একমত যে, বিজ্ঞান গবেষণার ক্রমধারা অসীম—অকূল।

সুতরাং পার্থিব কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতার অবস্থা যদি এই হতে পারে, তাহলে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের تعلق مع الله অবস্থা কি হবে ? অপর একটি উপমা লক্ষ করুন—মনে করুন কোন একটি গোলক স্বীয় কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর গতি সঞ্চয় করে আপন বিন্দুতে পৌঁছে গেলে তার কেন্দ্রমুখী বিচরণ সমাপ্ত হলো। অতঃপর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকালে তার যে অব্যাহত প্রাকৃতিক গতি শুরু হয় এর কোন সীমা নেই, সমাপ্তি নেই। অতএব আলোচ্য—"আল্লাহ্‌র দিকে পথচলা" এবং "আল্লাহ্‌তে বিচরণ" বিষয়টিকেও একই রকম মনে করুন। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে "আল্লাহ্‌র মহান দরবার অসীম, অকূল, তাই এতে পৌঁছার অর্থ কি ?" এ সন্দেহ তিরোহিত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, সায়র ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দিকে পথ চলা) অর্থে "তা'আল্লুক মা'আল্লাহ্" (আল্লাহ্‌র সম্পর্ক) সীমিত ও গণ্ডিভূত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ স্তরে পৌঁছলেই শিষ্য খিলাফত এবং বায়'আত গ্রহণ করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। শিক্ষাসূচির নির্দিষ্ট একটি পর্যায় অতিক্রম ও উত্তীর্ণ হওয়ার পর যেরূপ সনদ দেয়া হয়। আর এটা একটা সীমিত ও সমাপনযোগ্য স্তর। অতঃপর আজীবন চর্চা দ্বারা জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও উন্নতি ঘটতে থাকে, যা সীমাহীন, সমাপ্তিহীন এবং উন্নতির অন্তহীন এক ক্রমধারা। অতএব, আল্লাহ্‌র সম্পর্ক ও সান্নিধ্যের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা হলে অসীম ও সসীম উভয় প্রকার বিশুদ্ধ।

—গায়াতুন্‌নাজাহ, পৃষ্ঠা ৩৮

**৮৪. আমল ছাড়া কারো কারো কামিল হওয়ার ভ্রান্তিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা।**

দীনের ব্যাপারে মানুষ চায় আল্লাহ্‌র সাথে এমনি গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠুক এবং প্রেম ভালবাসা এত তীব্রতা লাভ করুক যে, রোযা-নামায ইত্যাদি আল্লাহ্‌র হক যেন নিজে নিজে আদায় হয়ে যায়, আমাদের কিছুই করা না লাগে। কিন্তু এ অবস্থা মানুষের ইখতিয়ার বহির্ভূত, এতে বান্দার কোন হাত নেই। বস্তুত মানুষের কর্তব্য হলো—নিজের ইচ্ছাশক্তির বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো এবং ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের পিছনে না পড়া। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে বর্ণিত الطهر وهو شطر الايمان। (পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক)-এর ন্যায় উক্ত বিষয়টিকে আমি 'সুলুকের' (আধ্যাত্মিকতার) অর্ধাংশ মনে করি যে, ইচ্ছাধীন বিষয়ে ত্রুটি না করা আর ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের পিছনে লেগে না থাকা। আজকাল কেবল নামায-রোযাকেই মানুষ দীনরূপে গণ্য করে। অথচ এসব আমল দীনের অংশ মাত্র, এটুকুই পূর্ণাঙ্গ দীন নয়। স্মরণ রাখা দরকার—অনিচ্ছাধীন বিষয় অর্থাৎ 'হালাত' ও 'কাইফিয়াত' (বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা) কদাচিৎ যদি হাসিল হয়ও, তবে তা ইচ্ছাধীন আমলে লিপ্ত হওয়া দ্বারাই হয়। কিন্তু শর্ত হলো—অনিচ্ছাধীন বিষয় লাভের নিয়ত পর্যন্ত করা উচিত নয়। কেননা ফল লাভে বিলম্ব কিংবা অবিলম্ব ইচ্ছার বাইরের বিষয়। কখনো আমলের ত্রুটির দরুন বিলম্ব ঘটে, কখনো বান্দার দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে। কাজেই আমলের প্রতিফল লাভে নিজে সচেষ্ট না হয়ে বরং আল্লাহ্‌র হাওয়ালায় ন্যস্ত করে দেয়াই সমীচীন। বরং নিজেদের ক্ষমতাধীন বিষয়ের আমলে তোমরা যত্নবান হও। কবির ভাষায় ঃ

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

—মজদুরের ন্যায় মজদুরীর শর্তে তুমি ইবাদত-বন্দেগী করো না, কেননা মনিবের নিজেরই জানা আছে তার গোলামের লালন-পদ্ধতি কি হবে।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র নিজেরই জানা আছে তোমাদের পক্ষে কোন্‌টা সমীচীন আর কোন্‌টা অসমীচীন। কাজেই তোমার যোগ্যতাদৃষ্টে উপযোগী বিবেচিত হয় তো দান করবেন অন্যথায় বিপরীত ব্যবস্থা নিবেন। লক্ষণীয়, সন্তানের কল্যাণ বিবেচনা করেই মায়ের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গৃহীত হয় বাচ্চার আগ্রহ অনুসারে নয়। বিশেষত পিতা কখনো সন্তানের জিদে প্রভাবিত হয় না। অবশ্য মা কখনো ছেলের আবদারে বিগলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা নিজেদের বিবেচনা

অনুসারেই সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থাই নিয়ে থাকে, সন্তানের আবদার-আবেদন যাই থাকুক। মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

طفل می لرزد زنیش احتجام
مادر مشفق از اں غم شاد کام

—হাজামের সিংগার খোঁচার ভয়ে সন্তান তো থরথরিয়ে কাঁপে আর চিৎকার করে কিন্তু দয়ালু মা খুশী মনে বাচ্চার সিংগা লাগিয়ে দেয়।

কারণ মায়ের দৃষ্টি সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি। সুতরাং মাতা-পিতাও যেখানে সন্তানের মতে ব্যবস্থা নিতে রাযী নয়, সেক্ষেত্রে বান্দার মতানুসারে এবং তোমাদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করা আল্লাহ্‌র কি দরকার ? বস্তুত আল্লাহ্‌র সেখানে তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব এবং সত্তাগত মর্যাদার প্রশ্ন—গণপরিষদের ব্যাপার নয় যে, বান্দার ইচ্ছায় তাঁকে ব্যবস্থা নিতে হবে। মোটকথা, ইচ্ছাধীন আমলের ক্ষেত্রেও ইচ্ছাশক্তির বাইরের বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা সঙ্গত নয়। নিজের ক্ষমতা নেই এমন বিষয়ের প্রতি তাকানোই উচিত নয়। নিজের কর্তব্য কাজে ব্যাপৃত থাকা বাঞ্ছনীয়।

—রফউল ইলতিবাস আন্ নাফ্ঈল্ লিবাস, পৃষ্ঠা ৫

## ৮৫. বুযুর্গদের সংস্কার-নীতি সম্পর্কে সন্দেহের জবাব।

কারো কারো মতে সংশোধনের নীতি গ্রহণ করা হলে ভক্ত-মুরীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাবে। আমি বলব—প্রথমত এ ধারণাই ভুল। দৃশ্যত তোমাদের নিকট লোক সমাগম কম হতে পারে কিন্তু আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ভক্তের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। আচ্ছা বেশ, মেনে নাও মুরীদ কমই হলো তাতে অসুবিধার কি ? মুরীদের দলে সৈন্য ভর্তি করে কি তোমরা কোথাও অভিযানে পাঠাবে ? আর ভক্তের সংখ্যা যদি বাড়েই কিন্তু আশানুরূপ কাজ না হয় তাহলে এদের নিয়ে করবে কি ? মুরীদ ভক্ত অল্প হোক আর বাঞ্ছিত ফল ফলুক এতেই বরং শান্তি। কেননা লোকের ভিড়ে অযথা সময় নষ্ট হয়।

অন্যদের মনের আবেগের প্রেক্ষিতে নরম সুরে উপরোক্ত মন্তব্য করা হলো। নতুবা আমার ব্যক্তিগত রুচিমতে মানুষের অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমি শংকিত। কিন্তু লোক সমাগম যাদের পসন্দ, চারপাশে সর্বদা গণবেষ্টনী যাদের কাম্য, ভক্ত-মুরীদের সংখ্যাল্পতায় অবশ্যই তারা আতংকিত হবে এবং সংশোধনের পথ তারা এড়িয়ে যাবে। এ কারণেই বায়‘আত গ্রহণে আমার তাড়াহুড়া নেই, বহু শর্ত-শরায়েতের পর আমি বায়‘আত নেই। আমার কোন কোন হিতাকাঙ্ক্ষীর মতে,

এত সব কড়াকড়ি পরিহার করে সাধ্যমত মানুষকে নিজের সান্নিধ্যে জড়াতে দেয়া উচিত। কিন্তু আমার কথা হলো—জড়িয়ে নিয়ে সংশোধন করা যায়—তবে তো কল্যাণ নতুবা তরীকতের সাথে তাদের বন্দী হওয়াই সার হবে, কোন উপকার বয়ে আনবে না। কারণ দ্রুত বায়'আত নেয়া হলে তারা মনে করবে এ তরীকায় সম্ভবত আমলের গুরুত্ব কম। এখন বল, সে তরীকাবন্দী হলো কি-না ? কিন্তু যখন শর্ত দেয়া হবে প্রথম থেকেই তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মাবে যে, এখানে আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সে আমলে তৎপর হবে। এভাবে অব্যাহত তাকীদের ফলে তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটবে। আর এ শাসনটুকু সয়ে নিতে সক্ষম হলে আল্লাহ্ চাহেন তো দ্রুত সে পরিমার্জিত হয়ে উঠবে। যদি এ-না হয় তাহলে কেবল লোক ভর্তি করাই সার। মোটকথা, বাতিনী চরিত্র সংশোধন হওয়াই আধ্যাত্মিকতার গোড়ার কথা।

—আল্ জমআইন বাইনান্-নাফ্আইন, পৃষ্ঠা ২৭

**৮৬. প্লেগ থেকে পালিয়ে যাওয়া অসঙ্গত আচরণ।**

আমি বলি—পালিয়ে যাওয়া মূলত কৌশল নয় বরং অপকৌশল। কারণ মনের দুর্বলতা থেকে যেরূপ পলায়নী মনোভাবের উদ্ভব তদ্রূপ এটা মানসিক দুর্বলতার উৎসও। অর্থাৎ পলায়নকারী এ আচরণ দ্বারা অন্তরে দুর্বলতার প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বিধি-মতে এ জাতীয় সংক্রামক ব্যাধি দুর্বল অন্তরে সহজে ও সর্বপ্রথম কবজা জমায়। তাহলে পলায়নকারী পলায়ন মুহূর্তেই যেন নিজেকে প্লেগের কবজায় সোপর্দ করে দিল। মরণ তার এখানে না হোক অন্যত্র হবে। তাহলে বলুন প্লেগ ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা হলো কি প্রকারে।

দ্বিতীয়ত, আমি বলি—পালিয়ে যাওয়া যদি উপকারী হয়ও এবং পলায়নকারী প্লেগের কবল থেকে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা পেয়েও যায়, তা সত্ত্বেও এহেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপকারী কাজ থেকে নিষেধ করা শরীয়তের অধিকার স্বীকৃত। কেননা কোন কোন উপকারী জিনিস থেকে নিষেধ তো আপনারাও দিয়ে থাকেন। যেমন রণক্ষেত্র থেকে পালানো সকল জ্ঞানীজনের মতেই অপরাধ। অথচ পলায়নকারীর আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত উপকার এর সাথে জড়িত। কিন্তু আপনাদের নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত একে অপকৌশল আখ্যা দেয়। আমরাও তদ্রূপ প্লেগ থেকে পালানোকে অপকৌশল সাব্যস্ত করি। কারণ শরীয়তের প্রমাণ দৃষ্টে আমাদের মতে প্লেগ থেকে পলায়ন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালানোর শামিল। প্লেগ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

والفار منه كالفار من الزحف

—"প্লেগ থেকে পলায়নকারী যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।"

অপর এক হাদীসে প্লেগের স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়েছে ঃ وخز اعدائكم الجن। (তোমাদের শত্রু জিনদের আঘাতজনিত ব্যাধি) হিসেবে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, তখন অর্থাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাবকালে জিন ও মানুষের মুকাবিলা হয়। তারা তখন মানুষের দেহাভ্যন্তরে রক্তের মধ্যে যখম করে। ফলে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কাজেই মুকাবিলা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। এ কারণেই পলায়ন করা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। এ পর্যায়ে প্লেগের প্রকৃতি সম্পর্কে হেকিম ও আধুনিক চিকিৎসকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তারগণ রোগজীবাণুকে এর কারণ চিহ্নিত করেন। কিন্তু এটা হাদীসের মর্মবিরোধী নয়। কেননা এর কারণ এটা হোক কিংবা হেকিমদের উল্লিখিত বিষয়, মূল কারণ কিন্তু জিনদের আঘাত আর বাহ্যিক, মানুষের ধারণাকৃত রোগজীবাণু। দ্বিতীয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—এখান থেকে পালিয়ে যারা অন্যত্র গমন করে স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিতে তারা হেয়প্রতিপন্ন হয়। বিশেষত প্লেগের স্থান ত্যাগ করে কোন জনপদে বন্ধুর নিকট আশ্রয় নিলে ঘটনাক্রমে তার আগমনের পর বাড়ির কেউ আক্রান্ত হলে বাড়িওয়ালার নযরে সে লাঞ্ছনার পাত্রে পরিণত হয়। আচার-আচরণ ও হাব-ভাবে নিজেই সে অবস্থাটা অনুভব করতে পারে। কারণ বাড়িওয়ালার ধারণায় এ রোগ আগে ছিল না, হতভাগা এখানে আসাতেই এর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আর রোগী যদি ঘটনাক্রমে মারা যায়, তবে বাড়িওয়ালার দৃষ্টিতে তার এ মৃত্যু পলাতকের আমলনামায় লিস্টভুক্ত হয়ে থাকে। কবি বলেছেন ঃ

عزیزے کہ از در گہش سربتافت
بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

—কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র দরবার ত্যাগ করে যে কোন দরবারে আশ্রয় নিক কোন ইজ্জতই তার কপালে জুটবে না।

এ জাতীয় লোক এভাবেই দেশে দেশে প্লেগ জীবাণু ছড়ায়। অবশ্য সংক্রামক ব্যাধি আকারে নয় বরং ভিন্ন জনপদে পালিয়ে গিয়ে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে। এমতাবস্থায় পলাতক সম্পর্কে বস্তিবাসীর মন্তব্য হয়—আল্লাহ্ না করুন, আমাদের গ্রামে যেন এ দুষ্ট রোগ দেখা না দেয়। ফলে তাদের অন্তরে তখনি প্লেগ জীবাণু জন্ম নেয়। সুতরাং মহানবী (সা)-এর অসীম দয়া যে, তিনি প্লেগ থেকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। —আল্-জমআঈন বাইনান্ নাফ্আইন, পৃষ্ঠা ৪৩

## ৮৭. মুনাফিকের জানাযা নামায সম্পর্কে হযরত উমর (রা)-এর রায় উত্তম হওয়া সংক্রান্ত সন্দেহের জবাব।

এ প্রশ্নের জবাবে বক্তব্য হলো—হযরত উমর (রা)-এর রায়ও মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই রায় ছিল, তাঁরই ফয়েয ও বরকত ছিল এটা। কারণ হযরত উমর (রা)-এর মানসিকতায় কাফের-মুনাফেকদের প্রতি ঘৃণা ও রাগ-রোষ নবী-সাহচর্যেরই অবদান। নতুবা ইসলামপূর্ব জীবনে নিজেই তিনি এ প্রেরণাশূন্য ছিলেন, এমনকি রাসূল হত্যার অদম্য আশা নিয়েই তো তাঁর ঘরের বাইরে আসা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পরই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর মনে কাফের-মুনাফেকদের সম্পর্কে ঘৃণা ও রোষের সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু হযরত উমর (রা) কেবল উমরই ছিলেন। পক্ষান্তরে মহানবী (সা) একদিকে উমর অপর দিকে রাসূলও ছিলেন। বরং উপরে উঠে বলুন--তিনি ছিলেন--নূহ্, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ) প্রমুখ রাসূলের সমষ্টি। কবির কণ্ঠে ঃ

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری

آنچه خوباں همه دارند تو تنها داری

—ইউসুফের রূপ, ঈসার ফুঁক এবং মূসা (আ)-এর শুভ্র হাত তাঁদের সকলের এসব বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একক চরিত্রে সমাবিষ্ট।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্রে কাফেরদের প্রতি রাগ-রোষ যেমন তদ্রূপ তাদের প্রতি দয়ামায়াও ছিল মহান আকারে। কিন্তু তাঁর চরিত্রে দয়ারই ছিল প্রাধান্য। কাজেই রহমতের কোন সূত্র ও উসীলা পাওয়া মাত্র একে সদ্ব্যবহারে তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ জাতীয় কোন উপলক্ষ না থাকা অবস্থায় তিনি ক্রোধ প্রকাশে বাধ্য হয়ে যেতেন। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্য কাফের ছিল না। আর মুনাফিকদের বিধান ও বিঘোষিত কাফেরদের হুকুমের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান ছিল। পার্থিব বিষয়ে তাদের এবং মুসলমানদের আচরণবিধি ছিল অভিন্ন প্রকারের আর পরকালীন বিধান তখনো অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই দয়ার প্রাবল্যের দরুন পার্থিব বিধানের সাথে তুলনা করে তার সাথে তিনি মুসলমান মৃতদের ন্যায় আচরণ করছেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) ক্রোধ ও কঠোরতার আধিক্যবশে পার্থিব বিধানকে সাময়িক এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তিশীল ধারণা করে মুনাফিক তথা কপট মুসলমানের মৃত্যুর হুকুম বিঘোষিত কাফেরের সাথে তুলনা করেছেন। মূলত এটা হুযূর (সা)-এর ফয়েয ছিল যা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মহানবী (সা) দয়ার আধিক্য

হেতু প্রথমোক্ত তুলনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অবকাশ থাকা পর্যন্ত দয়া-রহমতের দিকটাই তিনি গ্রহণ করতেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর এহেন আচরণ মুসলমানদের প্রশান্তির কারণ। কারণ তাঁর চরিত্র ছিল ঃ

دوستاں را کجا کنی محروم

تو کہ بادشمنان نظر داری

"আপনার দয়ার দৃষ্টি শত্রু পর্যন্ত প্রসারিত, সে ক্ষেত্রে প্রিয়জনের বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।" অপর মনীষীর ভাষায় ঃ

چہ غم دیوار امت را کہ باشد چوں تو پشتیبان

چہ باك از موج بحر ان را کہ دارد نوح کشتی بان

—হে রাসূল (সা)! আপনার ন্যায় পৃষ্ঠপোষকের বর্তমানে উম্মতের কি ভয়, সাগর তরঙ্গে সে জনের ভয় কি যার নৌকার হাল নূহ নবীর হাতে।

এ প্রসঙ্গে যাহেরী আলিমদের নিকট আমার প্রশ্ন—কুরআনের আয়াত ঃ استغفر لهم او لا تستغفر لهم (তুমি তাদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর) দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনার অধিকার প্রদত্ত হওয়ার অর্থ কিরূপে গ্রহণ করলেন। অথচ আয়াতের মর্মানুযায়ী তাদের জন্য দোআ ও ইস্তিগফার করা আর না করা উভয় সমান, তাদের কোন উপকারে আসবে না। আরবীভাষীদের নিকটও বিষয়টা অজ্ঞাত নয়। অনুরূপ ঃ ان تستغفر لهم سبعين مرة (এদের জন্য তুমি সত্তরবার ইস্তিগফার করলেও) আয়াতাংশে সংখ্যার উল্লেখ সীমিতকরণ অর্থে বলা হয়েছে যে, সত্তরবার ক্ষমা চাইলেও মাফ নেই। ক্ষমা পেতে হলে সত্তরের অধিক বার মাফ চাওয়া লাগবে! এখানে সংখ্যার উল্লেখ মূলত এরূপ, আমাদের চলতি কথায় যেমন বলা হয়—একশবার বললেও মানব না, হাজারবার অনুরোধ করলেও কিছু হবে না। এ কথার অর্থ এই নয় যে, হাজারের অধিক বলাতে মাফ হবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ কথা কোন অবস্থাতেই মানা হবে না। সংখ্যার উল্লেখ কেবল আধিক্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে জোর দেয়ার জন্য, সংখ্যা নির্ণয়ের লক্ষ্যে নয়। অতঃপর মহানবী (সা) خيرت فاخترت وسازيد على السبعين (অর্থাৎ আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে তাই আমি ইখতিয়ার করেছি এবং আমার চাওয়া সত্তরের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।) উক্তি কিরূপে করলেন? যাহেরপন্থী আলিমগণের পক্ষে এর সন্তোষজনক জবাব দেয়া সম্ভব নয়। আর যারা কেবল কুরআন শরীফের অনুবাদ পড়ে ইজতিহাদের দাবিদার—জবাব

তারা দিবেই বা কি? শুনুন রূহানী আলিমগণের পক্ষ থেকে জবাব আমি পেশ করছি। মাওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব (র) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ঃ তখন অনুগ্রহশীলতার আধিক্যের দরুন মহানবী (সা)-এর লক্ষ্য আয়াতের ভাবার্থের প্রতি নয় বরং ছিল কেবল শব্দের কাঠামোগত আকৃতির প্রতি। অবশ্য পরিভাষায় এ জাতীয় অর্থ গ্রহণের অবকাশ না থাকলেও আলোচ্য আয়াতের শব্দ কাঠামোতে ইখতিয়ার ও সীমাবদ্ধতা উভয় অর্থের সুযোগ রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ওলিয়ে কামিলগণের মনোজগতে কোন কোন সময় অবস্থার প্রাধান্য (غلبه حال) সৃষ্টি হয়ে থাকে। —আল-মুরাবিত, পৃষ্ঠা ৩৯

## ৮৮. নামাযে পূর্ণতা অর্জনের বাঞ্ছিত উপায়।

নামাযে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু এবং আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতির কল্পনা ও ধ্যানে (مراقبه) অভ্যস্ত হওয়া উচিত। আমার মতে আয়াতের অর্থ হলো—নামায পড়া অবস্থায়ও উক্ত মুরাকাবায় (আল্লাহ্‌র ধ্যানে) অন্তর লিপ্ত ও ধ্যানমগ্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। এর উপায় এই যে, নামায পড়া অবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ গভীরভাবে চিন্তা করবে ঃ সমগ্র দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে হাত বেঁধে আমি এমনভাবে দাঁড়িয়েছি যে, কারো সাথে কথা বলা, কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং পানাহার করা এখন আমার জন্য নিষিদ্ধ। এর কারণ—আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দণ্ডায়মান, তাঁরই সামনে অনুনয়-বিনয়াবনত। দাঁড়ানো অবস্থায় চিন্তা করবে—মহান আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ আমার ওপর, যে সবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার জন্য ওয়াজিব। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠকালে চিন্তা করবে—আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করছি, তিনি পালনকর্তা—'রব', আমি নিজে তাঁর সৃষ্ট বান্দা হওয়ার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি। আমি আল্লাহ্‌র দাসত্বে অটল থাকা এবং গোলামির নিয়মানুযায়ী চলার আবেদন জানাই। দাসত্বের পথ পরিহারজনিত কারণে অভিশপ্ত-পথভ্রষ্টদের ওপর থেকে আমি অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিচ্ছি। সর্বোপরি আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দাসত্ব বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নিষ্ঠাপূর্ণ অঙ্গীকার করছি। ফাতিহার পর সূরা পাঠেরও একই অর্থ। এরপর রুকূতে যাওয়ার কালে চিন্তা করবে—পদতলের এ মাটি থেকেই আমার সৃষ্টি, এর উপাদান থেকেই চোখ-কানবিশিষ্ট জীবন্ত মানবের সৃষ্টিকৌশল একমাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন বিষয়। এ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে যার জন্ম এহেন সৃষ্টের পক্ষে বন্দেগী বা দাসত্ব ছাড়া দ্বিতীয় কিছু মানায় না। শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব কেবল পবিত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই শোভনীয়। নামাযে বারংবার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) উচ্চারণের তত্ত্বগত রহস্য এখানেই—হে খোদা! তোমার মহত্ত্বের

সামনে নিজের কাল্পনিক মান-মর্যাদা কুরবান করে দিলাম। সিজদায় লুটিয়ে পড়ার মুহূর্তে চিন্তা করবে—একদিন আমাকে এই মাটির বুকে আশ্রয় নিতে হবে, তখন আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী থাকবে না। দুনিয়া থেকে আমার নাম-নিশানা, অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সিজদায় কল্পনা করবে—আমার যেন মৃত্যু ঘটেছে, এখন আমি আল্লাহ্র সান্নিধ্যে, তিনি ব্যতীত আমার কেউ নেই। তাশাহুদের বৈঠকে চিন্তা করবে—মরণের পর আরো একটি জীবন রয়েছে, সেখানে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে কৃত নেক আমলই উপকারে আসবে। সেদিন মহানবী (সা)-সহ সমস্ত আম্বিয়া, ফেরেশতা ও পুণ্যাত্মাগণের সম্মান প্রকাশ পাবে। তাঁরা পাপী-তাপী বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবেন। তাই তাঁদের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। এ পর্যায়ে মহানবী (সা)-এর সাথে উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতার দরুন শেষ রাকাতে তাঁর প্রতি বিশেষ দরূদ পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। অন্তরে এ কল্পনা বদ্ধমূল হওয়ার পর শেষ বৈঠকে কল্পনা করবে—মরণের পর আমি এখন কিয়ামতের ময়দানে দণ্ডায়মান। ভাল-মন্দ, নেক-বদ দুনিয়ার যাবতীয় আমল আমার সামনে উপস্থিত, এর মধ্য হতে ইখ্লাসের সাথে আল্লাহ্র নামে কৃত কর্মই একমাত্র কাজের, বাকি সব অকাজের। রাসূলুল্লাহ্ (সা), সমস্ত আম্বিয়া, পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতাকুল মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত। তাঁদের প্রতি আমার দরূদ ও সালাম। পরিশেষে নিজের জন্য আমি মুক্তি ও সাফল্য কামনা করছি। এ কারণেই আয়াতে يظنون (তারা ধারণা করে) শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্র সাক্ষাতের বিশ্বাস পোষণ করা ফরয, শুধু ظن তথা ধারণা যথেষ্ট নয়। কিন্তু নামাযের মধ্যে আল্লাহ্র সাক্ষাত, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনের মানসিক ও কল্পনাগত উপস্থিতি যেহেতু উদ্দেশ্য কিন্তু বাস্তবতুল্য দৃঢ় ই'তিকাদ অনিবার্য নয় বরং নামাযে এর কল্পনাই যথেষ্ট। যেমন—মরণের পর এখন আমি আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী অথবা এখন আমি পরজগতের বাসিন্দা ইত্যাদি। এ কারণে এ ক্ষেত্রে ظن শব্দটি প্রযোজ্য হয়েছে। এভাবে নামায আদায় করা হলে তাতে ভীতি ও আশাব্যঞ্জক একাগ্রতা সৃষ্টি হবে এবং অন্তর থেকে যাবতীয় কু-চিন্তা দূরীভূত হয়ে যাবে।

—আল-হজ্জ, পৃষ্ঠা ১৮

**৮৯. বর্তমানে যেভাবে চাঁদা আদায় করা হয়—তার অশুভ পরিণাম।**

আজকাল ব্যক্তিবিশেষকে সেক্রেটারী কিংবা সদস্যপদ এ জন্য দেয়া হয় যে, ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে তিনি গরীবদের ওপর ট্যাক্সের ন্যায় চাঁদা বসিয়ে

আয়-আমদানি বাড়াতে পারেন। এ কাজে তার প্রশংসাও করা হয়—বাহ্, অমুক সাহেব দীনের কাজে একেবারে নিবেদিতপ্রাণ। সুবহানাল্লাহ্! গরীবের গলায় ছুরি দিয়ে চাঁদা আদায় করা যদি দীন ইসলামের বিরাট কাজ হয়, তাহলে দিন-দুপুরে ডাকাতি করা তো তার চাইতেও উত্তম। যেহেতু পরের অর্থ লুট করে সে পরিবারের আহার যুগিয়েছে যা তার ওপর ওয়াজিব ছিল। অবশ্য তার উপার্জন হারাম পথে কিন্তু খরচের স্থানটা এমন—যে খাতে ব্যয় করা তার ওপর ওয়াজিব ছিল। সুতরাং সে হারামের আশ্রয়ে ওয়াজিব থেকে তো অব্যাহতি পেল। আর সেক্রেটারী সাহেব হারাম পথে চাঁদা তুলে ব্যয় করেন এমন খাতে যার খিদমত তার ওপর ওয়াজিব ছিল না। কেননা আঞ্জুমান বা সমিতির খিদমত তার ওপর ওয়াজিব নয়। ডাকাতের সাজা কারো অজানা নয়। তাই তারাও এ জন্য প্রস্তুত থাকুন। দুঃখের বিষয় চাঁদা আদায়ের বেলায় আজকাল এদিকটা আদৌ লক্ষ করা হয় না যে, টাকা কি স্বেচ্ছায় দেয়া হলো না বলপূর্বক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—স্ত্রীর মাল সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا

—"সন্তুষ্টচিত্তে তারা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে।" এখানে 'সন্তুষ্ট' শব্দ দ্বারা স্ত্রীর দানকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, যাতে অসন্তুষ্টির ঘটনা অতি বিরল। এমতাবস্থায় সন্তুষ্টি ব্যতীত গরীবদের মাল গ্রহণ করা কিরূপে জায়েয ? কুরআনের অন্যত্র স্ত্রীর ব্যাপারে আরো কড়া সুরে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -

—"তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ (মিলন) করার আগেই তালাক দিয়ে দাও আর মোহর ধার্য করা থাকে, তবে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন রয়েছে সে (অর্থাৎ স্বামী) মাফ করে দেয়, (তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে) আর (হে পুরুষগণ) তোমরা মাফ করে দাও। এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" অর্থাৎ স্ত্রীর ক্ষমার অপেক্ষা না করে স্বামী নিজের হক মাফ করে দেয়াই অধিক উত্তম।

অতএব প্রণিধানযোগ্য যে, স্ত্রী নিজের হক বা মোহর স্বেচ্ছায় মাফ করে দেয়া অবস্থায় স্বামীর পক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয এবং শরীয়ত সমর্থিত। কিন্তু এক্ষেত্রে

শিষ্টাচারের অপর একটি দিকের প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আত্মমর্যাদার দাবি হলো—স্ত্রীর ক্ষমা তুমি কবূল করবে না বরং তোমার নিজের পাওনা স্ত্রীকে দান করে তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। অতএব স্ত্রীর সাথে লেনদেন এবং তার দান গ্রহণের বেলায় শিষ্টাচার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার যে শিক্ষা তা এরূপ হলে চাঁদা উসুলের ক্ষেত্রে কি কোন আদব ও শিষ্টাচারের আবেদন বাঞ্ছনীয় নয় ? অবশ্যই আছে এবং তা রক্ষা করাও ওয়াজিব। আমাদের পবিত্র শরীয়ত 'হাদিয়া' (উপঢৌকন) গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যন্ত আদব ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটি আদব হলো ঃ

مَا اتاك من غير اشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك –

—তোমার মনের কামনা ও অপেক্ষা ছাড়া আগত হাদিয়া গ্রহণ কর কিন্তু যা অপেক্ষার পর আসে তার প্রতি মন দিও না। —আস্‌লুল ইবাদাহ্, পৃষ্ঠা ৬

কিন্তু চাঁদার বেলায় এমন সব কৌশল অবলম্বন করা হয় যাতে সভাস্থ লোকেরা লজ্জার খাতিরে হলেও এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা দান করে। মনে রাখা দরকার এটা একটা না-জায়েয পন্থা। অথচ মানুষের ধারণা—এ ব্যবস্থা ছাড়া কাজ অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো—আসল উদ্দেশ্য তাহলে কি, কাজ না দীন ? কাজটাই যদি আসল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকার কি কারণ ? কেননা তারাও তো জিহাদ-সদকা ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করত। তাই বোঝা গেল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিহীন কাজ কোন কাজই নয়। মুসলমানের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা, কাজ কম হোক কিন্তু হতে হবে আল্লাহ্‌র পসন্দমত। যেমন—ইয়াতীমখানা বিরাট কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অবর্তমান, এমতাবস্থায় এর দ্বারা লাভ কি ?

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত এক সংস্থার (আমি নাম বলব না) ঘটনা উল্লেখযোগ্য। শুনে আমি অবাক হয়েছি যে, লক্ষ্ণৌর জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি বহু টাকা মূল্যের বিরাট সম্পত্তি একজন অভাবী পরহেজগার আলিমের খেদমতে পেশ করে বলল—এটা গ্রহণ করে আপনার পসন্দমত খরচ করুন। তিনি অস্বীকার করলেন। অতপর সংস্থার কর্মকর্তাদের সামনে পেশ করে বলল ঃ আমার পক্ষ থেকে এ সম্পত্তি সংস্থার নামে ওয়াকফ করে নিন। তারা সানন্দে কবূল করে নিল। এ নিয়ে স্থানীয় লোকজন মজার কাহিনী রটাল ঃ "মিয়া, উক্ত বুযুর্গ একা কিনা, তাই পাপের বোঝা বহনে অক্ষম কিন্তু সংস্থাওয়ালারা যেহেতু মোটাসোঁটা, তদুপরি সংখ্যায় অনেক তাই ভাগ-বাটোয়ারা করে সবাই মিলে অল্প অল্প বহন করতে অসুবিধা হবে না।" এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়

তাদের উদ্দেশ্য সংস্থা চালানো, "রেযায়ে হক" বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাদের উদ্দেশ্য নয়, নতুবা হালাল-হারামের কিছুটা পরোয়া থাকা উচিত ছিল। সামাজিক মর্যাদা লাভের উদগ্র বাসনাই এ-সব নষ্টের গোড়া। যেহেতু কাজ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য নাম ও খ্যাতি অর্জন করা। আমার 'ডীগ' অবস্থানকালে কোনও এক সংস্থার সেক্রেটারী এক সাক্ষাতকারে আমার নিকট সংস্থার প্রতি লোকদের অনীহা ও অনাগ্রহের প্রশ্ন তুলল। আমি বললাম—লোকদের অভিযোগ এবং তাদেরকে কাজে লাগানো আপনার কি প্রয়োজন। প্রথমে সাধ্যমত আপনি নিজেই কাজ শুরু করুন, অপরকে বিরক্ত করার প্রয়োজন কি ? দেখবেন মানুষের মধ্যে আপনা হতেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। সে লোক চলে যাওয়ার পর লোকেরা মন্তব্য করল—লোকটার রোগ আপনি ঠিকই ধরেছেন। ঘটনা তা-ই—নিজের গা বাঁচিয়ে অন্যদের থেকে চাঁদা আর কাজ আদায়ে তার বড় শখ। নিজে কাজের ঘরে শূন্য থাকলেও পদটা চাই তার সেক্রেটারীর। মোটকথা, আজকালের বাস্তবের সাক্ষী হলো—মানুষ দীনের খিদমত করে সুনামের আশায়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় নয় —ঐ, পৃষ্ঠা ৯।

## ৯০. পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া আল্লাহ্ কর্তৃক জান্নাত না দেয়ার কারণ।

এ প্রশ্নের জবাব হলো—বিনা পরীক্ষায় সবকিছু দান করা অবশ্যই আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন কিন্তু এটা তাঁর চিরন্তন নীতির পরিপন্থী। বস্তুত বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে নৈকট্য দান করেন। এ নৈকট্য মূলত মুক্তি। আর বিচ্ছিন্ন ও দূরত্বের অর্থ ধ্বংস। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন ঃ

شنیده ام که سخن خوش که پیر کنعان گفت

فراق یار نه آں میکند که بتواں گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر

کنائتست که از روز گار هجراں گفت

—কেনানের মহামানব তথা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ভাষায় মূল্যবান সুর ধ্বনিত হতে শুনেছি যে, বন্ধুর বিরহ জ্বালা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। জনৈক উপদেশদাতা বলেছেন ঃ বিচ্ছেদ যাতনা এতই বেদনা-বিধুর যা একমাত্র কিয়ামতের ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সাথেই তুলনা করা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْـرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ – (মানুষ কি মনে করে যে. "আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি" একথা বললেই পরীক্ষা ছাড়াই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে ?) "এ পরীক্ষার কি কারণ ?" এ প্রশ্নের সমাধানে তত্ত্বগত বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকাই আমাদের বুযুর্গানের নীতি (مسلك) । এ পর্যায়ে তাঁদের পন্থা হলো— ابهموا ما ابهمه الله যে, আল্লাহ্ যে বিষয়টি অস্পষ্ট রেখেছেন তোমরাও তা গোপন রাখ। সুতরাং আমাদের মোটামুটি আকীদা এই যে, বিষয়টা যদিও আমাদের অজ্ঞাত কিন্তু পরীক্ষার ভিতর কল্যাণকর বিষয় অবশ্যই নিহিত রয়েছে। এ সম্পর্কে আমার ধারণা পরীক্ষাবিহীন আনুগত্য কাম্য হলে মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না, পূর্ব থেকেই অনুগত ফেরেশতাকুল এ কাজের যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যমান ছিল। কারণ পরীক্ষা ব্যতীত তাদের আনুগত্য চলে আসছে চিরন্তন রীতিতে আর বিরোধিতার উপাদান তাদের সত্তায় অনুপস্থিত। কিন্তু প্রতিদানের পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে এবং সীমিত পরিমণ্ডলে মানবসত্তা বিরোধমুখী উপাদান মিশ্রণে গঠিত। কারণ বিরোধিতাবিহীন আনুগত্যের তুলনায় বিরোধপূর্ণ ইবাদত-আনুগত্য উত্তম পর্যায়ের, যেহেতু এর পিছনে মানুষের চেষ্টা সাধনার বাস্তব ভূমিকা কার্যকর। "সীমিত পরিমণ্ডলের" বিশেষণ এজন্য যুক্ত করা হয়েছে যে, বিরোধিতা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে যদি সীমাবদ্ধ রাখা না হয়, তবে তো الدين يسر (দীন সহজ-সরল জিনিস) হাদীস এ-উক্তির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এ বিশেষণ যুক্ত করা আমি প্রয়োজন মনে করি। অবশ্য এ বিরোধিতা সংঘটিত হয়ে থাকে কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে, আমল-ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর এ-ও বাকি থাকে না। আল্লাহ্র হুকুম পালন তখন মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাহ্যিক ও অনুভূতিশীল ক্রিয়াকর্মেও এ একই নীতি কার্যকর লক্ষ করা যায়। যথা—চলার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপেই কেবল ইচ্ছার প্রয়োজন। হাঁটা-চলা একবার শুরু হয়ে গেলে প্রতি পদে, যে কোন পদক্ষেপে নিয়তের দরকার পড়ে না সূচনাকালীন নিয়তকেই পদে পদে কার্যকর ধরা হয়। যার ফলে একে ইচ্ছাধীন কর্ম (فعل اختيارى) বলা হয়। এখন প্রশ্ন ওঠতে পারে যে, দ্বন্দ্ববিহীন ইবাদত অপেক্ষা বিরোধপূর্ণ ইবাদতের সওয়াব যেহেতু অধিক কাজেই সূচনা উত্তর কাজের সওয়াব কম হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এক্ষেত্রে পরবর্তী আমলসমূহের সওয়াবও বিরোধপূর্ণ প্রাথমিক আমলের সমপরিমাণ দান করাই আল্লাহ্র বিধান। এটা তাঁর অপার অনুগ্রহ। কেননা বিরোধমুখর প্রতিকূল পরিবেশে আমলের স্থায়ী মনোভাব নিয়েই সে কাজ আরম্ভ করেছিল। তাই দেখা যায় নামায-রোযা ইত্যাদি প্রতিটি হুকুম

আদায়কারী প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত এই থাকে, যতই কষ্টকর হোক জীবনভর আমি নামায-রোযা আদায় করে যাব।

অতপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পরবর্তী সময়ে মনের সে বিরোধী ভাবের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু যেহেতু এর মুকাবিলার দৃঢ় মনোভাব নিয়েই বান্দা আমল শুরু করেছিল, তাই সে ভাব কেটে যাওয়ার পরও তার নিয়তের প্রেক্ষিতে পূর্বের ন্যায় সে একই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে। যেমন 'চলা' শব্দটিকে ইচ্ছাধীন 'ক্রিয়া' আখ্যা- দানের কারণ এই যে, সূচনাকালে বান্দার ইচ্ছা এখানে অপরিহার্য, পরে যদিও সে প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। এখানেও তদ্রূপ, পরে যদিও বিরোধিতার প্রয়োজন থাকে না কিন্তু প্রথমে থাকে। এ কারণে এটাকেই বিরোধিতার চূড়ান্ত পর্যায়রূপে মেনে নেয়া হয়। এর দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের পরিচয় লাভ করা যায়। নতুবা বিবেকের দাবির প্রেক্ষিতে মনের বিরোধীভাব বিলুপ্ত হয়ে ইবাদতে স্বাদ আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার পর সে ব্যক্তি সওয়াবের অধিকারী না হওয়াই সঙ্গত ছিল। কারণ তার এ মুহূর্তের ইবাদতে পরীক্ষার কোন নিদর্শন নেই। তাই বিবেকের দাবি হলো—সে ব্যক্তি প্রতিফলের অধিকারী না হওয়া। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো—হে মানুষের বিবেক! আমার বান্দার প্রতি ভালবাসার অভাব হেতু তোর এ যুক্তি কিন্তু এখন তার কষ্টকর সাধনার অবসান সত্ত্বেও তাকে আমি মনের সাথে মুকাবিলার সওয়াব দ্বারা অবসরকালীন পেনশন জারি করব। অথচ বিবেক এ পেনশনের বৈধতা স্বীকার করে না। যেরূপ 'মুতাযিলা' সম্প্রদায়ের আকীদা হলো—গুনার শাস্তি দেয়া আল্লাহ্‌র জন্য জরুরী, ক্ষমা করা যুক্তিবিরোধী চিন্তা। সার কথা—আমলে মজবুতী ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়ার পর বান্দার অবস্থা কোন কোন পীরের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে প্রতীয়মান হয়। জনশ্রুতি রয়েছে—উক্ত পীর সাহেব মুরীদের বাড়ি দাওয়াত খাওয়ার পর নযরানাও গ্রহণ করতেন, যাকে "দাঁত ঘষাই" নামে আখ্যায়িত করা উচিত। অতএব এ ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বান্দার "দাঁত ঘষাই" দিয়ে থাকেন। কেননা শেষের দিকের ইবাদতে আয়াসসাধ্য কোন কৃতিত্ব থাকে না, বর্জন করাই বরং কষ্টকর হয়। যেরূপ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—كان خلقه القران অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর চরিত্র কুরআনের রংয়ে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চরিত্রই যেন জীবন্ত কুরআনরূপে বিচরণ করত। অবশ্য এ স্বভাব ছিল তাঁর জন্মগত ও সহজাত। কিন্তু শেষের দিকে কামিল মনীষীবৃন্দের ইবাদতের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ পর্যায়ে পৌছে যায়। তাদের অবস্থা তখন—"মায়ের স্তন ছেড়ে সন্তানের খেলার পানে ছুটে যাওয়া আর থাপ্পড় মেরে মা তাকে নিবৃত করার" ন্যায়। তাই তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ

থেকে শাসন-সতর্কবাণী মূলত তাঁর দয়া-অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমি বলব—মুবতাদীর (প্রাথমিক পর্যায়ের আমলকারীর) ক্ষেত্রেও তা রহমত ও দয়াস্বরূপ। স্বভাবগতভাবেই মানুষের অন্তর আল্লাহ্র ভালবাসায় আপ্লুত। আর নির্দেশ পালনে মুবতাদীর মানসিক বিরোধিতা ভালবাসার পরিপন্থী নয়। কিংবা তার এ অবস্থা অবাধ্যতার ইঙ্গিতবাহীও নয় বরং এ হলো—ভালবাসার আকর্ষণজড়িত অভিনয়ের সুরে প্রেমাষ্পদ আল্লাহ্র দরবারে তার প্রেমিকসুলভ ও মিনতিপূর্ণ আবদার যে, তোমার প্রতি আমার এত ভালবাসা এত আসক্তি, তা সত্ত্বেও এত সব বিধিবিধান, এহেন আদেশ-নিষেধে আমাকে জড়ানোর কি অর্থ ? আমাকে তো আমোদ-আহ্লাদ, আনন্দ-উল্লাসে রাখা উচিত ছিল। অতঃপর তার ভাবালুতাপূর্ণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ঃ

هم نے الفت کی نگا هیں دیکھیں

جانیں کیا چشم غضناك کو هم

—এতদিন যাবত আমার প্রতি তার প্রেমের দৃষ্টি লক্ষ করে আসছি, সে আমার দিকে ভালবাসার নযরে তাকাত। কিন্তু তার রোষায়িত লাল চোখের কথা আমার জানা নেই। —সোবীলুস-সাঈদ, পৃষ্ঠা ৪

**৯১. চাঁদ দেখায় মতপার্থক্যের দরুন একাধিক শবে কদর সন্দেহের সমাধান।**

এটা সবার জানা কথা, এমনকি বিজ্ঞানী মহলেও স্বীকৃত যে, বায়ুমণ্ডলের উপর স্তরে দিবা-রাত্রির কোন অস্তিত্ব নেই, সবই সমান। দিন-রাতের ঘূর্ণনজনিত ব্যবধান কেবল বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরের ব্যাপার। আমার চিন্তায় এ সমাধান জড়ো হওয়ার পর মনে বড় আনন্দ অনুভব করি। এর দ্বারা আরো একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজের ঘটনায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কেবল মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়েছে, ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণের কোন উল্লেখ তাতে পরিলক্ষিত হয় না। কোন কোন সূফী আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে মহানবী (সা)-এর ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ অস্বীকার করেন। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেননি যে, মি'রাজের উক্ত আয়াত (রাত) শব্দ সম্বলিত। তাই তাতে ভ্রমণের পরিধি ততটুকুই বিস্তৃত করা সঙ্গত, যা রাতের সীমিত পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, ঊর্ধ্বাকাশের ভ্রমণ দিন-রাতের আওতার বাহির জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে দিন-রাতের ব্যবধান অনুপস্থিত। তাই উক্ত আয়াতকে আকাশ ভ্রমণের বিপক্ষ দলীলরূপে উপস্থিত করা অবান্তর কথা। তবে তারা এ কথা বলতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকাশমণ্ডল ভ্রমণ কাজ রাতে অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমরাও একথা সমর্থন করি এবং আরো এক ধাপ উপরে উঠে বলি—আকাশ ভ্রমণ রাতে হয়নি, দিনেও হয়নি বরং তা হয়েছে এমন এক মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে যেখানে দিন-রাতের কোন অস্তিত্বই নেই।

মোটকথা, শবেকদর সম্পর্কে বর্ণিত ফযীলত ও মর্তবা দিন-রাতের সাথে শর্তযুক্ত নয়। বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন, সময়ের যেকোন একটা অংশে হলেই হলো। বৃষ্টির উপমার সাথে মিলিয়ে বিষয়টা আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করুন—বায়ুমণ্ডলের বরাবর নিচে ভূ-পৃষ্ঠের আমাদের অত্র এলাকায় আজকে বৃষ্টিপাত হলো কিন্তু একই বায়ুমণ্ডলীয় জগতের নিম্নস্থ কলকাতা অঞ্চলে হলো পরের দিন। এখন শবে কদরের অবস্থাও যদি তাই হয় যে, আজ এখানে কাল কলকাতায় তাহলে আপত্তির কি আছে? বারিপাতে এ জাতীয় ব্যবধান কি হয় না? তাহলে আধ্যাত্মিক ও রূহানী বরকতময় বৃষ্টির বর্ষণজনিত এ জাতীয় ব্যবধানে বিস্ময়ের কি আছে। কাজেই নিজেদের নির্ধারিত তারিখে আপনারা নিশ্চিন্তে কাজ করুন। প্রত্যেকের নিয়ত ও আমল মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিসীমায়। যার যার হিসেব অনুযায়ী প্রত্যেককেই তিনি শবে কদরের বরকত ও ফযীলত দান করবেন। —ইকমালুল ইদ্দাহ্‌, পৃষ্ঠা ২৮

## ৯২. শুধু কিতাব পাঠে নিজের সংশোধন সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে কিতাব পাঠ করা আমি বেকার বলি না, উপকারী অবশ্যই কিন্তু তা কেবল চিকিৎসকের জন্য, রোগীর জন্য নয়। কিতাব পত্রে সবকিছু বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও কোন রোগী চিকিৎসা গ্রন্থ দ্বারা আপন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। অথচ একই গ্রন্থের সহায়তায় চিকিৎসক তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ছিটেফোঁটা দু-এক রোগের ব্যবস্থা কেউ যদি করেও নেয় কিন্তু কঠিন রোগের চিকিৎসা তার দ্বারা সম্ভবই নয়। সুতরাং বুহ্‌রানের (জ্বরবিকার) বিস্তারিত বিবরণ কিতাবে বর্ণিত রয়েছে কিন্তু সবাই তা অনুধাবনে সক্ষম নয়। সেখানে বর্ণনা এত সূক্ষ্ম যে, আধুনিক ডাক্তাররা এর তত্ত্বগত বিশ্লেষণে অপারগ হয়ে অবশেষে অস্বীকৃতির ঘোষণাই দিয়ে বসেছে যে, 'বুহ্‌রান' বলতে রোগ প্রকৃতির অস্তিত্বই নেই। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাবিদগণ এর সূক্ষ্ম পর্যালোচনার পর এত তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ দিয়েছেন যে, শুনলে মনে হয় যেন তাদের নিকট এ বিষয়ের 'ইলহামী' তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সুতরাং তারা জ্বরাক্রমণের দিনগুলিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কোন কোন দিন রোগ আর মানব দেহের মধ্যে পারস্পরিক মুকাবিলা চলে, একে অপরকে দাবানোর জোর চেষ্টা চালায়। এ পরিস্থিতি ও মুকাবিলাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'বুহ্‌রান' (জ্বরবিকার) বলা হয়। এর মধ্যে কোন দিন 'বুহ্‌রানের চাপ প্রবল থাকে, কোন দিন হালকা। এ জন্য

রোগী এবং তার সেবকদের পক্ষে জ্বর আক্রমণের দিন-তারিখ স্মরণ রাখা উচিত, যেন চিকিৎসককে সঠিক তথ্য দিতে পারে এবং বুহ্রানের গতি চিহ্নিত করা তার পক্ষে সহজ হয়। এখন শুধু বই পড়ে রোগী এ বিষয়গুলি কিরূপে নির্বাচন করবে। এটা আদৌ হওয়া সম্ভব নয়। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি রোগী নিজের চিকিৎসায় নিজে হাত দিলে সাধারণ বিষয়েও মারাত্মক ভুল করে বসবে। কিছুদিন পূর্বে প্রতি বছর বর্ষার শেষ দিকে আমার জ্বর দেখা দিত এবং সবসময় পিত্তজ্বরে ভুগতাম। অবশ্য কয়েক বছর যাবত আল্লাহ্ মাফ করেছেন।

একবার আমি চিন্তা করলাম—আমার পিত্তজ্বর আর হেকিম সাহেব প্রতি বছর প্রায় একই ব্যবস্থা দেন। তাই চল নকল করে রেখে দেই, সময়ে কাজ দিবে। হেকিম সাহেবকেও বারবার কষ্ট দিতে হবে না। তাই একবার আগের বছরের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহার করা হলো কিন্তু ফল শূন্য। অবশেষে হেকিম সাহেবকে ডেকে আনলাম। তার ব্যবস্থা মতে কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহারে নিরাময় হলো। পরে সন্ধান নিয়ে দেখা গেল এবার পিত্তের সাথে কাশিরও আক্রমণ, বার্ধক্য শুরু হয়েছে কি-না। এখন এটাকেও যদি আগামীবারের জন্য নকল করতাম পিত্ত আর কাশের জোর লক্ষ করে, তাহলে এর দ্বারাও কোন উপকার হবার ছিল না, কাশি বাড়ারই আশংকা ছিল। (বরং غم - بل সংযুক্তির অন্তরালে যার অর্থ "বরং চিন্তা" রোগ যন্ত্রণা বেড়েই যেত, যেহেতু এটা একক শব্দ নয়।) দ্বিতীয়ত এ বছর কাশির পরিমাণ পিত্তের চেয়ে বেশি, সমান না কম এটা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিরার অবস্থা বুঝে এরূপ চিকিৎসকেরই কাজ এটা। কাজেই বই-পুস্তক পড়ে পড়ে চিকিৎসা করা চিকিৎসকের কাজ। তদ্রূপ "ইহইয়াউল-উলুম", "ফতুহাতে মক্কিয়া" ইত্যাদি তাসাউফের কিতাব বেকার ও অর্থহীন নয়, উপকারী বটে কিন্তু পীরের জন্য, মুরীদের জন্য উপকারী নয়। চিকিৎসার জন্য মুরীদের বরং কোন হক্কানী পীরের আনুগত্য করা অনিবার্য। —আর্ রাগবাতুল-মারগূবাত, পৃষ্ঠা ২১

## ৯৩. সামষ্টিক কল্যাণ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কল্যাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক নহে।

সামষ্টিক কল্যাণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত কল্যাণ উত্তম এটাই মূল কথা। কারণ মহানবী (সা)-কে আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে—গণমুখী ও সামষ্টিক কল্যাণধর্মী দায়িত্ব তথা তাবলীগ থেকে অব্যাহতি লাভের পর ব্যক্তিগত কল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি সর্বাত্মক আকৃষ্ট হওয়ার। বক্তব্যের আনুষঙ্গিকতার

আলোকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, বহির্মুখী কল্যাণ অপেক্ষা অন্তর্মুখী কল্যাণ উত্তম-মানের। কারণ প্রথমোক্ত কল্যাণ-কর্ম থেকে অব্যাহতির কামনা প্রকাশ করা হয়েছে শেষোক্ত আমল থেকে নয়। অতপর অন্তর্মুখী কল্যাণধর্মী আমলে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগের নির্দেশ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ সময় অন্য কোন দিকে যেন মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়। আয়াতে الى ربك ( তোমার রবের প্রতি) দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়।

বলা বাহুল্য, গণমুখী কল্যাণ (نفع متعدى) সর্বাবস্থায় উত্তম হলে তা থেকে অব্যাহতি কোন অবস্থায়ই কাম্য না হয়ে ইরশাদ হতো—

فاذا فرغت من ذكر ربك فانصب فى التبليغ واليه فارغب -

—তোমার রবের যিক্র থেকে অবসর হওয়ার পর তাবলীগে আত্মনিয়োগ কর এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ নিবদ্ধ রাখ।

উপরন্তু ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে আত্মনিয়োগের সময় বহির্মুখী আমল এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতে ক্রিয়ার পূর্বে কর্মের স্থাপন দ্বারা এ অর্থই প্রকাশ পায়। কারণ মূল উদ্দেশ্য কখনো বর্জিত হয় না। অতএব, এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমলের বহির্মুখী প্রচেষ্টা প্রাসঙ্গিক বিষয় আর আধ্যাত্মিক অঙ্গনে আত্মমুখী আমল সৃষ্টিকর্তার মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা যদিও প্রচলিত চিন্তাধারার বিপরীত বক্তব্য কিন্তু আসল কথা এটাই। আর প্রচলিত চিন্তার অপর ব্যাখ্যা এ-ও হতে পারে যে, অবস্থা ভেদে সময়ে বহির্মুখী আমল আত্মমুখী আমল অপেক্ষা তাকিদপূর্ণ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এর দ্বারা বস্তুর মৌলিক ফযীলত ও প্রাধান্য অনিবার্য হয় না। বস্তুত সাময়িক প্রয়োজনের তাকীদে হয় তো আপেক্ষিক বিষয়টির ওপর এ উদ্দেশ্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল যে, বহির্মুখী অমৌলিক আমলের ফলশ্রুতিতে অন্যরা আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট, ইবাদতে আত্মনিয়োগ এবং নামায-রোযায় লিপ্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। এ পর্যায়ে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, আত্মমুখী কল্যাণ সাধনের পর মানুষ পুনরায় বহির্মুখী আমলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে শেষোক্ত আমল সম্ভবত এ জন্যই শরীয়তসিদ্ধ করা হয়েছে। তা এভাবে যে, আত্মশুদ্ধির পর অন্যান্য লোকও তাবলীগ তথা দীন প্রচারের যোগ্যতা অর্জন করে নেবে। এর উত্তর হলো—প্রথমত অন্তর্মুখী আমল এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মকল্যাণ অর্জনের পরই নিজেকে সে তাবলীগের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। কারণ যে ব্যক্তি নিজেই শোধনের মুখাপেক্ষী পরকে সে সংশোধন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত অন্যদের তাবলীগের যোগ্য হওয়া নিশ্চিত নয়। এ জন্য যে,

কেউ কেউ সংশোধন করার যোগ্যই হয় না। কিন্তু সকলেই আত্মকল্যাণ লাভের যোগ্য পাত্র। কাজেই বহির্মুখী আমলের ওপর আত্মকল্যাণের ফল প্রকাশ নিশ্চিত বিষয় যে এখনই তার বাস্তবায়ন শুরু হয়। অথচ বহির্মুখী কল্যাণের অর্জনক্রিয়া অনিশ্চিত ব্যাপার যে, এ প্রচেষ্টা অন্যদের সংশোধনের যোগ্য হবে কি হবে না। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শতকরা দুই-একজন মাত্র অন্যকে সংশোধন করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। এখানে প্রশ্ন আরো থাকে—যোগ্য হলেও তা কবে নাগাদ হবে জানা নেই। আর নিজে যোগ্য হল ঠিকই কিন্তু অপরকে সংশোধনের সুযোগ সে পাবে কি না সেও এক সমস্যা। কারণ বহু সালেক (অধ্যাত্ম পথের পথিক) বহির্মুখী আমলের যোগ্যপাত্র হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে তা কাজে লাগানোর সুযোগ কমই আসে।

অতএব এমন একটা অনিশ্চিত কল্যাণের প্রেক্ষিতে কোন কিছু মৌলিক বিষয়রূপে শরীয়তসম্মত সাব্যস্ত হওয়া অবাস্তব কথা। অবশ্য এটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে কিন্তু মৌলিক কল্যাণের আমল সেটাই হতে পারে যার বাস্তবায়নও সুফল নিশ্চিত। এ বৈশিষ্ট্য আত্মকল্যাণপ্রসূ আমলেই কেবল লক্ষ্য করা যায় যা বহির্মুখী তথা পরমুখী কল্যাণের ওপর অবিলম্বে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত কল্যাণ দ্বারা যদি ব্যাপক কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, তবে তালেবের (সাধকের) জন্য এর নিয়ত করা বৈধ হওয়া উচিত। কেননা এমতাবস্থায় তা মাকসুদে (উদ্দিষ্ট বিষয়) পরিণত হয় আর মাকসুদের নিয়তে অগ্রসর হওয়া অনুমোদনযোগ্য এবং তা ক্ষতিকর হতেই পারে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে পারদর্শী মনীষীবৃন্দ যারা এ বিষয়ের মুজতাহিদ, এর নীতি নির্ধারণে যাদের বাক্য-মন্তব্য দলীলরূপে গণ্য হয়, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—তারা তালেবকে ব্যাপক কল্যাণের (অর্থাৎ অন্যের আত্মশুদ্ধির) নিয়ত করার অনুমতি দেন কি-না। তারা বলেন—তালেব যদি যিক্‌র ও শোগল (ওযীফা) দ্বারা পরের উপকারের নিয়ত করে তবে কখনো সে সফল হতে পারে না। এ জাতীয় নিয়ত করা আধ্যাত্মিক পথের ডাকাতি তুল্য। নিজের আত্মশুদ্ধি সাধনাকালে উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত আত্মসংশোধন এবং আপন আত্মশুদ্ধিরই হওয়া বাঞ্ছনীয়, পরের সংশোধনের উদ্দেশ্য পোষণ করা এ পথে উন্নতির বিরাট অন্তরায় এবং প্রাণনাশী ডাকাত তুল্য। কাজেই যার দরুন নিজের আত্মশুদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টা করা, তার কামনা করা ডাকাতের প্রতি স্বাগত জানানো ছাড়া আর কি হতে পারে। অতএব বলুন—এমতাবস্থায় অপরের সংশোধনচিন্তা উত্তম এবং মৌলিক উদ্দেশ্য কিরূপে বলা যায়। অধিকন্তু নিজের আত্মশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও সবাইকে অন্যের আত্মশুদ্ধির অনুমতি দেয়া হয় না। শায়খের অনুমতি সাপেক্ষেই কেবল কোন ব্যক্তি এ কাজের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। পরের

আত্মশুদ্ধি মূল এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য হলে 'তাকমীল' (পূর্ণতা) অর্জন করার পরও নিজের পক্ষ থেকে পরের আত্মশুদ্ধিতে লিপ্ত হওয়া থেকে কেন বারণ করা হয় এবং শায়খের অনুমোদনের শর্ত কেন যুক্ত করা হয় ? পরের আত্মশুদ্ধি আসল উদ্দেশ্য না হওয়ার এটাও একটা প্রমাণ। অন্যথায় "পরের আত্মশুদ্ধির অনুমতি দেয়া হয় নি"—এ ধরনের প্রতিটি ব্যক্তির অসম্পূর্ণ (ناقص) হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মাশায়েখদের মতে এটা ভুল কথা। এর ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন—উদ্দিষ্ট পূর্ণতা (كمال مقصود) অর্জন করা পরের ইসলাহের ওপর নির্ভরশীল নয়। আর শায়খের অনুমতির শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য হলো—"আমর বিল মা'রূফের" (নেক কাজের আদেশ দান) জন্য কিছু আদব ও যোগ্যতার প্রয়োজন যা অর্জন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন কারো মধ্যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। যার ফলে তার দ্বারা "আমর বিল মা'রূফ" (নেক কাজের আদেশ দান) কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে ফিতনা-ফাসাদ ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এ জন্য কোন লোক ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মশুদ্ধির উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছা সত্ত্বেও তাকে অন্যদের ইরশাদ ও তালকীন অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিমূলক উপদেশের মাধ্যমে মানুষের উপকারের অনুমতি দেয়া হয় না। কিন্তু তাই বলে তার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব-যোগ্যতা ও কামাল নিষিদ্ধ ও অপূর্ণ হওয়া প্রমাণ করে না। অথচ গণমুখী আত্মশুদ্ধি আসল কাম্য বিষয়রূপে (مقصود بالذات) সাব্যস্ত করার বেলায় ব্যক্তিগত কামাল বা পূর্ণতা নিষিদ্ধ হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যা 'মুহাক্কিকীনদের ঐকমত্যের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, আমার প্রশ্ন হলো—পরমুখী আত্মশুদ্ধি মৌল বিষয় (مقصود بالذات) স্বীকার করা হলে কোন 'হবরী' (শত্রু পক্ষীয়) লোক যদি "দারুল হরবে" (কুফরী রাষ্ট্রে) অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করে এবং গণমুখী আত্মশুদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সঙ্গত কারণেই অক্ষম হয়, এ পরিস্থিতিতে বলুন তার ভূমিকা কি হওয়া উচিত ? সে কি শুধু ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির গণ্ডিতে নিজেকে সীমিত রাখবে না কি গণশুদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অগ্রসর হবে ? এমতাবস্থায় যদি শেষোক্ত কার্যক্রম অনিবার্য করা হয়, তবে মানুষের ক্ষমতার অধিক দায়িত্ব চাপানোর প্রশ্ন এসে পড়ে। আর যদি প্রথমোক্ত বিষয় ওয়াজিব করা হয়, তাহলে পরের আত্মশুদ্ধি মৌলিক বিষয় না হওয়া প্রমাণ হয়। কেননা মৌল বিষয় থেকে কোন মুসলমান বঞ্চিত ও রেহাই পেতে পারে না। এ দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষাপটে সার কথা এই দাঁড়ায় যে, পরের আত্মশুদ্ধিমূলক কার্যক্রম মৌল উদ্দেশ্য নয় বরং সাময়িক ও আপেক্ষিক বিষয়। আর অনুষঙ্গিক ও আপেক্ষিক বিষয় অপেক্ষা মৌলিক বিষয় উত্তম হওয়া স্বীকৃত কথা। —আর্ রাগবাতুল মারগুবাহ্, পৃষ্ঠা ৪৬

## ৯৪. ডুবন্ত অবস্থায় জিবরাঈল (আ) কর্তৃক ফেরাউনের মুখে মাটি চেপে তাকে ঈমান থেকে বিরত রাখা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব।

এ প্রশ্নের জবাবে আলিমদের অভিমত হলো ঃ

فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوْ بأسنا (আমার আযাব দর্শনের পরবর্তী ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না) আয়াতের আলোকে জিবরাঈল (আ) জ্ঞাত ছিলেন যে, আযাব দেখার পরবর্তী তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এর দ্বারা প্রকৃত ইসলাম থেকে নয় বরং কপট ইসলাম থেকে বিরত রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর এর দ্বারা যদিও আখিরাতে অনুগ্রহ লাভ করা যায় না কিন্তু পার্থিব অনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা বাতিলও করা যায় না। যেমন কপট ইসলামের ছত্রছায়ায় মুনাফিকরা হত্যা ও বন্দী হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। তদ্রূপ এভাবে ডুবে যাওয়া ও ধ্বংসের হাত থেকে ফেরাউনের রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা হয় তো ছিল। কারো প্রশ্ন থাকতে পারে যে, আয়াতোক্ত بأسنا দ্বারা পার্থিব আযাব উদ্দেশ্য নয়। কেননা আখিরাতের নিদর্শন দৃষ্ট হওয়ার পূর্বে পার্থিব আযাবের দর্শন ঈমান গৃহীত হওয়ার পরিপন্থী নয়। আর দৃশ্যত এখানে আখিরাতের আযাব প্রকাশিত হয়নি। নতুবা পার্থিব বিষয়ানুভূতির সম্ভাবনা বাতিল সাব্যস্ত হয়। এর জবাব হলো, এ সম্ভাবনা স্বীকৃত নয় বরং আখিরাতের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পরও পার্থিব অনুভূতি থাকা সম্ভব। সুতরাং কোন কোন মরণোন্মুখ ব্যক্তির ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, তারা ফেরেশতা দেখতে পেয়েছেন সাথে সাথে বাড়ির মহিলাদেরও চিনতে পেরে তাদের বলেছেন, ফেরেশতা বসা আছেন এদের থেকে তোমরা পর্দা কর। সুতরাং আখিরাত প্রকাশের প্রাথমিক অবস্থায় জাগতিক বিষয়ের চেতনা বহাল থাকা অসম্ভব নয়। ফিরআউনের ঘটনা তাই প্রমাণ করে যে, তার ঈমান প্রকাশের সময় আখিরাতের দৃশ্য স্পষ্ট হওয়ার কালে জাগতিক বিষয়-চেতনাও তার যথারীতি বহাল ছিল। সুতরাং তার— امنت بالذى امنت به بنو اسرائيل (বনি ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে সেই মহান সত্তার প্রতি আমিও বিশ্বাস স্থাপন করলাম) উক্তি প্রমাণ করে যে, বনি ইসরাঈল তখন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাদের ঈমানদার হওয়া তার অনুভূতিতে জাগ্রত ছিল। এটা তো পার্থিব ঘটনা। তাহলে আখিরাতের চেতনা তার অবশ্যই কায়েম ছিল বলে ধারণা করার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। উপরের ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় পার্থিব অনুভূতি ও আখিরাতের আযাবের মধ্যে সমন্বয় অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং আলোচ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পরকালীন আযাব নিষিদ্ধ হতে পারে না আর আলামতের এ জাতীয় প্রকাশ ঈমান কবূল হওয়ার পরিপন্থী। এখন রইল অপর প্রশ্ন যে, এ অবস্থা যখন ঈমান কবূল

হওয়ার পরিপন্থী আর ঈমান বলা হয় অন্তরের বিশ্বাসকে, অধিকন্তু পরকালীন আযাব পরিদৃষ্ট হওয়ার পর মৌখিক উচ্চারণ সত্ত্বেও তা গ্রহণযোগ্য নয় এমতাবস্থায় ঈমানের উচ্চারণ নিষিদ্ধ হওয়াতেই বা লাভ কি ? তদুপরি মৌখিক স্বীকৃতির কোনও উপকার মেনে নেয়া অবস্থায় কারণবশত অক্ষমতার দরুন মৌখিক স্বীকৃতি দানের আন্তরিক নিয়ত যথেষ্ট হওয়া উচিত এবং কাদা চাপা দ্বারা এখানে অক্ষমতা আর নিয়তভিত্তিক স্বীকৃতি প্রমাণ হয়। ফলে ফিরআউনের মুখে কাদা মাটি চাপা দেয়াতে লাভ কি ? এরও একই জবাব যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তার প্রতি বাহ্যিক অনুগ্রহও জিবরাঈল (আ)-এর মনঃপূত ছিল না, যদিও ফিরআউনের লাশের হিফাযতের মাধ্যমে এক প্রকার বাহ্যিক অনুগ্রহ করা হয়েছিল। যথা فليوم ننجيك ببدنك (আজ তোমার দেহটি আমি সংরক্ষণ করব) আয়াত তাই প্রমাণ করে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন জাগে—এ বাহ্যিক অনুগ্রহের দরুন জিবরাঈল (আ)-এর অসুবিধা কি ছিল, তাঁর আপত্তি হলো কেন ? এরও একই জবাব যা আমি উল্লেখ করছিলাম যে, জিবরাঈল (আ)-এর আচরণের মূলে "আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা" এ মানসিকতার প্রভাব সক্রিয় ছিল, যে জন্য এটুকুও তাঁর সহ্য হয়নি। বস্তুত খোদার অভিশপ্তের প্রতি এহেন শত্রুতা আল্লাহ্র সাথে গভীর ভালবাসার পরিচায়ক। —আল-ঈদ ওয়াল ওয়াঈদ, পৃষ্ঠা ১০

**৯৫. কোন বিষয়ে আল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ঐ বিষয়টির এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়া অনিবার্য হয় না।**

একাধিক পর্যায়ে বিন্যস্ত এ সম্পর্কিত প্রমাণ আমার হাতে বিদ্যমান। প্রথম বিন্যাস ঃ অর্থহীন কাজ থেকে মহান আল্লাহ্ পবিত্র। দ্বিতীয় বিন্যাস ঃ রোগ নিরাময়ে নৈরাশ্যের পর বিজ্ঞ চিকিৎসক একে তো ঔষধই দেয় না, তৃতীয়ত ঔষধ দিলেও তা ব্যবহারে রোগীকে পীড়াপীড়ি করে না। কেউ কেউ বরং পরিষ্কার বলেই দেয় যে, রোগীর আয়ু শেষ, ঔষধ বেকার। এ পরিস্থিতিতে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ঔষধ দিলেও তা এ জন্য যে, গায়বের খবর তার অজানা। চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে এ রোগ চিকিৎসার ঊর্ধ্বে ধারণা হলেও এটা তার অভিজ্ঞতা প্রসূত ধারণা মাত্র, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নয়। আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার ভরসায় তিনি আশাবাদীও। যেমন কবি বলেছেন ঃ

عقل در اسباب میدارد نظر

عشق می گوید مسبب رانگر

—মানুষের জ্ঞান কেবল উপায়-উপকরণের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে কিন্তু ভালবাসার নির্দেশ হলো—উপকরণের সৃষ্টিকর্তাকে লক্ষ কর।

বস্তুত গায়বের মালিক আল্লাহ্‌র বাণী— ختم الله على قلوبهم (আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন)-এর দরুন তারা চিকিৎসার অযোগ্য এবং এটা তাদের ক্ষমতার বাইরে প্রমাণিত হলে সেটা আলিমুল গায়বের কালাম হিসেবে অকাট্য ও নির্ভুল হওয়া অনিবার্য ছিল। অধিকন্তু ইখতিয়ার নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ঔষধ গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব ছিল না। কেননা তা لا يكلف الله نفسا الا وسعها (অর্থাৎ ক্ষমতার অধিক কোন কিছু কারো উপর চাপানো আল্লাহ্‌র নীতি নয়) আয়াতের মর্মবিরোধী কথা। তৃতীয়ত আল্লাহ্ তাদের ওপর ঔষধ গ্রহণ করা অনিবার্য করে দিয়েছেন। কেননা يا ايها الناس اعبدوا ربكم (হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত-আনুগত্য কর) আয়াত ব্যাপকার্থবোধক সম্বোধন এবং আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। তদুপরি يا ايها الناس দ্বারা সমস্ত কাফিরের প্রতি ঈমান গ্রহণের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। যাতে ختم الله على قلوبهم-এর উদ্দিষ্ট কাফিররা পর্যন্ত শামিল। অধিকন্তু এ মর্মে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আবূ জেহল, আবূ লাহাব প্রভৃতি কাফির যদি ঈমান আনার আদেশের অন্তর্ভুক্ত না থাকে এবং এ হুকুম থেকে খারিজ সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের ওপর আযাব হওয়ার যৌক্তিকতা খর্ব হয়। কারণ তাদের পক্ষ থেকে সঙ্গত আবেদনের অবকাশ সৃষ্টি হয় যে, হুযূর, কুফরী ও ঈমান বর্জনের অপরাধে আমরা আযাবে গ্রেফতার হওয়া অযৌক্তিক। কেননা শেষের দিকে আপনার পক্ষ থেকে ختم الله على قلوبهم নাযিল করার ফলে আমরা ঈমানের হুকুমের অন্তর্ভুক্তই ছিলাম না। অথচ তাদের আযাবের যথার্থতা ختم الله -এর পরেই ولهم عذاب عظيم (তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি) 'নস' (কুরআনের আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত। অতএব মানতেই হবে যে, ختم الله على قلوبهم-এর মর্মাধীন কাফিররাও ঈমানের হুকুমের আওতাভুক্ত। সুতরাং আমার দাবি ختم الله على قلوبهم -এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাফিরদের রূহানী ব্যাধি চিকিৎসাবহির্ভূত ছিল না" যথার্থ প্রমাণ হয়ে গেল। রূহানী চিকিৎসাকেন্দ্রে কারো চিকিৎসা অসাধ্য হলে তারাই ছিল তার যোগ্য পাত্র। কিন্তু তারা তদ্রূপ ছিল না। তাই প্রমাণ হলো যে, এমন কোন রূহানী ব্যাধির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না যা চিকিৎসার ঊর্ধ্বে। প্রশ্ন হতে পারে—তা হলে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজন কি ছিল ? জবাব হলো—আল্লাহ্‌পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন, যার সারমর্ম ছিল— لا يؤمن ابو جهل و نحوه مع بقاء اختياره—আবূ জেহেল ও অন্যান্য কাফির নিজের ইখতিয়ার বলেই ঈমান থেকে

বিরত থাকবে। উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঈমান আনার শক্তি ও ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। উত্তমরূপে বুঝুন। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা তকদীর সম্পর্কে নিষিদ্ধ আলোচনার পর্যায়ভুক্ত।

মোট কথা—আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রমাণ হলো যে, নস দ্বারা কোন বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন—বিষয়টি ইখতিয়ার বহির্ভূত হওয়া অনিবার্য হয় না। অতএব এর তদবীর এবং অর্জনের প্রচেষ্টা অর্থহীন নয়। নতুবা ভবিষ্যদ্বাণী তদবীরের অন্তরায় স্বীকার করা হলে আজ থেকে কুরআন শরীফ হিফজ করা বর্জিত হওয়া উচিত। কেননা انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব।) আয়াতে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুরআনের সংরক্ষণ স্বয়ং আল্লাহ্র দায়িত্বে, এটা তাঁর ওয়াদা। তাহলে আল্লাহ্ না করুন কুরআনের পঠন, লিখন, মুদ্রণ বর্জন করা উচিত। আর মুদ্রিত সকল কপি দাফন করে আল্লাহ্ হাফেজ বলা উচিত। এর একজন হাফেজই যথেষ্ট, যে ক্ষেত্রে নিজে তিনি কুরআনের সংরক্ষণকারীও। وانا له لحافظون আয়াতের মর্মানুসারে কুরআনের সংরক্ষণকল্পে যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাঁর আয়ত্তে এবং এসবের যথাযোগ্য ব্যবহার তিনি করেই নেবেন। কিন্তু আজো পর্যন্ত মুসলিম জাতি এ পথ ধরেনি। অথচ এখানেও ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা। তাহলে এক্ষেত্রে কুরআন শরীফ হিফজকরণ, লিখন ও মুদ্রণ সবকিছু নিজের ওপর ফরয মনে করার কি অর্থ ? আর কারো সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে যাওয়ার পর এখন চিকিৎসার কি প্রয়োজন ? আমি বলি—আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুরআনের হিফাজতের ওয়াদা ব্যক্ত করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে আপনার হিফাজতের দরকার কি ? এর সংরক্ষণ ব্যবস্থায় আপনারা এত ব্যস্ত কেন ? তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা আপনারা করে থাকেন। এ দুইয়ের পার্থক্য এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করুন। বেশ, আপনারা বলতে কুণ্ঠিত হলে চলুন আমিই জবাব বলে দেই। জবাবে আপনারা বলতে পারেন যে, وانا له لحافظون -এর অর্থ প্রত্যেক যুগে আমি এমন উৎসাহী লোক সৃষ্টি করবো যারা কুরআন সংরক্ষণে তৎপর থাকবেন। তাদের জন্য চিন্তার এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দেব যার অবলম্বনে তারা লিখবে, পড়াবে এবং এভাবে আল্লাহ্র কুরআন হিফাজতের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। তদ্রূপ আপনাদের অবাধ্যতার প্রভাব ও ভবিষ্যদ্বাণীর পিছনে কার্যকর। এখন ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ হবে—স্বেচ্ছায় সীমালংঘনের দরুন মানুষ এহেন ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সুতরাং আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক কোন কিছুর আগাম সংবাদ দ্বারা তা হুকুম বিধানের আওতামুক্ত থাকার অনিবার্যতা এবং ব্যবস্থাপনা বহির্ভূত

হওয়ার কথা প্রমাণ করে না। এর রহস্য প্রারম্ভে আমি এই উল্লেখ করেছিলাম যে, ভবিষ্যদ্বাণী কখনো হয় রোগ চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার দরুন আবার কখনো রোগীর কুপথ্য গ্রহণের করণে। বলা বাহুল্য—রূহানী ব্যাধির কোনটাই চিকিৎসার উর্ধ্বে নয়। সুতরাং এখানকার যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী বান্দা কর্তৃক গৃহীত কু-পথ্যের অন্তরালে নিহিত। —আল-ইনসিদাদ, পৃষ্ঠা ৮

**৯৬. অধিক বিজয়ের দরুন ফারূকী শাসনামলকে সিদ্দিকী শাসনকাল অপেক্ষা উত্তম মনে করা ভুল।**

হযরত আবূবকর (রা)-এর খিলাফতকালে তেমন উল্লেখযোগ্য বিজয় সূচিত হয়নি বরং জাতীয় নিরাপত্তামূলক কাজে তাঁর শাসনামলের অধিক সময় ব্যয় হয়। মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর কোন কোন সম্প্রদায় ইসলাম ত্যাগ করে কিছু লোক যাকাতের ফরয অস্বীকার করে বসে। এ ধরনের এক বিশৃংখল ও ইসলাম ত্যাগের ফিৎনা দমন করতে মুসলমানদের সামলানো কাজেই তাঁর খিলাফতকালের পূর্ণ সময় ব্যয়িত হয়। সুতরাং বিজয়ের সুযোগ তাঁর হাতে আসেনি। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলের প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন বিজয়বার্তা মদীনায় পৌঁছত। প্রতিদিন সংবাদ আসত আজ অমুক শহর মুসলিম বাহিনীর পদানত হয়েছে, কাল অমুক শহরে অভিযান ইত্যাদি। এমনিভাবে ফারূকী শাসনের দশ বছর কালের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের বিশাল ভূ-খণ্ডে ইসলামী হুকুমতের পরিধি বিস্তৃত হয়। কোন কোন অর্বাচীন বিজয়ের অব্যাহত এ-গতিধারা লক্ষ করে তাঁর খিলাফতকাল খিলাফতে সিদ্দিকীয়া অপেক্ষা সার্থক ধারণা করে। কিন্তু বিবেকবানের নিকট স্পষ্ট যে, ভবন ইত্যাদির নির্মাণ সৌকর্য ও নিপুণ শিল্পকর্মের কৃতিত্ব পরিকল্পনাকারী প্রকৌশলীর, যিনি পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করে ভিত্তি স্থাপন করেন। যেহেতু তার পূর্ণ মেধাশক্তি এর পেছনে ব্যয়িত হয়েছে। ইমারতের নির্ভুল নকশা তৈরি করা এবং ভিত্তি মজবুত করাই আসল কাজ। ইটের উপর ইট গেঁথে দেয়াল দাঁড় করানো অপেক্ষাকৃত কম কৃতিত্বের কাজ। স্থূলদর্শী লোকেরা নির্মাণ সমাপ্তির দরুন দ্বিতীয়-জনের কৃতিত্বের দাবিদার। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেরই জানা যে, বাড়ির সৌন্দর্য ও মজবুতীর কৃতিত্ব নকশাকার-ভিত্তি স্থাপনকারীর। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীবৃন্দের দৃষ্টিতে খিলাফতে সিদ্দিকীয়ার সাথে খিলাফতে ফারূকিয়ার কোন সামঞ্জস্যই হতে পারে না। কারণ ইসলামী হুকুমাত ও খিলাফতের বুনিয়াদ স্থাপনের পিছনে যে শ্রম ও মানসিক চিন্তা ক্ষয় করতে হয়েছে তার দশ ভাগের এক ভাগও হযরত উমর (রা)-কে করতে হয়নি। সে সিংহহৃদয় খলীফার শাসনকালে স্বজাতীয়দের ইসলাম ত্যাগ, ইসলামের

অন্যতম স্তম্ভ যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতির ন্যায় ফিৎনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিলে অকুতোভয়ে সার্থক মুকাবিলা দ্বারা তিনি এসব নির্মূল করে শাসনের মাত্র আড়াই বছরের মেয়াদে ইসলামী হুকুমতের ভিত মজবুত করে তা এমন সুষ্ঠু নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, পরবর্তী খলীফার জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হযরত সিদ্দীক (রা)-এর কৃতিত্ব এক্ষেত্রে মুখ্য। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে সূচিত যাবতীয় বিজয়ের সমস্ত সওয়াব হযরত সিদ্দিকের আমলনামায় যুক্ত হবে। যেহেতু তাঁর প্রবর্তিত নীতির ওপরই খিলাফতে উমর (রা)-এর প্রবাহ বইতে থাকে। সংস্কৃতিবান ও রাজনৈতিক দূরদর্শী ব্যক্তির জানা কথা যে, প্রয়োগ অপেক্ষা আইন প্রণয়ন কঠিন ব্যাপার। কেননা আইন প্রয়োগকারীর পক্ষে প্রণয়নকারীর দশ ভাগের এক ভাগ শ্রমও ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে না।

—আল-জালালিল-ইব্‌তিলা, পৃষ্ঠা ৯

## ৯৭. "চার শ বছর পর ইজতিহাদ থাকবে না" কথাটির অর্থ।

এর অর্থ এই নয় যে, চারশ বছর পর ইজতিহাদযোগ্য মেধা দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। একে তো এটা প্রমাণহীন কথা, দ্বিতীয়ত এ অর্থ শুদ্ধও হতে পারে না। কারণ প্রত্যেক যুগে খুঁটিনাটি এমন সব নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে ইমামগণ থেকে যার কোন সমাধান বর্ণিত নেই। সমকালীন আলিমগণ নিজেদের ইজতিহাদের আলোকে এসবের সমাধান দিয়ে থাকেন। ইজতিহাদের অধ্যায় যদি চিরতরে খতম হয়ে যায় অধিকন্তু ইজতিহাদযোগ্য মেধা দুর্লভ হয়ে পড়ে, তাহলে কি শরীয়ত তার সমাধান দিতে অক্ষম হয়ে পড়বে কিংবা আকাশ থেকে নতুন নবী আবির্ভূত হবেন উদ্ভূত মাসআলার সমাধান দিতে ? আল্লাহ্ না করুন যদি তাই হয়, তবে ক, দ, ন, ( ق-د-ن অর্থাৎ কাদিয়ানী) সম্প্রদায়ের কানে এর আভাস পৌঁছে গেলে মাসীহে মাওউদের (প্রতিশ্রুত মাসীহ) নবুয়ত সিদ্ধকারী প্রমাণের তালিকায় আরো একটি দলীল যুক্ত হবে। তাহলে—اليوم اكملت لكم دينكم (আজ তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণতা দান করলাম) আয়াতের মর্ম কি হবে ? আয়াত ঘোষণা করছে দীনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছে। যদি ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ হওয়া স্বীকার করা হয়, তাহলে শরীয়তের সে পূর্ণতার পথ কি? অথচ নতুন নতুন এমন সব মাসআলা রয়েছে ফিকার গ্রন্থ কিংবা মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যায় যার কোন সমাধান বর্ণিত নেই। সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে উড়োজাহাজে নামায পড়া জায়েয কি-না ? চার শতাব্দীর পর ইজতিহাদের বৈধতা সম্পূর্ণত অস্বীকার করা হলে শরীয়ত এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে ? পূর্বে বিমানের অস্তিত্ব-ই ছিল না, ফকীহগণের পক্ষ থেকে তাই এই সম্পর্কে কোন বিধানও বর্ণিত নেই। তাই

আমাদেরকেই ইজতিহাদের মাধ্যমে এ জাতীয় নতুন সমস্যার সমাধান ব্যক্ত করতে হয়। ফকীহ্গণের মন্তব্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, চার শতাব্দীর পর ইজতিহাদের দ্বার পৌনপুনিক রুদ্ধ হয়ে গেছে বরং উদ্দেশ্য এই যে, 'উসুল' (মূলনীতি) সম্পর্কিত ইজতিহাদের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ কিন্তু শাখাভিত্তিক ইজতিহাদ এখনো বাকি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চালু থাকবে। আর শাখাকেন্দ্রিক ইজতিহাদের বৈধতা স্বীকৃত না হলে শরীয়তের পূর্ণতায় অমূলক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। অথচ ইসলামী শরীয়তের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বিবৃত রয়েছে। ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে খুঁটিনাটি-ছোটখাট মাসআলার বিবরণ না থাকতে পারে কিন্তু মুজতাহিদগণ মূলনীতি এমনভাবে প্রণয়ন ও নির্ধারণ করেছেন যার আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত সমকালীন আলিমগণ নবউত্থিত যেকোন সমস্যার সমাধান ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন। তবে হ্যাঁ, কুরআন-হাদীস মন্থন করে 'উসূল' তথা মূল নীতি উদ্ভাবন করা বর্তমানে সম্ভব নয়। এটা মূলত নীতিগত ইজতিহাদ চার শতাব্দী পর যার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কেননা প্রথমত মুজতাহিদগণ যাবতীয় মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন, কোন একটা দিকও তাঁরা অপূর্ণ রাখেন নি। দ্বিতীয়ত পরবর্তী যুগের কোন ইমাম কোন বিষয়ে মূলনীতি উদ্ভাবন করলেও সেটা সার্বিক নয়, কোন না কোন এক পর্যায়ে তাতে জটিলতা দেখা দিবেই। তাই বোঝা গেল মূলনীতিকেন্দ্রিক ইজতিহাদযোগ্য মেধা পরবর্তীকালে দুর্লভ হয়ে গেছে। বস্তুত সেটা মুজতাহিদগণের বিশেষত্ব ছিল যে, 'নস' থেকে তাঁরা এমন নিখুঁত আকারে মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যার কোন এক পর্যায়ে বিন্দুমাত্র জটিলতা পরিলক্ষিত হবার নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) এক স্থানে লিখেছেন—হিদায়ার গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ভাবিত উসূলে (মূলনীতি) নির্ভরযোগ্য নয়। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, হিদায়া নির্ভরযোগ্য কিতাব নয় এবং এর উসূল ক্রটিযুক্ত। বরং শাহ্ সাহেবের উদ্দেশ্য হলো—হিদায়ার গ্রন্থকার কোন কোন উসূল ঊর্ধ্বতনের বরাতে উদ্ধৃত না করে কুরআন-হাদীস থেকে নিজে সরাসরি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর এইটুকু কেবল নির্ভরহীন। কিন্তু তাঁর খুঁটিনাটি শাখাগত যাবতীয় মাসআলা নির্ভরযোগ্য। অতএব লক্ষণীয় যে, হিদায়ার গ্রন্থকার একজন সূক্ষ্মদর্শী, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, ফিকাহ্-শাস্ত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাকার। তাঁর সংকলিত প্রামাণ্য গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত হিদায়া কিতাব ফিকার আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এতে তিনি যুক্তি ও প্রমাণ (نقلی و عقلی) দু-ধরনের দলীলের মাধ্যমে প্রতিটি মাসআলা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর লক্ষ করা যায় প্রতিটি মাসআলার শাখা-প্রশাখা (جزئيات) সম্পর্কে হাদীস বর্ণনার অতুল ভঙ্গিমায়। যদিও তিনি হাদীস এনেছেন

সনদ-বিহীন কিন্তু সন্ধান নিলে দেখা যাবে মুসনাদ-বায্‌যার, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী অথবা মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ্ ইত্যাদি যেকোন গ্রন্থে তার সূত্র অবশ্যই বিদ্যমান। অবশ্য দু-একটির ক্ষেত্রে আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি পৌছতে না পারার দরুন সেগুলি সূত্রহীন সাব্যস্ত হয় না। এ হলো তাঁর জ্ঞান গভীরতার অবস্থা। প্রজ্ঞার দিক বিবেচনা করলে প্রথম প্রতিপক্ষের দলীল ও জবাব এবং পরে স্বীয় মাযহাবের দলীল পেশ করা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মূলনীতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে হিদায়া সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হলো—হিদায়া গ্রন্থকারের উদ্ভাবিত 'উসূল' (মূলনীতি) নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত নয়; যেহেতু যে কোনও এক স্তরে এতে জটিলতা সৃষ্টি হয়-ই। অতএব সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও প্রজ্ঞায় হিদায়া গ্রন্থকারের সাথে আজকাল যাঁদের দূরতম সম্পর্কও নেই হাদীস-কুরআন থেকে তারা কি মূলনীতি উদ্ভাবন করবে। অবশ্য খুঁটিনাটি ইজতিহাদ (اجتهاد فى الفروع) এখনো বৈধ। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমরাও ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফিঈর ন্যায় মুজতাহিদ হয়ে যাব। রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন যে, আইন প্রয়োগ অপেক্ষা আইন প্রণয়ন অধিকতর জটিল ও দুরূহ কাজ। তাঁদের উদ্ভাবিত উসূলের ভিত্তিতে ফতোয়া জারি করা ভিন্ন আমাদের করণীয় কি আছে। যারা কুরআন-হাদীস পর্যালোচনা করত এমন সব নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি মাসআলা সমাধানের জন্য যথেষ্ট, মূলত সে সকল মনীষীই কৃতিত্বের দাবিদার। এমন কোন মাসআলা জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হতে পারে না যার বৈধতা-অবৈধতার হুকুম উক্ত মূলনীতির আলোকে সমাধান করা না যায়। অধিকন্তু তাঁরা কেবল নীতিমালাই নয় আনুষঙ্গিক মাসআলাও এত অধিক পরিমাণ উদ্ভাবন করেছেন যে, সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে ব্যাখ্যা-বর্ণনা করেন নি এমন মাসআলা কমই পাওয়া যাবে। কদাচিৎ যদি কোথাও দেখা যায় যে, ইমামগণ দু-একটি মাসআলার বর্ণনা এড়িয়ে গেছেন, তাহলে বুঝতে হবে হয়তো মুফতী সাহেবের দৃষ্টি এর সমাধানের গভীরে পৌছেনি অথবা ইবারতে (বাক্য) সমাধান রয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রজ্ঞার অভাবে তিনি তা লুফে নিতে পারেননি। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, খুঁটিনাটি বা ছোটখাট মাসআলা তাঁরা এড়িয়ে গেছেন কিন্তু তাঁদের উদ্ভাবিত নীতিমালা রয়েছে যার আলোকে সমাধান বের করা যায়। মোট কথা, মুজতাহিদ ইমামগণের সমকক্ষতা দাবি করার মত বুকের পাটা আজকাল কারো থাকতে পারে না। —আল-জালালিল ইবতিলা, পৃষ্ঠা ১০

**৯৮. সাদৃশ জ্ঞান (علم الاعتبار) তুলনামুলক পর্যায়ের বিষয় কুরআনকেন্দ্রিক জ্ঞান (علوم قران) নহে।**

বুযুর্গানে দীন কর্তৃক কুরআনের আলোকে উদ্ভাবিত ভিন্ন প্রকৃতির 'ইল্ম' (জ্ঞান) কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কিংবা কুরআন কেন্দ্রিক 'ইল্ম' নয়, বরং একে 'কুরআন সদৃশ ইল্ম' আখ্যা দেয়া যায়। বস্তুত 'কুরআন কেন্দ্রিক' এবং 'কুরআন সদৃশ' (مدلول قرآن এবং منطبق على القرآن) এ-দুইয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার হতে পারে। মনে করুন এক ব্যক্তির নিকট ক্ষৌরকার এসে বলল, "চুল ছাঁটিয়ে নিন।" জবাবে সে বলল "বড় হতে দাও"। তার এ জবাবদানকালে তারই কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রপক্ষের বার্তাবাহক চিঠি হাতে ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হয়। এখন সেও যদি "বড় হতে দাও" উক্তিটাকে নিজের আনীত পত্রের জবাব ধরে নেয়, তবে তা উভয়ের উত্তর হতে পারে। ক্ষৌরকারের জবাব এভাবে যে, চুল আরো বড় হতে দাও, বড় হলে তখন ছাঁটাব। আর বার্তাবাহকের উত্তর এ প্রকারে যে, মেয়ে তো এখনো ছোট, বড় হোক, তখন বিয়ের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে বক্তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষৌরকারের জবাব দেয়া। কিন্তু বাক্যের প্রকৃতি এমন যে, এর দ্বারা বার্তাবাহকের জবাবও চিহ্নিত হতে পারে। এটাকে সূক্ষ্ম বাকরীতি বলতে পারেন। অতএব প্রথমটিকে বলা হয় বাক্যের মূল বক্তব্য আর দ্বিতীয়টি এর সাথে সদৃশ মাত্র। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, সূফীগণ اذهب الى فرعون انه طغى (হে মূসা! তুমি ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে) আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর-সদৃশ ভঙ্গিতে বলেছেন ঃ এর অর্থ— اذهب ايها الروح الى النفس انه طغى واذبحوا بقرة النفس [হে রূহ! তুমি নফসের (কু-প্রবৃত্তির) প্রতি গমন কর, সে সীমা লংঘন করেছে। এবং তোমরা নফসের পশু যবাই কর]। অতপর আয়াতের এসব রূপক তরজমা লক্ষ করে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল সূফীগণের প্রতি অনুরাগ-শূন্য, যারা কেবল নসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী। এ সমস্ত 'তাবীল' (রূপক অর্থ) সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তারা বলেছেন ঃ কোথায় ফিরাউন আর কোথায় নফ্স, কোথায় রইলেন মূসা আর কোথায় রূহ্। এ দুইয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক ? এ-তো যেমন যমীন বলে আকাশ অর্থ করার নামান্তর। এ কারণে তারা সূফীগণকে পথভ্রষ্ট ও কুরআন বিকৃতকারী আখ্যা দিয়ে সূফীমতের অস্বীকার করে বসে। ফলে এদের সমূহ ক্ষতি এই হলো যে, ওয়ালী আল্লাহ্গণের ফয়েয ও বরকত থেকে তারা বঞ্চিত রয়ে গেল। দ্বিতীয়পক্ষ যারা সূফীপ্রেমে আত্মহারা

হয়ে বলা শুরু করে—কুরআনের মূল বক্তব্য ও ব্যাখ্যা এটাই (যা সূফীগণ ব্যক্ত করেছেন), এতে সব বাতেনী কথাবার্তা কিন্তু যাহেরী আলিমগণের পক্ষে এসব ধরা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে অবিমৃষ্যকারীদের বাড়াবাড়ি এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, তারা কুরআন পাকের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। কসম খোদার, এরা ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কসম! কুরআনের বক্তব্য আদৌ এরূপ নয়। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নামায-রোযা সব বিলীন হওয়ার পথে। কেননা সমস্ত 'নস' বরং শরীয়তের ভাবমূর্তিকে এরা পরিবর্তন করে দিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আলোচনা এদের নিয়ে নয় বরং পর্যালোচনা হলো—সূফীগণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে। বলা বাহুল্য—ইতিপূর্বে আলোচ্য দুই পক্ষের এক পক্ষ তো সূফীগণের অপর দল মুফাস্সীরগণের ব্যাখ্যা অস্বীকার করে বসেছে। মাঝপথে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা যারা কুরআনকে 'কালামুল্লাহ্' এবং সূফীগণকে 'আহ্লুল্লাহ্' রূপে ভক্তি করি। অতএব উভয়পক্ষের সহায়তা ও সমর্থন সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজন হলো—এসব ব্যাখ্যার এমন অর্থ গ্রহণ করা যাতে কালামুল্লাহ্র বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত না হয় এবং আহলুল্লাহগণের উক্তিও শরীয়তের বিপক্ষে না যায়। তাই আমরা বলি—আয়াতের সূফীগণের বর্ণিত অর্থ প্রকৃতপক্ষে তাফসীর পর্যায়ের নয় আর তাঁরা আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য অস্বীকারও করেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য কখনো এরূপ নয় যে, কুরআনে বর্ণিত ফিরাউন দ্বারা প্রকৃত নফ্স, মূসা অর্থ রূহ এবং বাকারা অর্থ নফ্স। এ পর্যায়ে তাঁরা যা কিছু ব্যাখ্যা-মন্তব্য ব্যক্ত করেন সেটাকে আসলে "ইলমে ইতিবার" (علم اعتبار -তুলনীয় জ্ঞান) বলা হয়। বস্তুত নিজের অবস্থাকে পরের অবস্থার সাথে তুলনামূলক বিচার করাই হলো "ইলমে ইতিবারের" মূল দর্শন। এর উপমা দিয়ে কথাটা এভাবে বোঝানো যায়, যেমন যায়েদ উমরের দেখাদেখি কোন কাজ করল এবং ব্যর্থ হলো। এমতাবস্থায় জনপ্রবাদে বলা হয়—হংস চালে চলতে গিয়ে কাক তার আপন চাল ভুলে গেছে। তা হলে এ দৃষ্টান্তে কাক অর্থ যায়েদ আর হাঁস মানে ব্যক্তি উমর অবশ্যই নয়। বরং কাক দ্বারা প্রকৃত কাক এবং হাঁস দ্বারা এখানে আসল হাঁস বোঝানোই মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত দু'টি ঘটনা একই প্রেক্ষাপটে, অভিন্ন অবস্থায় সংঘটিত হওয়াই এখানকার সার কথা। একটি ঘটনার প্রতি দর্শকের দৃষ্টি পড়াতে অপর ঘটনা স্মরণে এসে যাওয়ায় একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা হয়। এখানে যেরূপ যায়েদ আমর এবং এদের ঘটনাকে কাক ও হাঁসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব সূফীগণের ভাষায় ঃ اذهب ايها الروح الخ (হে রূহ! তুমি গমন কর...) ব্যাখ্যার অর্থ হবে—হে পাঠক! কুরআন তিলাওয়াতকালে এখানে পৌঁছে এ ঘটনা থেকে তুমি শিক্ষা নিবে যে,

তোমার নিজের ভিতরেও ফিরআউন ও মূসা সদৃশ বিষয় রয়েছে। ঘটনাকে ঘটনা হিসেবে স্থূল দৃষ্টিতে পাঠ না করে বরং কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা নিজের অবস্থার সাথে মিলিয়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর আর অগ্রসর হও। এই হলো আলোচ্য আয়াত থেকে সূফীগণের শিক্ষা ও মূল্যবোধ। এখন এর অস্বীকারকারী এবং কুরআনভিত্তিক জ্ঞানের দাবিদার উভয়পক্ষ ভ্রান্তিতে নিপতিত। বস্তুত এসব হলো তাবীল ও সূক্ষ্ম বাকনীতি পর্যায়ভুক্ত বিষয়, কুরআনকেন্দ্রিক মূল জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। বলা বাহুল্য, কুরআনী জ্ঞান তা-ই যার মাধ্যমে ইবারাতুন্ নস, ইশারাতুন নস, ইকতিযাউন্ নস অথবা দালালাতুন্ নস, ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করা শুদ্ধ হয়। অন্যথায় সেটা হবে লতীফা ও বাকমাধুর্য পর্যায়ের। —আল ইনফাক, পৃষ্ঠা ১০

**৯৯. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাবলীগ বর্জন করা জায়েয নহে।**

এ পর্যায়ে সর্বাগ্রে আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা উচিত যে, তাবলীগের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আছে কি-না। লক্ষ করলে দেখা যাবে এ ব্যাপারে চিন্তা করার ক্ষেত্রেই আমরা শূন্যের ঘরে। আমরা একে আদিষ্ট হুকুমরূপে বিশ্বাস করি বটে কিন্তু তালাশ করলে বোঝা যায় তাবলীগ যে পর্যায়ের হুকুম আমরা একে তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের ধারণা করি। তাবলীগ যে একটা ওয়াজিব হুকুম সে বিশ্বাস অতি নগণ্য লোকই পোষণ করে। কেউ মনে করে মুস্তাহাব, কেউ মুস্তাহ্সান বা উত্তম যা করা তো ভাল, না করায় গুনাহ নেই। গযবের কথা হলো—মুস্তাহ্সান যারাও বলে তাদের আবার শর্ত হলো যদি না রাজনৈতিক স্বার্থবিরোধী হয়, অন্যথায় 'ভাল-ও নয়। প্রথমত ওয়াজিবকে মুস্তাহাব জ্ঞান করাটাই ছিল গযবের কথা। দ্বিতীয় সর্বনাশ হলো—স্বার্থবিরোধী না হওয়ার শর্ত। এটা কেবল স্বার্থবাদী চিন্তার ফসল। দীনের কাজও আজকাল পার্থিব স্বার্থের দৃষ্টিতে বিচার করা হয়, দেখা হয় ব্যাপারটা স্বার্থের পরিপন্থী কি-না। অতঃপর কোথাও স্বার্থহানির উপক্রম হলে বলা হয়—এ পরিস্থিতিতে এটা স্বার্থহানিকর। কাজেই মুস্তাহাবও আর থাকল না। এখন একে আল্লাহ্র নির্দেশ বলে স্বীকারই করা হয় না। পরবর্তী পর্যায়ে কোন একদিন আদিষ্ট তাবলীগ নিষিদ্ধ বলে ফেললেও বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। দুঃখজনক ব্যাপার হলো—মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থকে শরীয়তের অধীন জ্ঞান করার মানসিকতা আজ অনুপস্থিত। অথচ হওয়া উচিত ছিল এই যে, খোদায়ী হুকুম তো আগে বাস্তবায়িত হোক ব্যক্তি স্বার্থ পরে দেখা যাবে। কিন্তু আজকাল এমনটি করা তো হয় না, দুঃখ তো এখানে। কেউ কেউ বরং স্বার্থবশে ইসলামী দাওয়াতকে ফিতনা-ফাসাদ নামে আখ্যায়িত করতেও কসুর করে না। যে কারণে তারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য ও অনীহার

ভাব প্রদর্শন করে চলে। এমনকি কাউকে তারা সঠিক নিয়মে নামায আদায় করছে না লক্ষ্য করা সত্ত্বেও এ কথা বলার সাহস পাচ্ছে না যে, নামায তোমার হয়নি সুতরাং আবার পড়। নফসের গোলামি আর প্রবৃত্তির দাসত্বই এর মূল কারণ। যে কারণে জানা সত্ত্বেও তারা মনগড়া ব্যাখ্যা রচনা করে নেয়। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌র নিকট ছলচাতুরী, মিথ্যা-বানোয়াট অচল। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে ঃ

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ —

"বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।" ন্যায়ের দৃষ্টিতে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, পার্থিব জীবনকেই মানুষ কেবলা তথা মুখ্য উদ্দেশ্য করে নিয়েছে। মূলত সৎকাজে আদেশ না করার কারণ হলো—তা করা হলে পার্থিব স্বার্থ, বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সখ্যতা বিনষ্ট হওয়ার এবং সচ্ছলতায় ভাটা পড়ার কাল্পনিক আশংকা। এরা মনে করে কারো ভুলে অঙ্গুলি নির্দেশের ফলে অসন্তুষ্ট হয়ে সে নির্যাতন চালাতে পারে, যাতে আমাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। বস্তুত এসব বিপদাশংকা নেহায়েত কল্পনাপ্রসূত। সৎকাজে আদেশের দায়ে কল্পিত বিপদের অজুহাতে এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়ার অবকাশ আছে কি না তা আলিমদের জিজ্ঞাসা করুন। তাদের থেকে জেনে নিন কোন্ ধরনের পরিস্থিতিতে হুকুম পালনের অনিবার্যতা থেকে মুক্তি দেয়। আমার কথা এটা নয় যে, মুক্তির কোন উপায় বা নিয়ম নেই। আছে অবশ্যই। কিন্তু নিজে মুফতী সেজে ফতোয়া না দিয়ে আলিমদের থেকে সে অক্ষমতার নিয়ম-কানুন জেনে নিন। সত্য কথা বলতে কি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে কৃতসংকল্প ব্যক্তিই এ বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধানকারী। অক্ষমতার নিয়ম-শর্ত জানার অধিকার তার স্বীকৃত। নিষ্ঠার সাথে জানতে চাইলে সবই তাকে বলে দেয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে সব নিয়ম-শর্ত জানার, বোঝার কারো অধিকার স্বীকৃত নয়। কেননা যে ব্যক্তি কাজের ইচ্ছাই পোষণ করে না নিয়ম-শর্ত জিজ্ঞেস করার তার কি অধিকার ? কারণ তার প্রশ্ন হবে না করার উদ্দেশ্যে, জান বাঁচানোর নিয়তে। যখন কায়দা-কানুন জানা হয়ে যাবে, বলবে আমার এই অসুবিধা, সেই অজুহাত, ঐ শর্ত তো আমার মধ্যে অবর্তমান, কিরূপে আমি সৎকাজের আদেশের দায়িত্ব পালন করি ইত্যাদি। কাজেই কাজ আরম্ভ করার পূর্বে কাউকে অক্ষমতা ও শর্তাবলী ব্যক্ত করা আলিমগণের উচিতই নয়। যেমন কারো নামায পড়ার মোটে ইচ্ছাই নেই অথচ প্রশ্ন করে কোন্ পরিস্থিতিতে এ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সে মাসআলা তাকে বলাই উচিত নয়। নতুবা সব সময় সে

তালাশ করবে আর চিন্তা করবে নামায থেকে কি করে যে বাঁচা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নামায পড়তে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী আর অক্ষমের মাসআলা জানতে চায় নিঃসন্দেহে তাকে জানিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু যদি জানা যায় যে, কেবল জান বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য তবে মুফতী সাহেবের উচিত তার জবাবই না দেয়া। আমার মতে বরং এমন লোককে ওযর-অসুবিধার সন্ধান জানানো জায়েয নয়।

—আদাবুত্তাবলীগ, পৃষ্ঠা ৪

## ১০০. হযরত মনসুর (র)-এর 'আনাল হক' বলার তাৎপর্য।

সে সময় 'আনাল হক' (আমি খোদা) উচ্চারণ হযরত মনসুরের নিজের কণ্ঠে ছিল না, বরং তখন তাঁর অবস্থা ছিল হযরত মূসা (আ)-এর বৃক্ষ থেকে انى انا الله رب العالمين (আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের পালনকর্তা) উত্থিত আওয়াজের ন্যায়। সে আওয়াজের উচ্চারণ দৃশ্যত যদিও ছিল বৃক্ষের অন্তরাল থেকে উদ্ভাসিত যা সংশ্লিষ্ট আয়াতের ভাষায় ঃ

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَّا مُوْسٰى....(উপত্যকার দক্ষিণ পার্শে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহবান করে বলা হলো—হে মূসা!........) তাহলে বৃক্ষ কি আপন কণ্ঠেই উচ্চারণ করে যাচ্ছিল..... انى انا الله (আমিই আল্লাহ্)....? আদৌ না। নতুবা গাছের 'রব' হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে এ-ও বলার অবকাশ নেই যে, সে আওয়াজ বৃক্ষের অন্তরাল থেকে উত্থিত কণ্ঠস্বর ছিলই না। অথচ তা ছিল অবিকল খোদায়ী আওয়াজ। কিন্তু মহান আল্লাহ্ আওয়াজ থেকে পবিত্র অথচ নির্দিষ্ট দিক ও স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট কণ্ঠস্বরই হযরত মূসা (আ)-এর কানে ভেসে আসছিল, আল্লাহ্ একেই দক্ষিণ পার্শ্ব (وادى ايمن) পবিত্র ভূমি (بقعة مباركة) 'বৃক্ষ থেকে' (من الشجرة) ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। নতুবা অবিকল খোদায়ী কালাম হলে এতসব বিশেষণযুক্ত হওয়া আদৌ সঙ্গত ছিল না। অতএব স্বীকার করতেই হবে যে, সে আওয়াজ মূলত বৃক্ষ থেকেই উত্থিত হয়েছিল। কিন্তু এ স্বর গাছের নিজস্ব ছিল না, বৃক্ষের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে ছিল কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভাষ্যকারের ন্যায়। কুরআনে যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ করে বলা হয়েছে ঃ فاذا قرناه فاتبع قرانه "সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তুমি কেবল সে পাঠের অনুসরণ করবে।" তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন আওয়াজ অবশ্যই শুনতে পেতেন। অথচ আল্লাহ্ আওয়াজ থেকে পবিত্র, তাহলে قرنا বাক্যের অর্থ কি ? তাই বলা হয়—এখানে জিবরাঈলের পাঠকেই আল্লাহ্‌র পাঠ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর পাঠ ছিল আল্লাহ্‌র হুকুমে অনুষ্ঠিত। এখানেও

তদ্রূপ বৃক্ষের কথাকে আল্লাহ্‌র ভাষণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র হুকুমেই তার আওয়াজ। সুতরাং একইরূপে মনসুরের انا الحق উক্তি খোদায়ী ভাষণ আখ্যা দেয়া উচিত। কারণ আত্মহারা অবস্থায় আল্লাহ্‌র বাণীই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত, উচ্চারিত হয়েছিল, নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্‌র আদেশেরই তিনি ছিলেন ভাষ্যকার মাত্র। সুতরাং জনৈক বুযুর্গের ঘটনায় এর সমর্থন লক্ষ করা যায়। তাহলো—এক বুযুর্গ ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করেন—মনসুর নিজেকে খোদা বলেছে, তদ্রূপ ফিরআউনও। কিন্তু প্রথমজন আপনার মকবুল ও প্রিয় আর অপরজন অভিশপ্ত, হে আল্লাহ্! এর কারণ কি ? জবাবে বলা হলো—মনসুর আনাল হক বলেছিল আপন সত্তা এবং অস্তিত্ব বিলীন করার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ফিরআউন আমি খোদার খোদায়ী অস্বীকার করে উক্তি করেছিল انا ربكم الاعلى। অর্থাৎ আমিই তোমাদের সেরা খোদা। অর্থ হলো—মনসুরের উক্তি নিজস্ব ছিল না, যেহেতু তিনি আপন ব্যক্তিসত্তা বিলীন করে ফেলেছিলেন। মাওলানা রূমী তাই বলেছেন ঃ

گفت فرعون انا الحق گشت پست

گفت منصورے انا الحق گشت مست

لعنت الله آن انا را در قفا

رحمت الله ایں انا را در وفا

—ফিরআউন 'আনাল হক' বলে ধ্বংসের সম্মুখীন হলো আর একই 'আনাল হক' মনসুর উচ্চারণ করে হয়ে গেলেন আত্মহারা! প্রথম 'আনার' পরিণাম হলো আল্লাহ্‌র লা'নত আর অভিশাপ। কিন্তু দ্বিতীয় 'আনার' প্রতিদানে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। —আল-মাওয়াদ্দাতুর রাহমানিয়া, পৃষ্ঠা ৩০

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين –

ইফাবা—২০০০-২০০১-প্র/৩৯৫৫(উ)—৫২৫০